সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

গহীন অরণ্য

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

গহীন অরণ্য

কাজী আনোয়ার হোসেন

অনেকদিন পর আফ্রিকার গহীন অরণ্য আবার ডাক দিয়েছে মাসুদ রানাকে। এবারকার অ্যাডভেঞ্চার কঙ্গো রেইন ফরেস্টে। ধারণা করা হচ্ছে, খুলি ফাটিয়ে মারে এমন একদঙ্গল অচেনা প্রাণী আছে ওদিকে। রানার সঙ্গে ওর বান্ধবী লরেলি আছে, আর আছে পোষা গরিলা নিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডক্টর আনন্দ। ওদের বিশ্বাস, নিখোঁজ সভ্যতা-জিঞ্জ এতদিনে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।

হীরের খনি দখল করবার লোভে শুরু থেকেই ওদের পিছু নিল ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়াম, প্রতি পদে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারচেয়েও বড় দুঃসংবাদ, পথে অপেক্ষা করছে মানুষখেকো কিগানিরা।

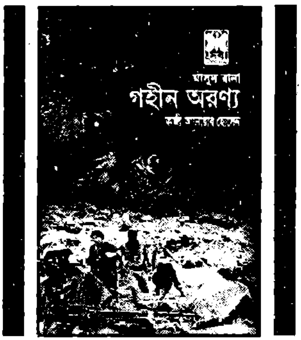
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

মাসুদ রানা ৩৩৭

গহীন অরণ্য

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7337-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

একচল্লিশ টাকা

Masud Rana-337
GOHEEN ARONNYO
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত *সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়

এক

একাই দখল করে রেখেছে প্রায় এক কোটি বিশ লাখ বর্গমাইল। আকারে দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিগুণই বলা যায়। ভিতরে অনায়াসে ঢুকে যাবে উত্তর আমেরিকা আর ইউরোপ। এমনকী মানচিত্র দেখেও অন্ধকার আফ্রিকা মহাদেশের বিশালত্ব অনুধাবন করা সহজ কাজ নয়।

যতই অন্ধকার বলা হোক, আফ্রিকার বেশিরভাগটাই উত্তপ্ত মরুভূমি আর ঘাস ঢাকা খোলা প্রান্তর। অন্ধকার শুধু মাঝখানটা, পনেরো লাখ বর্গমাইল রেইন ফরেস্ট–স্যাঁতসেঁতে, দুর্গম আর বিপদসঙ্কুল–ষাট লাখ বছরেও এতটুকু বদলায়নি। গোটা এলাকাটাকে কঙ্গো রিভার-এর ড্রেনেজ বেসিন হিসাবে দেখা হয়।

কঙ্গো বেসিনের উত্তর-পুব প্রান্তে রেইন ফরেস্ট থমকে দাঁড়িয়েছে এক সারি পাথুরে পাহাড়ের বাধা পেয়ে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টা ভিরুঙ্গা আগ্নেয়গিরি। এদিকের কয়েক হাজার বর্গমাইল এলাকা সম্পর্কে সভ্য জগতের মানুষ আজও পরিষ্কার কোন ধারণা রাখে না।

কঙ্গো রেইন ফরেস্টে ভোর হলো।

সকালের হিম ঠাণ্ডা আর ঝুলে থাকা কুয়াশা তাড়াবার চেষ্টা করছে ম্লান রোদ, সোনালি আলোয় উন্মোচিত হচ্ছে বিশাল এক নিস্তব্ধ জগৎ। প্রকাণ্ড গাছগুলো ডায়ামিটারে চল্লিশ ফুট, বিশতলা বাড়ির সমান উঁচু। মাথার চারদিকে পাতাবহুল ডালপালা ছড়িয়ে সবুজ চাঁদোয়া তৈরি করেছে, ফলে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে আকাশ। পাতার ডগা থেকে টপ-টপ করে শিশির ঝরে পড়ছে নীচের জমিনে।

শ্যাওলার পর্দা, লতানো গাছের জাল আর নানা জাতের পরগাছা

জট পাকিয়ে প্রতিটি গাছ থেকে ঝুলছে। গ্রাউন্ড লেভেলে প্রকাণ্ড ফার্ন-এর ছড়াছড়ি, একেকটা পাঁচ ফুটেরও বেশি লম্বা, জমিনের কাছাকাছি কুয়াশাকে আটকে রেখেছে। এদিক সেদিক কিছু রঙও আছে—লাল অ্যাক্যানথেমা ফুটেছে, মারাত্মক বিষ ওটা; আর রয়েছে নীল ডিসিনড্রো ভাইন, শুধু সকালের প্রথমদিকে বেরিয়ে আসে।

রাইফেল রেখে দিয়ে আড়ষ্ট পেশী টান টান করল কুকি কানাই। বিষুব এলাকায় সকাল চলে আসে ঝট করে। কিছুক্ষণের মধ্যে চারদিক উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল, তবে তারপরও রয়ে গেল কুয়াশা।

চারদিকে চোখ বুলাল কানাই। একটা অভিযাত্রীদলের ক্যাম্পসাইট পাহারা দিচ্ছে সে: উজ্জ্বল কমলা রঙের আটটা নাইলন নেট, বড় একটা নীল তাঁবু, সাপ্লাই ভর্তি বাক্সের পাহাড়কে ঢেকে রাখা বিরাট একটা তেরপল।

আরেক প্রহরী সুসুকে দেখতে পেল কানাই, একটা পাথরের উপর বসে আছে। চোখে ঘুম, অলস ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সুসু। ট্র্যান্সমিটিং ইকুইপমেন্ট সব কাছাকাছিই রয়েছে: সিলভার ডিশ অ্যান্টেনা, কালো ট্র্যান্সমিটিং বক্স, কল্যাপসিবল্ তেপায়ায় বসানো পোর্টেবল ভিডিও ক্যামেরার দিকে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া কেবল্। ভ্যান্স রিসোর্সেস অ্যান্ড মাইনিং কোম্পানির লোকেরা এই ইকুইপমেন্টগুলো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের হেড অফিস ওয়াশিংটনে রিপোর্ট পাঠাবার কাজে ব্যবহার করে।

কুকি কানাই হলো 'বাওয়ানা মুকুবাওয়া', অর্থাৎ গাইড—অভিযাত্রীদলকে কঙ্গোয় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভাড়া করা হয়েছে তাকে। এ-ধরনের জিয়োলজিক্যাল পার্টিকে আগেও সে পথ দেখিয়ে আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে গেছে। এই এলাকার ভাষা কিসওয়াহিলি ছাড়াও বান্টু আর বাগিন্দি জানে সে। এর আগে কঙ্গোয় বহুবার আসা হয়েছে তার, তবে ভিরুঙ্গায় এই প্রথম।

কানাই প্রথমে বোঝেনি আমেরিকান জিয়োলজিস্টদের এই দলটা কী কারণে কঙ্গোর ভিরুঙ্গায় যেতে চাইছে। জায়গাটা কঙ্গো রেইন ফরেস্টের একেবারে উত্তর-পুব কোণে। খনিজ পদার্থের দিক থেকে কালো আফ্রিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ এটা—নিকেল আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল

ডায়মন্ড উৎপাদনে রয়েছে এক নম্বরে, সাতে রয়েছে তামায়। এ-সব ছাড়াও বিপুল পরিমাণে মউজুদ আছে সোনা, টিন, জিঙ্ক আর ইউরেনিয়াম। তবে বেশিরভাগ খনিজ পদার্থই রয়েছে সাবা আর কাসাই অঞ্চলে, ভিরুঙ্গায় নয়।

অযাচিত প্রশ্ন করা কানাইয়ের স্বভাব নয়। অবশ্য তার কৌতূহল মিটতে খুব বেশি সময়ও লাগেনি। লেক কিভু পিছনে ফেলে রেইন ফরেস্টে ঢুকবার পর জিয়োলজিস্টরা নদী আর ঝরণার তলা থেকে বালি আর কাদা তুলতে শুরু করল। অর্থাৎ হয় সোনা খুঁজছে তারা, নয়তো হীরে। তারপর জানা গেল, হীরেই।

তবে যে-কোনও ধরনের হীরে নয়। ভ্যান্স কোম্পানির জিয়োলজিস্টদের কাছ থেকে জানা গেল, তারা Type IIb ডায়মন্ড খুঁজছে। প্রতিটি নতুন নমুনা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল টেস্ট-এর ব্যবস্থা করা হয়। ফলাফল নিয়ে যে আলোচনাটা চলে, নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে তার প্রায় কিছুই বোঝে না কানাই–ডায়ালেকটিক গ্যাপস, ল্যাটিস আইঅন, রেজিস্টিভিটি, এসবের মানে ও কী করে বুঝবে!

তবে কানাই এটুকু বুঝতে পারে যে ডায়মন্ডের ইলেকট্রিক্যাল বৈশিষ্ট্যই এখানে সবচেয়ে বেশি বিবেচ্য। নমুনাগুলো রত্ন হিসাবে একেবারেই অচল। বেশ কয়েকটা পরীক্ষা করে দেখেছে সে, একটাও ত্রুটিহীন নয়।

দশদিন ধরে দলটা প্লেসার ডিপজিট অনুসরণ করে এগোল। এটাই প্রচলিত নিয়ম: নদীর তলায় সোনা বা হীরে পেলে উৎসের সন্ধানে উজানের দিকে যেতে হবে।

ভিরুঙ্গানা ভলক্যানিক চেইন-এর পশ্চিম ঢাল ধরে অনেকটা উপরদিকে উঠে এল দলটা। সবই রুটিন মাফিক ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দুপুরের দিকে পোর্টাররা সরাসরি জানিয়ে দিল, তারা আর সামনে যাবে না।

কেন?

তারা বলল, ভিরুঙ্গার এই অংশটাকে 'খুলি-ভাঙা এলাকা' বলা হয়। বোকার মত কেউ যদি এখন সামনে এগোয়, তার খুলিটা তো

ভাঙা হবেই, হাড়গুলোও আস্ত থাকবে না।

পোর্টাররা কাছাকাছি বড় শহর কিসাংগানি-র লোক, কথা বলে বানটু ভাষায়। শহুরে হলেও, স্থানীয় লোকজন কঙ্গোর জঙ্গল সম্পর্কে বিচিত্র সব কুসংস্কারে ভোগে। নিজেদের মাথায় হাত বুলাচ্ছে তারা, বারবার একই কথা বলছে—সামনে এগোলে তাদের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। অগত্যা হেডম্যানকে ডেকে পাঠাল কানাই।

'এদিকে যেন কোন্ আদিবাসীরা থাকে?' জানতে চাইল সে, হাত তুলে সামনের জঙ্গলটা দেখাল।

'ওদিকে কেউ থাকে না,' জবাব দিল হেডম্যান।

'কেউ থাকে না? এমনকী বামবুটিরাও নয়?' জিজ্ঞেস করল কানাই। বামবুটি হলো পিগমিদের কাছাকাছি একটা গোষ্ঠী।

'এটা খুলি-ভাঙা এলাকা,' বলল হেডম্যান। 'এদিকে ভুলেও কেউ আসে না।'

'কেউ নেই, কেউ আসে না—তা হলে হাড় বা খুলিগুলো ভাঙে কে?'

'দাআ,' ভয়ে ভয়ে উচ্চারণ করল হেডম্যান। এই বানটু শব্দটার অর্থ হলো জাদুবিদ্যা বা অশুভশক্তি। 'খুব শক্তিশালী দাআ আছে এদিকটায়। মানুষ দূরে সরে থাকে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কানাই। আফ্রিকান নিগ্রো হলেও, এই দাআ শুনতে শুনতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। আফ্রিকার কোন্ জিনিসটার মধ্যে যে দাআ-র উপদ্রব নেই, সেটাই গবেষণার বিষয়। খেতে, চারায়, পাথরে, নদীতে, গাছে, ঝড়ে, ভূমিকম্পে, সম্ভাব্য সব রকম শত্রুতায় দাআ না থেকেই পারে না।

একটা আপসরফায় আসবার জন্য সারাটা দিন ব্যয় করতে হলো কানাইকে। অবশেষে বেতন বাড়িয়ে দ্বিগুণ করল সে। প্রতিশ্রুতি দিল, কিসাংগানিতে ফিরে প্রত্যেককে একটা করে আগ্নেয়াস্ত্রও দেওয়া হবে। নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর তার এই প্রস্তাবে রাজি হলো পোর্টাররা।

কানাই ধরে নিল, লোকগুলো আসলে বাড়তি সুযোগ-সুবিধে আদায় করবার জন্য চালাকি করেছে। 'খুলি-ভাঙা এলাকা' স্রেফ

তাদের বানানো একটা গল্প ছাড়া কিছু নয়। ব্যাপারটা নিয়ে সে আর মাথা ঘামাল না।

এরপর সামনের কয়েকটা জায়গায় কিছু ভাঙা আর ফাটা হাড় ছড়িয়ে থাকতে দেখে পোর্টাররা ভয় পেলেও, কানাই উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হয়নি। পরীক্ষা করে সে বুঝল, এগুলো এক জাতের বানরের ছোট আর দুর্বল হাড়, মানুষের নয়। গায়ে কোঁকড়ানো সাদা-কালো লোম, এই জাতের বানর গাছের উঁচু ডালে বসবাস করে।

তবে কোথাও কোথাও সত্যি-সত্যিই প্রচুর হাড় দেখা গেল। কানাইয়ের কোন ধারণা নেই হাড়গুলো ভাঙাই বা হয়েছে কেন। তবে আফ্রিকার সন্তান সে, জানে এখানে এমন বহু কিছু আছে যার কোন ব্যাখ্যা কেউ কোন দিন দিতে পারেনি, কখনও পারবেও না।

শুধু হাড় নয়, স্তূপ করা পাথরও চোখে পড়ল। কোন এক সময় এদিকে শহর ছিল। এ-ধরনের ধ্বংসাবশেষ আগেও অনেক দেখেছে কানাই। জিম্বাবুইয়ে আর ব্রোকেন হিলে রয়েছে প্রাচীন শহর আর মন্দিরের নমুনা, এখনও বিংশ শতাব্দীর কোন বিজ্ঞানীর চোখ পড়েনি সেগুলোর উপর।

প্রথম রাতে এই ধ্বংসাবশেষের কাছে ক্যাম্প ফেলল সে।

পোর্টাররা আতঙ্কিত হয়ে আছে। তাদের ভয়, রাতে নির্ঘাত তাদের উপর হামলা চালাবে অশুভশক্তি। তাদের এই ভয় আমেরিকান জিয়োলজিস্টদের মধ্যেও সংক্রামিত হল।

সবাইকে আশ্বস্ত করবার জন্য সাহসী ও বিশ্বস্ত পোর্টার সুসুকে সঙ্গে নিয়ে কাল রাতে কানাই জেগে ছিল। কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই রাতটা নির্বিঘ্নে কেটে গেছে।

মাঝরাতের দিকে জঙ্গলে কিছু নড়াচড়ার শব্দ হয়েছে। সেই সঙ্গে শোনা গেছে ফোঁস-ফোঁস আর হিস-হিস করে নিঃশ্বাস ফেলবার আওয়াজ। কানাই ধরে নিয়েছে, একটা চিতা খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল, সেটার নাক দিয়েই বেরিয়েছে এই আশ্চর্য শব্দ। এই জাতের বড় বিড়ালগুলো প্রায়ই শ্বাসকষ্টে ভোগে, বিশেষ করে জঙ্গলে।

ওই নড়াচড়া আর বিচিত্র শব্দ ছাড়া আর কিছু ঘটেনি রাতে।

রাত কেটে গেছে, এখন ভোর।

নরম একটা যান্ত্রিক শব্দ তার মনোযোগ কেড়ে নিল। সুসুও শুনতে পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, চোখে প্রশ্ন।

ট্র্যান্সমিটিং ইকুইপমেন্টে একটা লাল আলো মিটমিট করছে। সিধে হয়ে সেদিকে এগোল কানাই। জিনিসটা অপারেট করতে জানে সে, আমেরিকানরা তাকে ধৈর্য ধরে শিখিয়েছে, বলেছে– 'কখন কী ইমার্জেন্সী দেখা দেয়'।

কালো বাক্সটার সামনে হাঁটু গাড়ল কানাই। বাক্সটার সঙ্গে সবুজ চারকোনা LED, অর্থাৎ লাইট ইমিটিং ডাইওড রয়েছে।

বোতামে চাপ দিল কানাই। স্ক্রিনে ফুটল TX HX, মানে হলো ওয়াশিংটন থেকে মেসেজ আসছে। রেসপন্স কোড-এ চাপ দিল সে, স্ক্রিনে ফুটল CAMLOK। এর মানে হলো, ওয়াশিংটন ভিডিও ক্যামেরা ট্র্যান্সমিশন চাইছে।

মুখ তুলে তেপায়ার উপর বসানো ক্যামেরার দিকে তাকাল কানাই, দেখল স্রেটার মাথার লাল আলোটা মিটমিট করে জ্বলছে। আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে, স্যাটেলাইট ট্র্যান্সমিশন চালু হয়ে গেল। অবশ্য কাজ শুরু হবে ছ'মিনিট পর, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে একটা সিগনাল পৌঁছাতে ওই ছ'মিনিটই লাগে।

কানাই ভাবল, হেড জিয়োলজিস্ট উইলি বেকার-এর ঘুম ভাঙাতে হবে। বেকারের আবার প্রস্তুতি নিতে সময় লাগে। সদ্য ভাঁজ খোলা শার্ট না পরে, ভাল করে মাথা না আঁচড়ে কখনোই ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায় না। ঠিক টিভি রিপোর্টারদের মত।

মাথার উপর একদল বানর চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। কিছু পাতা খসে পড়ল। ডাল ঝাঁকানোর শব্দ হচ্ছে। মুখ তুলে একবার তাকাল কানাই। সকালের দিকে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া আর মারপিট করা এই বানরগুলোর বিচ্ছিরি একটা স্বভাব।

হালকাভাবে কী যেন একটা লাগল তার বুকে। প্রথমে ভাবল পোকাটোকা হবে। তারপর চোখ নামিয়ে খাকি শার্টে তাকাতে লাল একটা দাগ দেখতে পেল। শাঁস সহ লাল কোন ফল হবে জিনিসটা, শার্টের উপর দিয়ে গড়িয়ে নীচের কাদা কাদা জমিনে পড়ল।

ফাজিল বাঁদরগুলো এবার ফল ছুঁড়ে মারছে। জমিনে পড়া লাল

ফলটা তুলবার জন্য ঝুঁকল কানাই। এই সময় সে উপলব্ধি করল জিনিসটা আদৌ কোন ফল নয়।

এটা মানুষের একটা চোখ। দু'আঙুলে ধরা চোখটা থেঁতলানো আর পিচ্ছিল লাগছে, পিছন দিকে সাদা অপটিক নার্ভ এখনও আটকে রয়েছে।

রাইফেলটা একদিক থেকে আরেক দিকে ঘুরিয়ে সুসুর দিকে তাকাল কানাই। সুসু যে পাথরটায় বসেছিল সেটা খালি। সুসুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ক্যাম্পসাইটের উপর দিয়ে ছুটল কানাই।

মাথার উপর বানরগুলো হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে।

তাঁবুর পাশ দিয়ে ছুটবার সময় কাদায় থ্যাচ-থ্যাচ আওয়াজ করছে তার বুট। তারপরই আবার সেই ফোঁস ফোঁস আর হিসহিস শব্দটা কানে এল। আশ্চর্য নরম একটা ধ্বনি; পাক খাওয়া কুয়াশা বয়ে নিয়ে আসছে। কানাই ভাবল তবে কি তার ভুল হয়েছিল? সেটা কি সত্যিই কোন চিতা ছিল?

তারপর সুসুকে দেখতে পেল সে। চিৎ হয়ে আছে সুসু, রক্তে ভেসে যাচ্ছে পাশের মাটি। তার মাথার এক পাশের খুলি ভেঙে ভিতর দিকে ডেবে গেছে। মুখের হাড় একটাও আস্ত নেই। হাঁ-টা এত বড় হয়ে আছে, রীতিমত অশ্লীল দেখাচ্ছে। অবশিষ্ট চোখটা ফুলে বিরাট হয়ে আছে, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই শুধু বাকি। অপর চোখটা আঘাতের তীব্রতায় ছিটকে বেরিয়ে গেছে কোটর ছেড়ে।

লাশটা পরীক্ষা করবার জন্য ঝুঁকল কানাই। তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড এত জোরে লাফাচ্ছে, কানের ভিতর সেটার ধাক্কা অনুভব করছে সে। সুসুর ক্ষতগুলো দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগল, এ-ধরনের আঘাত করা কার পক্ষে সম্ভব?

এই সময় আবার হাঁপানোর আওয়াজটা হলো।

এবার কুকি কানাই নিশ্চিত, এ কোন চিতার শ্বাসকষ্ট নয়। গাছের ডাল থেকে আবার চিৎকার শুরু করল বানরগুলো। লাফ দিয়ে সিধে হলো কানাই। তার গলা থেকে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে।

দুই

কঙ্গো থেকে দশ হাজার মাইল দূরে, ওয়াশিংটনে রয়েছে মাসুদ রানা। পুরানো বান্ধবী কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি ভ্যান্স-এর সঙ্গে কোন এক বিষয়ে একমত হতে না পারায় সামান্য উত্তেজিত।

ব্যাপারটা এভাবে শুরু হয়: প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করবার জন্য পাঁচজন কংগ্রেস সদস্যকে হোয়াইট হাউসে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে; সদস্যরা প্রত্যেকে একজন আত্মীয়, বন্ধু বা নিজের নির্বাচনী এলাকার কোন লোককে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারবেন। তবে সিকিউরিটি খুব কড়া, সঙ্গীর নাম-ধাম-পরিচয় অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে জানাতে হবে।

লরেলি জানে, মিস্টার বুশের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে রানার। সে ভাবল, রানা যখন ওয়াশিংটনে আসছেই, মিস্টার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ওর একবার দেখা করিয়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না। যে পাঁচজন কংগ্রেস সদস্য আমন্ত্রিত হয়েছেন তাঁরা সবাই ইরাকে মার্কিন সৈন্য পাঠাবার ঘোর বিরোধী ছিলেন, ফলে তাঁদের সামনে রানার যুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেলে ব্যাপারটা বেমানান লাগবে না।

এনএসএ রানাকে হোয়াইট হাউসে ঢুকতে দেবে, এটা আশা করা নেহাতই বোকামি। বর্তমান মার্কিন সরকার আর তার নীতি সম্পর্কে ওর মনোভাব তারা ভাল করেই জানে। তা ছাড়া, জাতীয় নিরাপত্তার এই সংকটময় মুহূর্তে একজন এসপিওনাজ এজেন্টকে প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি যেতে দেওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কী ঘটবে আন্দাজ করে নিয়ে লরেলি শুধু এনএসএ-কে নয়,

হোয়াইট হাউসকেও জানিয়ে দিল তার সঙ্গে কে যাচ্ছে। সে জানে এর পর কী ঘটবে। এনএসএ বলবে, মাসুদ রানাকে হোয়াইট হাউসে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। শুনে হোয়াইট হাউস বলবে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট চান মিস্টার রানা ব্রেকফাস্টে উপস্থিত থাকুন।

প্রেসিডেন্টের ইচ্ছের উপর আর কোন কথা চলে না।

চললও না।

এনএসএ জানিয়ে দিল, মিস্টার মাসুদ রানাকে সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স দেওয়া হলো।

এ-সবই ঘটল রানার অগোচরে। ও যে ওয়াশিংটনে ছুটি কাটাতে আসছে, এটা লরেলি তিন দিন আগে ওর কাছ থেকেই টেলিফোনে জেনেছে। রানার প্ল্যান হলো, ছুটির শেষ দিকটা লরেলিকে নিয়ে হলিউডে কাটাবে। ওখানে দু'জনেরই অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে।

এয়ারপোর্টে রানাকে রিসিভ করল লরেলি। ঝকঝকে একটা মার্সিডিজে ওকে তুলে নিয়ে ঝড়ের বেগে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরল সে।

তিন ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়ার পর ডিনার খেতে বসে রানা খেয়াল করল, লরেলি খুব কম কথা বলছে। ডিনার শেষ হওয়ার পর চোখাচোখি হতে হাসল লরেলি।

'তোমার হাসিটায় কী যেন একটা রহস্য আছে', ভুরু সামান্য কুঁচকে মন্তব্য করল রানা।

'তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব,' বলল লরেলি। 'তুমি ব্যাপারটা কী ভাবে নেবে জানি না তো, তাই একটু নার্ভাস ফিল করছি।'

'ও। তা সারপ্রাইজ যখন; দেখা যাক চমকাই কি না।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলেই ফেলল লরেলি, 'কাল সকালে মিস্টার প্রেসিডেন্টের ওখানে আমার ব্রেকফাস্টের দাওয়াত। তুমিও আমার সঙ্গে যাচ্ছ।'

রানা বিস্মিত, তবে প্রথমেই যে প্রশ্নটা ওর মাথায় জাগল: এনএসএ অনুমতি দিল?

ওর এই প্রশ্ন শুনে দীর্ঘ একটা ব্যাখ্যা দিল লরেলি। সংক্ষেপে সেটা এরকম: প্রেসিডেন্ট বুশ যে-সব যুক্তি ও তথ্য দেখিয়ে ইরাক আক্রমণ করেছিলেন সেগুলো সঠিক ছিল কী না তা যাচাই করে দেখবার জন্য

লরেলির নেতৃত্বে কংগ্রেস অত্যন্ত শক্তিশালী একটা কমিটি গঠন করেছে। প্রয়োজনে এই কমিটি প্রেসিডেন্টকেও সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তলব করতে পারবে। আগামী মাস থেকে তদন্ত শুরু করবে তারা। এরকম একটা গুরুতর আর স্পর্শকাতর বিষয় লরেলির হাতে থাকায়, জানা কথা হোয়াইট হাউস তাকে চটাতে চাইবে না। সত্যি চটায়ওনি।

রানা ভাবল, ওকে না জানিয়ে এরকম একটা কাজ করা লরেলির মোটেও উচিত হয়নি। তবে বন্ধুত্বের অধিকার বলে একটা কথা আছে, তাই তাকে তিরস্কার করাও চলে না। তা ছাড়া, মার্কিন রাজনীতিতে তিন পুরুষ ধরে ভ্যান্স পরিবারের রয়েছে বিশেষ প্রভাব; স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে ছিল ওরা, অনেক সাহায্যও করেছে। হোয়াইট হাউসে অবশ্যই যাবে না ও। সেটা প্রকাশ করতে হবে কৌশলে, লরেলি যাতে আহত না হয়।

'মাই গড! তোমার কোন প্রতিক্রিয়া নেই!' লরেলি হতচকিত।

শার্টের উপর দিয়ে পিঠ চুলকে রানা বলল, 'তোমাকে কথাটা বলা হয়নি, আমার আসলে মিলমিলা হয়েছে।'

'মিলমিলা? মিলমিলা আবার কী?'

'মানে হাম আর কী। মাঝে-মধ্যে বড়দেরও হয়। বেশ ছোঁয়াচে। ভাবছি এখানে না থেকে আমার উচিত হোটেলে–, লরেলির থমথমে চেহারা দেখে চুপ করে গেল রানা।

দশ সেকেন্ড কারও মুখে কথা নেই। অবশেষে লরেলি নীরবতা ভেঙে বলল, 'বুঝলাম। তুমি যেতে চাও না। কিন্তু কেন, রানা?'

'সময়টা আমি একা শুধু তোমার জন্যে আলাদা করে রেখেছি,' বলে চুপ করে থাকল রানা, যেন ব্যাখ্যা যা দেওয়ার তা দেওয়া হয়ে গেছে।

'কিন্তু তুমি তো আমার সঙ্গে যাবে, আমাকেই সঙ্গ দেবে,' যুক্তি দেখাল লরেলি।

একমত হতে না পেরে রানা সামান্য উত্তেজিত। 'এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সামনে একটা দানব বসে আছে, এটা জানবার পর কাউকে সঙ্গ দেয়া সম্ভব নয়।'

সাবধান হয়ে গেল লরেলি, উপলব্ধি করল আলোচনাটা আর

বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। আহত হয়নি সে। অবশ্যই খানিকটা বিব্রত। তবে সময়টা তার জন্য রানা আলাদা করে রেখেছে, এটা শুনে গভীর এক তৃপ্তি আর আনন্দ অনুভব করছে।

লরেলি সিদ্ধান্ত নিল, সে-ও আপাতত হোয়াইট হাউসে যাবে না। আসলে বিশেষ তদন্ত কমিটির লিডার নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে ব্রেকফাস্ট খেতে ডাকা হোয়াইট হাউসেরই উচিত হয়নি। 'বেশ, এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি,' বলল সে। 'এবার শোনা যাক আমাকে নিয়ে কী করবে বলে ঠিক করেছ।'

কোন রকমে হাসি চেপে রানা বলল, 'এখন আমরা শপিং করতে বেরুব। ওয়াশিংটনের বাঙালী পাড়াটা চেনো তো? ওখানে আমার এক বন্ধু আর তার বউ আছে, কাল তাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী।'

লরেলি হাসি হাসি মুখ করে একটু বাঁকা চোখে তাকাল। 'শপিং-এর সঙ্গে এই বিবাহবার্ষিকীর কী সম্পর্ক?'

'ওই অনুষ্ঠানে আমরা দু'জনেই আমন্ত্রিত,' বলল রানা। 'ওখানে তুমি যাবে আপাদমস্তক নিখুঁত একটি বাঙালী তরুণী সেজে। আমি নিজের হাতে তোমাকে শাড়ি পরাব। কপালে বড় একটা টিপ এঁকে দেব। তুমি এক হাতে পরবে বিশটা চুড়ি, আরেক হাতে একটা চূড়। খোঁপায় থাকবে তাজা বেলি ফুলের মালা-,' টেবিল থেকে মোবাইল তুলে নম্বর টিপছে লরেলি, দেখে থেমে গেল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কী করছ?'

'আজ রাতে একবার আমাদের ব্যব প্রতিষ্ঠানের হেড অফিসে যাব ভেবেছিলাম। ওখানে মা, ভাই আর সিসিলিয়ার সঙ্গে একটা মিটিঙে বসবার কথা,' বলল লরেলি। 'জানিয়ে দিই আজ আর হলো না।'

'ও, হ্যাঁ, তোমাদের তো আবার বিরাট একটা পারিবারিক ব্যবসাও আছে। ওটা বোধহয় তোমার চাচাতো বোন সিসিলিয়াই চালায়, তাই না?' বলে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'তা হেড অফিসটা যেন কোথায়?'

'এই তো, মাইল চারেক দূরে–ভ্যান্স টাওয়ারে,' বলল লরেলি।

'হাতে যে সময় আছে, শপিং-এর আগে একবার ঘুরে আসতে পারো,' বলল রানা। 'তবে খুব বেশি দেরি করতে পারবে না।'

'তথাস্তু!' বলে টেবিল ছাড়ল লরেলি। 'তবে ওখানে তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে যাচ্ছ। অ্যান্ড বিলিভ মি, দেয়ার উইল বি নো সো-কল্ড দানব!'

ভ্যান্স টাওয়ার কাঁচ দিয়ে মোড়া বিশতলা বিল্ডিং। পুরোটাই ভিআরএমসি-র অফিস। প্রায় দু'হাজার অফিস স্টাফ কাজ করছে এখানে। কাজ মানে, দুনিয়ার কোথায় কী খনিজ পদার্থ উত্তোলনের অপেক্ষায় আছে তার খোঁজ বের করা।

এই একটা কাজ থেকে আরও কাজ বেরোয়। খোঁজ পাওয়ার পর উত্তোলন বা আহরণ লাভজনক হবে কি না দেখা হয়। তারপর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে দর কষাকষি। অনুকূল চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হলে হাত দেওয়া হয় আসল কাজে।

চলতি বছরের জুন মাসে ভ্যান্স রিসোর্সেস অ্যান্ড মাইনিং কোম্পানির হাতে বেশ ক'টা অনুসন্ধানের দায়িত্ব বর্তেছে। বলিভিয়ায় চলছে ইউরেনিয়ামের খোঁজ। পাকিস্তানে তামা। যাচাই করে দেখা হচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকায় হাইব্রিড গম ফলিয়ে পঞ্চাশ কোটি মানুষকে সারা বছর খাওয়ানো সম্ভব কি না। মালয়েশিয়ায় চলছে বাঁশঝাড় গণনা। কঙ্গোয় জিয়োলজিস্টদের একটা টিম পাঠানো হয়েছে ডায়মন্ড ডিপজিট খুঁজে বের করবার জন্য।

'তোমরা আমার দেশে কিছু খুঁজছ না?' সিসিলিয়াকে জিজ্ঞেস করল রানা। দুই বোনের সঙ্গে ভ্যান্স টাওয়ারের এলিভেটরে রয়েছে ও। লরেলির সঙ্গে রানাও আসছে, টেলিফোনে এই খবর পেয়ে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য টাওয়ার ভবনের নীচতলায় নেমে এসেছে সিসিলিয়া; শুধু করমর্দন করেনি, মৃদু আলিঙ্গন করে পারিবারিক বন্ধুত্বের স্বীকৃতিও দিয়েছে রানাকে।

মিস্টার মর্টন ভ্যান্স ও তাঁর ছোট ভাই শুরু করেছিলেন এই ব্যবসা আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে। ছোট ভাই ক্যান্সারে মারা গেলে তার একমাত্র মেয়ে সিসিলিয়াকে মানুষ করবার দায়িত্ব বর্তায় মর্টনের স্ত্রী মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্সের উপর। মায়ের মত আদর-যত্ন দিয়ে মানুষ করেছেন তিনি মেয়েটিকে। তারপর তো মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন

মর্টন ভ্যান্স, বড় ছেলে রবার্ট পা হারাল, তিনি নিজেও আক্রান্ত হলেন প্যারালিসিসে। হুইল-চেয়ারে বসেই তিনি হাল ধরলেন ব্যবসার। দশ বছরে দশগুণ বাড়িয়েছেন তিনি স্বামী ও দেওরের ব্যবসাটা। তারপর সিসিলিয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন এটার পরিচালনার ভার।

এগারোতলায় উঠছে ওরা। সিসিলিয়ার চেম্বারটা ওখানেই। 'স্টাডি করবার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে,' রানার প্রশ্নের জবাব দিল সিসিলিয়া। 'আমরা আশা করছি কক্সবাজারে ইউরেনিয়াম পাওয়া যাবে। রাঙ্গামাটি আর খাগড়াছড়িতে তামা, টিন আর সোনা পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশ উজ্জ্বল।'

'কীভাবে জানলে?' রানার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জের সুর।

'আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট আছে–ঈগলস্যাট–ওটার পাঠানো ফটো কমপিউটারকে দিয়ে বিশ্লেষণ করিয়ে আভাস পেয়েছি।'

সিসিলিয়ার চেম্বারের সামনে, চওড়া মার্বেল করিডরে কয়েকজন অফিসার অপেক্ষা করছেন। তাদের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল ও।

কোম্পানির প্রজেক্ট ডিরেক্টর মার্ক জিলেট মধ্যবয়স্ক হলেও দাঁড়াবার ভঙ্গিটা অত্যন্ত ঋজু, আচরণ আর কথাবার্তায় দারুণ স্মার্ট। দুইবোন আর রানার সঙ্গে একমাত্র তিনিই চেম্বারের ভিতর ঢুকলেন।

'ম্যাডাম, আপনাদের দুজনকেই বলছি, আজকের মিটিংটা খানিক আগে বাতিল করা হয়েছে,' বললেন তিনি। 'কারণ, আর দশ মিনিট পর থেকে আমাদের কঙ্গো ফিল্ড পার্টি লাইভ রিপোর্ট পাঠাতে শুরু করবে। মিসেস ভ্যান্স আর মিস্টার রবার্ট সিসি-তে চলে গেছেন।'

'গড্! এত তাড়াতাড়ি!' হেসে উঠল সিসিলিয়া, হঠাৎ উত্তেজিত। 'তা হলে এখানে কী করছি আমরা, মিস্টার জিলেট? আপনি আমাদেরকে কমিউনিকেশন সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন?'

ছোট্ট করে বাউ করলেন মার্ক জিলেট। 'প্লিজ!' হাত তুলে খোলা দরজাটা দেখালেন।

এলিভেটরে চড়ে এবার ছ'তলায় নামতে হলো ওদেরকে। কমিউনিকেশন রুমে ঢুকবার আগে সিকিউরিটি চেক পোস্ট-এ কয়েকবার থামতে হলো। সিসিলিয়ার নির্দেশে রানার হাতের ছাপ,

কণ্ঠস্বরের নমুনা ইত্যাদি রেকর্ড করে কমপিউটারে ভরা হলো, কেননা তা না হলে রোবোটিক সিকিউরিটি গার্ড দরজার তালা খুলবে না।

ভিতরে এলাহি কাণ্ড চলছে। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত ডজন ডজন ভিডিও মনিটর আর LED আভা ছড়াচ্ছে। টেকনিশিয়ানরা কথা বলছে ফিসফিস করে। সবাই নব ঘুরিয়ে ডায়াল সেট করতে ব্যস্ত।

মিসেস ভ্যান্স ছেলে রবার্ট ভ্যান্সকে নিয়ে চারদিকটা ঘুরে ফিরে দেখছেন। ষাটের উপর বয়স, তবে এখনও তিনি রূপসী। মাসুদ রানার সঙ্গে আফ্রিকায় গিয়ে ছোট মেয়ে জেসিকার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার পরই দ্রুত সেরে উঠেছেন তিনি পক্ষাঘাত থেকে, কিছুদিনের মধ্যেই হুইলচেয়ার ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁদের সন্তানদের মধ্যে রবার্টই সবার বড়। রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল সে, ডান পা-টা কাটা পড়েছিল উরুসন্ধির কাছ থেকে। ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটে। রবার্ট এখন একটা কলেজে দর্শন পড়ায়।

রানার সঙ্গে রবার্ট করমর্দন করল। মিসেস ভ্যান্স রীতিমত জড়িয়ে ধরলেন ওকে। অবাক হল রানা, কোথায় মহিলার শারীরিক অসুস্থতা, সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর বদমেজাজ? দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছেন এখন হাসিমুখে।

একটা কনসোলের সামনে বসল সিসিলিয়া, ওর দু'পাশে অর্ধ-বৃত্তাকারে বসেছে রানা, লরেলি, রবার্ট, মিসেস ভ্যান্স আর মার্ক জিলেট। কনসোলের মাথায় ছাপান্ন ইঞ্চি ভিডিও মনিটর। মনিটরের এক কোণে উপগ্রহ, অর্থাৎ ঈগলস্যাট-এর ফ্লাইট পাথ লাল-সবুজ ডট চিহ্ন দিয়ে দেখানো হচ্ছে।

'কঙ্গোর রেইন ফরেস্টে আমাদের একটা টিম কাজ করছে, ওদের সঙ্গে আমাদের একটা টেলি-কনফারেন্স শুরু হবে,' বিশেষ করে লরেলি ও রানার উদ্দেশে বললেন মার্ক জিলেট। 'ওখানে এখন সকাল। জমিন থেকে সাতশো বিশ মাইল ওপরে রয়েছে আমাদের স্যাটেলাইট।'

অপারেটররা বসেছে ওদের পাশে, দশ ফুট ব্যবধান রেখে। ট্র্যান্সমিশন শুরু করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা

'সিগনাল কী।'

'সিগনাল কী।'

'পাসওয়ার্ড মার্ক।'

'পাসওয়ার্ড মার্ক।'

'ক্যারিয়ার ফিক্স।'

'ক্যারিয়ার ফিক্স! উই আর রোলিং।'

লরেলি বলল, 'কিছু মনে কোরো না, প্লিজ, রানা। দশ মিনিটের মধ্যে কনফারেন্সটা সেরে ফেলব আমি।'

'কিছুই মনে করছি না,' বলল রানা। 'আমি বরং ব্যাপারটা এনজয় করছি।'

সিসিলিয়া হঠাৎ উদ্বিগ্ন, ওদের কথা ভাল করে বোধহয় শুনতে পায়নি। কারণ হলো, ট্র্যান্সমিশন শুরু হওয়ার পরও স্ক্রিনে ধূসর মাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সেই মাঠও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ঘন ঘন। স্ক্রিনে নানা রকম অবাঞ্ছিত রেখা আর দাগ ফুটছে।

'কারা ওপেন করল, ওরা না আমরা?' জানতে চাইল সিসিলিয়া।

'কল শিটে মেসেজ পাঠিয়ে আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম ওরা যেন স্থানীয় সময় সকালে চেক করে। না করায় আমরা যোগাযোগ করি,' পাশের কনসোল থেকে প্রধান টেকনিশিয়ান জানাল।

'ভাবছি কী কারণে ওরা শুরু করেনি,' বলল সিসিলিয়া। 'কোন ধরনের যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়নি তো?'

'মনে হয় না,' বললেন জিলেট। 'আমাদের ইনিসিয়েশন মেসেজ পিক করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কোড বাটনে চাপ দিয়ে পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে স্যালোইট লিঙ্ক লক করে দিয়েছে ওরা।'

'এ-সব অটোমেটিক্যালিও ঘটতে পারে...'

'ওই শুরু হয়েছে, ম্যাডাম!'

কঙ্গো সময় ছ'টা বাইশ মিনিটে ট্র্যান্সমিশন শুরু হলো। ঝাপসা ধূসর ভাব, চঞ্চল রেখা আর হিজিবিজি দাগ সরে গেল। স্ক্রিন এখন পরিষ্কার।

কঙ্গো ফিল্ড পার্টির ক্যাম্প দেখতে পাচ্ছে ওরা। আসলে ক্যাম্পের একটা অংশ। দৃশ্যটা সম্ভবত ধারণ করছে তেপায়ার উপর বসানো একটা ভিডিও ক্যামেরা। দুটো তাঁবু দেখতে পাচ্ছে ওরা। প্রায় নিভে আসা, শিখাবিহীন একটা আগুন। রোদ ওঠা সত্ত্বেও এখানে সেখানে রয়ে যাওয়া কুয়াশা। কোন রকম তৎপরতা চোখে পড়ছে না। টেলি-

কনফারেন্সের প্রস্তুতি নেওয়া দূরের কথা, স্ক্রিনে কাউকে দেখাই যাচ্ছে না।

প্রধান টেকনিশিয়ান হেসে ফেলল। 'ওরা আমাদের কাছে ঘুমের মধ্যে ধরা খেয়েছে!'

'তোমার রিমোট লক করো,' নির্দেশ দিল সিসিলিয়া।

টেকনিশিয়ান তার কনসোলের কয়েকটা বোতামে চাপ দিল। দশ হাজার মাইল দূরের ফিল্ড ক্যামেরা ওয়াশিংটনের, অর্থাৎ ওদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল।

'প্যান স্ক্যান,' বলল সিসিলিয়া।

দ্বিতীয় কনসোলের সামনে বসা প্রধান টেকনিশিয়ান একটা জয়স্টিক ব্যবহার করছে। ভিডিও ইমেজ বাম দিকে সরে যাচ্ছে, ফলে ক্যাম্পের আরও কিছু অংশ ওদের দৃষ্টিপথে চলে এল।

ক্যাম্পটা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁবু ছিঁড়ে ফালা ফালা। সাপ্লাই বক্সের স্তূপে চাপা দেওয়া তেরপলটা এখন কাদায় লুটাচ্ছে। ক্যাম্পের বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট ভেঙে চুরমার করা হয়েছে। একটা তাঁবু পুড়ছে, উপরে উঠছে কালো ধোঁয়ার মোটা স্তম্ভ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল কয়েকটা লাশ।

'জিসাস!' একজন টেকনিশিয়ান বিড়বিড় করল।

সিসিলিয়ার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে। 'ব্যাক স্ক্যান,' বেসুরো গলায় বলল সে।

'এ-সব কী ঘটছে?' জানতে চাইল লরেলি।

কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না।

ক্যাম্পের উপর দিয়ে ঘুরে গেল ক্যামেরা। স্ক্রিনে জঙ্গল দেখতে পাচ্ছে ওরা। এখনও কিছু নড়ছে না। কোথাও প্রাণের কোন সাড়া নেই।

'ডাউন প্যান,' বলল সিসিলিয়া, কনসোলের আলো পড়ায় মুখটাকে খোদাই করা পাথর বলে মনে হচ্ছে। 'রিভার্স সুইপ।'

পোর্টেবল অ্যান্টেনার সিলভার ডিশ-এর দিকে ঘুরে গেল ক্যামেরা। ওটার পাশে রয়েছে ট্র্যান্সমিটারের কালো বাক্সটা। কাছাকাছি আরও একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। জিয়োলজিস্টদের

একজন, চিৎ হয়ে রয়েছে।

'জিসাস, আমাদের সাইমন!' চিনতে পেরে বিড় বিড় করলেন প্রজেক্ট ডিরেক্টর জিলেট।

'জুম অ্যান্ড টি-লক,' বলল সিসিলিয়া। ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ক্যামেরা লাশের মুখ আকারে বড় করে দেখাচ্ছে। এরকম বীভৎস দৃশ্য ওরা কেউ দেখবে বলে আশা করেনি। মাথাটা গুঁড়িয়ে গেছে, নাক আর চোখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। মুখ আকাশের দিকে হাঁ করা।

'এ কার পক্ষে সম্ভব?'

এই সময় লাশের মুখে একটা ছায়া পড়ল। পাশের কনসোল অপারেটরকে নির্দেশ না দিয়ে সিসিলিয়া নিজের কনসোলের দিকে ঝুঁকে জয়স্টিকটা খপ করে ধরে ফেলল। জুম কন্ট্রোল অপারেট করল সে। ইমেজটা চওড়া হলো স্ক্রিনে। ওরা এখন ছায়াটার আউটলাইন দেখতে পাচ্ছে। একজন মানুষ। নড়ছে সে।

'বেঁচে আছে! কেউ একজন বেঁচে আছে!'

'খোঁড়াচ্ছে। মনে হয় আহত।'

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো রানার। স্ক্রিনের ছায়াটাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে ও। ওটাকে খোঁড়া একজন মানুষ বলে ভাবতে পারছে না। কোথায় যেন কী একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে। কী সেটা?

সিসিলিয়ার গলা শোনা গেল: 'মনে হচ্ছে লোকটা লেন্সের সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে।' এটা আসলে তার আশা, সত্যি যাবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। ওটা কী ধরনের অডিও স্ট্যাটিক?'

ওরা অদ্ভুত একটা শব্দ শুনছে। কে বা কী যেন হিসহিস করছে বা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

'স্ট্যাটিক নয়। আওয়াজটা ট্র্যান্সমিট হয়েই আসছে।'

'রিজল্ভ্ ইট,' নির্দেশ দিল সিসিলিয়া।

এটা-সেটার বোতাম টিপল টেকনিশিয়ানরা। অডিও ফ্রিকোয়েন্সি বদলাল। কিন্তু শব্দটা আগের মতই অদ্ভুত আর অস্ফুট রয়ে গেল।

তারপর আবার স্ক্রিনে নড়ে উঠল সেই ছায়া। পা ফেলে লেন্সের একেবারে সামনে চলে এল লোকটা।

'ডাইঅপটার,' সিসিলিয়া তাড়াতাড়িই বলল, কিন্তু তারপরও দেরি হয়ে গেছে। মুখটা এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে, কিন্তু লেন্সের অতিরিক্ত কাছে। এত কাছে যে ডাইঅপটার ছাড়া ফোকাস করা সম্ভব নয়।

ওরা ঝাপসা একটা আকৃতিই শুধু দেখতে পেল। বুঝবার কোন উপায় নেই কী সেটা। বোতাম টিপে ডাইঅপটার কাজে লাগানোর আগেই লেন্সের সামনে থেকে সরে গেল ওটা।

'স্থানীয় কোন লোক? নেটিভ?'

প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাথা নাড়লেন। 'আপনিও জানেন, ম্যাডাম, কঙ্গোর এই এলাকায় লোক বসতি নেই।'

'তবে কিছু একটা তো অবশ্যই আছে,' মন্তব্য করল রানা।

'কী?' হতভম্ব দেখাচ্ছে লরেলিকে।

'প্যান স্ক্যান,' টেকনিশিয়ানদের বলল সিসিলিয়া। 'দেখো লোকটাকে আবার স্ক্রিনে ফিরিয়ে আনা যায় কিনা।'

ক্যামেরা প্যান করছে, অর্থাৎ ঘুরছে। কল্পনার চোখে সবাই ওরা দেখতে পাচ্ছে–জঙ্গলের ভিতর একটা উঁচু তেপায়ার মাথায় বসানো রয়েছে ক্যামেরাটা, মোটরের মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জনের সঙ্গে লেন্সের মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ স্ক্রিনের দৃশ্য কাত হয়ে গেল, পড়ে গেল একদিকে।

'ক্যামেরা ফেলে দিয়েছে।'

'ড্যাম!'

ভিডিও ইমেজে ফাটল ধরল। বিচিত্র প্যাটার্নের রেখা দ্রুত আসা-যাওয়া করছে। এত সব বাধার ভিতর আসল ছবিটা হারিয়ে যাচ্ছে।

'রিজল্ভ্ ইট! রিজল্ভ্ ইট!'

শেষ একবার বড়সড় একটা মুখ আর ঝাপসা একটা হাত দেখতে পেল ওরা। ডিশ অ্যান্টেনাটা ভাঙছে। কঙ্গো থেকে আসা ইমেজ কুঁকড়ে একটা বিন্দুতে পরিণত হলো, তারপর স্ক্রিন থেকে মুছে গেল নিঃশেষে।

তিন

কমিউনিকেশন রুমের কেউ এক চুল নড়ল না ঝাড়া দশ সেকেন্ড।

ভ্যান্স রিসোর্সেস অ্যান্ড মাইনিং কোম্পানির অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। কঙ্গো অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ। টিমের সবাই মারা গেছে। শুধু বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানই ছিল আটজন। পোর্টারদের সঠিক সংখ্যা বলা মুশকিল, তবে বারোজনের কম হবে না। ভিআরএমসি-র ইতিহাসে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি কখনও আর। এই খবর কঙ্গো সরকারের কানে গেলে হীরা অনুসন্ধানের এইখানেই পরিসমাপ্তি।

সিসিলিয়াই প্রথম নীরবতা ভাঙল। 'দশ মিনিটের মধ্যে ইমার্জেন্সি মিটিং,' চেয়ার ছেড়ে প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে বলল সে, কণ্ঠস্বরে বা চোখে-মুখে এতটুকু আবেগ নেই। 'প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের হেডকে আসতে বলে দিন।'

'ইয়েস, ম্যাডাম।' প্রজেক্ট ডিরেক্টর চেয়ার ছাড়লেন।

রানার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল লরেলি, তারপর ঘুরে দরজার দিকে এগোল। তার পিছু নিতে যাবে রানা, এই সময় হঠাৎ আবার ঘুরে দাঁড়াল লরেলি, তাকাল সরাসরি মার্ক জিলেটের দিকে: 'মিটিং শুরু হওয়ার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে।'

'ইয়েস, ম্যাডাম?'

'আপনি জানেন ওখানে কী ঘটেছে?' প্রশ্ন করল লরেলি।

'আমি বোধহয় জানি,' অস্ফুটে বলল রানা।

জিলেট জবাব দিলেন রানা থামবার আগেই: 'না, জানি না, ম্যাডাম। তবে জানতে পারব।'

'কীভাবে?' এই প্রশ্নটা সিসিলিয়ার, ওদের পাশেই রয়েছে সে।

'টেপ থেকে।'

'টেপ তো সবাই আমরা দেখলাম ঝাপসা, কিছু বোঝা যায় না।'

'এখন বোঝা যাচ্ছে না, তবে এক্সপার্টদের হাতে পড়লে ওই ঝাপসা ইমেজের ভেতর থেকেই তারা অনেক তথ্য বের করে আনবে। আমি ওদের কাছে একটা সেভেন ব্যান্ড ভিজুয়াল অ্যান্ড অডিও স্যালভিজ চাইব।'

'রিপোর্ট দিতে কতক্ষণ সময় নেবে ওরা?'

'এখনই শুরু করলে আধঘণ্টার বেশি নয়।'

'ডু ইট,' নির্দেশ দিল সিসিলিয়া।

কমিউনিকেশন রুম থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে লরেলি বলল, 'সত্যি দুঃখিত, রানা। শপিং তো বাদই, বন্ধুর বিবাহবার্ষিকীতেও একা যেতে হবে তোমাকে। গুড নাইট। যাও, ছুটিটা এনজয় করো।'

'তুমি তো দেখছি আচ্ছা লোক!' রেগে উঠল রানা। 'কী করে ভাবলে যে এরকম একটা বিপদের মধ্যে তোমাদেরকে আমি একা ফেলে চলে যেতে পারি?'

রানার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল লরেলি। 'ঠিক আছে, ভুলে যাও।'

কনফারেন্স রুমটা আঠারোতলায়। রানাকে নিয়ে সবার আগে ওখানে পৌঁছাল ওরা দুই বোন। সিসিলিয়ার ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত ভাব হঠাৎ করেই খসে পড়ল, নিজেকে সিধে রাখবার জন্য লরেলির একটা কাঁধ ধরতে হলো তাকে। 'বলতে পারো,' আবেগ কম্পিত কণ্ঠস্বর, 'এতগুলো পরিবারকে কী জবাব দেব আমি?'

'হ্যাঁ, এ খুব কঠিন দায়িত্ব,' নরম সুরে বলল লরেলি। কয়েক পা হাঁটিয়ে এনে কনফারেন্স টেবিলের মাথার চেয়ারটায় বসিয়ে দিল সিসিলিয়াকে। 'তবে তুই শান্ত হ। খবরটা লিক হওয়ার ভয় যদি না থাকে, এখনই কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন?' সিসিলিয়া মুখ তুলে তাকাল।

'লরেলি ঠিকই বলেছে,' বলল রানা। 'আগে তোমাকে ফাইনাল রিপোর্ট পেতে হবে, নিশ্চিতভাবে জানতে হবে আসলে কী ঘটেছে

ওখানে।'

'ঠিক বলেছ তুমি, মাসুদ ভাই। অবশ্যই জানতে হবে।' হঠাৎ ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল সিসিলিয়া। 'ওখানে...কমিউনিকেশন রুমে...লরেলি আর মিস্টার জিলেটের কথার মাঝখানে তুমি তখন কী বললে? বললে...ওখানে কী ঘটেছে তুমি বোধহয় জানো, রাইট?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অডিওতে যে আওয়াজটা হচ্ছিল, এ-ধরনের আওয়াজের কথা ডক্টর আনন্দ সেনের মুখে শুনেছি আমি। তার শৈলী প্রচণ্ড রেগে গেলে এরকম আওয়াজ করে।'

'কে তিনি? আর শৈলীই বা কে?'

'আনন্দ সেন আমার বন্ধু। শৈলী তার পোষা গরিলা।'

'তুমি বলতে চাইছ আমাদের কঙ্গো ক্যাম্প ধ্বংস করেছে, টিমের সবাইকে খুন করেছে একদল গরিলা?'

'ছায়ার মাথাটা খেয়াল করেছ? ওপর দিকটা ক্রমশ সরু মনে হয়নি?'

রানার কাঁধে একটা হাত রাখল লরেলি। 'মাই গড, রানা! ইয়েস! ইউ আর রাইট!'

'কী সাংঘাতিক! আমার তো মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মাসুদ ভাই!' সিসিলিয়া ভয়ানক উদ্বিগ্ন।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক দশ মিনিটের মাথায় শুরু হলো মিটিং। রিসার্চ, অ্যাকাউন্টস, অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, লিগাল আর লজিস্টিকস্ ডিপার্টমেন্টের একজন করে প্রতিনিধি ছাড়াও প্রজেক্ট ডিরেক্টর মার্ক জিলেট অংশ নিচ্ছেন।

টেবিলের মাথায় বসেছেন কোম্পানির চেয়ার পারসন মিসেস ফেয়ারলি ভ্যান্স, তাঁর দুপাশে রবার্ট ও লরেলি। সিসিলিয়া বসেছে টেবিলের আরেক মাথায়। রানার চেয়ার লরেলির পাশেই।

শুরুতেই সবাইকে চমকে দিল সিসিলিয়া। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব–খুব বেশি হলে নব্বুই ঘণ্টার মধ্যে–নতুন একটা টিম নিয়ে কঙ্গোয় যাচ্ছি আমি। আপনারা যারা স্বেচ্ছাসেবক হতে চান–'

গুঞ্জন উঠল। স্টাফ প্রায় সবাই প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কঙ্গোর ওই এলাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবার সম্ভাবনা প্রায়

নেই বললেই চলে। তারা তাদের কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে এত বড় ঝুঁকি নিতে দিতে রাজি নয়।

মিসেস ভ্যান্স তাঁর দেওর-কন্যা সুন্দরী মেয়েটিকে ভাল ভাবেই চেনেন, একবার যদি মুখ থেকে কোনও কথা বের করে, সেটা ফিরিয়ে নিতে জানে না। অসম্ভব আত্মবিশ্বাস ওর, ঠিক তাঁরই মত, জেদটাও তেমনি অবিচল। তিনি জানেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভেবেচিন্তে কথা বলতে হবে, কাজেই আপাতত চুপ করে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়ে দার্শনিক পুত্রের দিকে তাকালেন।

রবার্ট বলল, 'যেতে চাইছে, যাক না। কঙ্গোয় আমাদের লোকজন বিপদে পড়েছে, তাদের সাহায্য দরকার। বেশি হাঁটাহাঁটি বা ছুটোছুটি করতে না হলে আমিও যেতে চাই।'

হতাশ হয়ে বাতাসে হাত ঝাপটালেন মিসেস ভ্যান্স, তারপর লরেলির দিকে ফিরলেন।

লরেলিও ছোটবোনের জেদ সম্পর্কে জানে, তবে ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে তার কিছুটা শক্ত হওয়া দরকার বলে মনে করছে সে।

'না,' এক কথায় নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল লরেলি।

'কেন না?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিসিলিয়া।

'কারণ, কঙ্গো ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জায়গা,' বলল লরেলি। 'ওখানে জংলীদের রাজত্ব, হিংস্র প্রাণীদের বসবাস।'

'তা হলে ওখানে খনিজ সম্পদের খোঁজে আমরা লোকজনকে পাঠাই কেন?' প্রশ্ন করল সিসিলিয়া। 'ওদের কি নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই? না কি ওদের প্রাণের মূল্য নেই?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে লরেলি জবাব দিল, 'কিন্তু তুই ভুলে যাচ্ছিস যে ওরা সবাই পুরুষ, তুই মেয়ে। মেয়েদের নিরাপত্তার দিকটা অনেক বেশি জটিল।'

হেসে ফেলল সিসিলিয়া। 'কী জানি কেন জটিল বলছিস তুই। কিন্তু আমাদের বেশ কয়েকটা টিমই তো এই মুহূর্তে দুনিয়ার বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় কাজ করছে, আর সে-সব টিমে মেয়েরাও আছে।'

লরেলি গম্ভীর হল, কথা বলছে না।

এবার মুখ খুললেন মিসেস ভ্যান্স। 'যার মতামতের দাম আছে

'তাকেই আমরা কিছু জিজ্ঞেস করছি না,' বলে রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'ওকে একজন বর্ন অ্যাডভেঞ্চারার হিসেবে চিনি আমি। সত্যিকার দুঃসাহসী ছেলে। তুমি কী বলো, মাই বয়?'

'আমার ধারণা, অন্য যে-কোনও দুর্গম জায়গার চেয়ে কঙ্গোর রেইন ফরেস্ট অনেক বেশি বিপজ্জনক,' বলল রানা। 'তবে বিপজ্জনক বলেই যে সেখানে শুধু পুরুষরা যেতে পারবে, মেয়েরা পারবে না, আমি তা মনে করি না।'

ব্যস, উৎসাহ পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সিসিলিয়া, 'শুনলি, লরেলি? শুনলি মাসুদ ভাই কী বলল? অভিজ্ঞ একজনের মতামত যখন পাওয়া গেছে, আর কেউ আমাকে বাধা দিতে এসো না।' অফিসারদের দিকে ফিরল সে, 'আমি যাচ্ছি, এটা ধরে নিয়ে টিম গঠন করুন আপনারা। এর কোনও বিকল্প নেই, আমাকে জানতে হবে বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানদের কপালে কী ঘটেছে।'

মা-মেয়ে, অর্থাৎ মিসেস ভ্যান্স ও লরেলি, অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল; দুজনেই চোরা চোখে একবার করে তাকাল রানার দিকে।

'ঠিক আছে,' নরম সুরে বললেন মিসেস ভ্যান্স। 'ঠিক আছে, তুমি যাচ্ছ। তবে, একটা শর্ত আছে'

'শর্ত? কী শর্ত, আন্টি?' সামনে ঝুঁকে এল সিসিলিয়া।

মিসেস ভ্যান্স হাসলেন। 'শর্তটা কী, সেটা বোধহয় আমার চেয়ে লরেলিই গুছিয়ে বলতে পারবে।'

'বোধহয়,' বলে নড়েচড়ে বসল লরেলি। 'শর্তটা হল, যে লোক বলছে কঙ্গো রেইন ফরেস্ট মেয়েদের জন্য বিপজ্জনক নয়, তাকে তোর সঙ্গে যেতে রাজি করাতে হবে।'

'হোয়াট! কী বলছ?' চমকে গেল রানা। একাধারে বিস্মিত ও বিব্রত। 'আরে না! আমি কীভাবে কঙ্গো যাব!'

'তোমাকে কীভাবে নিয়ে যাবে সেটা একা শুধু সিসিলিয়ার মাথা ব্যথা,' বলল লরেলি। 'তবে কথার পিঠে কথা ওঠে, তাই বলছি–তুমি তো ছুটিতেই আছো, রানা। তা ছাড়া, রোমাঞ্চকর অভিযান তুমি ভালও বাসো। তা হলে অসুবিধেটা কোথায়?'

'মাসুদ ভাই,' সিসিলিয়া হিন্দুদের ভঙ্গিতে দু'হাত এক করে বুকের

কাছে ধরল, 'এখন তুমিই শুধু আমাকে সাহায্য করতে পারো। প্লিজ!'

'ওরা দু'বোন ব্যাপারটাকে হালকা করে ফেলছে,' বললেন মিসেস ভ্যান্স, চেহারা গম্ভীর। 'রানা, তুমি আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। এটা সিরিয়াস একটা ব্যাপার, বাবা। ভ্যান্স পরিবারের তরফ থেকে আমরা তোমার সাহায্য চাইছি।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন তিনি। আবার বললেন, ' সিসিলিয়া যতই জেদ ধরুক, শুধু তুমি যদি টিম লিডার হয়ে যেতে রাজি হও, তবেই ওর যাওয়া হবে। একমাত্র তোমার অভিভাবকত্বেই ওকে আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দিতে পারব।'

মাথা নিচু করে পাঁচ সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। তারপর মুখ তুলে বলল, 'মিসেস ভ্যান্স, বাংলাদেশ তার দুঃসময়ে ভ্যান্স পরিবারের কাছ থেকে এত বেশি সাহায্য পেয়েছে যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ হয়ে আছি। আপনার মুখের কথা আমার জন্যে আদেশ। ঠিক আছে আমি যাব।' লরেলির দিকে ফিরল ও, 'তুমিও চলো তা হলে।'

'সত্যিই যেতাম,' বলল লরেলি। 'কিন্তু তুমি তো জানোই, আমার নেতৃত্বে কংগ্রেস একটা কমিটি গঠন করেছে–ইরাক যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে প্রেসিডেন্ট বুশকে ডাকতে হতে পারে।'

কথাটা সত্যি, তাই চুপ করে থাকল রানা।

'বেশ, আমরা এখন কাজের কথা নিয়ে আলোচনা করব,' রানার দিকে ফিরে একটা চোখ টিপল সিসিলিয়া। 'এক্সপার্ট ছাড়া বাকি সবাই এখানে না থাকলেও চলে।'

মা আর ভাইকে নিয়ে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে গেল লরেলি।

অফিসারদের দিকে তাকাল সিসিলিয়া। 'হ্যাঁ, শোনা যাক, কী কী সমস্যা।'

লজিস্টিক ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি বলল, 'একশো ষাট ঘণ্টার আগে শিপমেন্টের জন্যে এয়ার কার্গো ইউনিট অ্যাসেম্বল করা সম্ভব নয়।'

সিসিলিয়া বলল, 'এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। প্রথমে টিম গঠন করতে

হবে। মর্নিং আর আফটারনুন শিফটে যারা কাজ করে চলে গেছে…'

প্রজেক্ট ডিরেক্টর মার্ক জিলেট বাধা দিয়ে বললেন, 'স্বেচ্ছাসেবকের একটা তালিকা আমি নিয়েই এসেছি, ম্যাডাম। শুধু নাইট শিফটেরই বাহাত্তরজন স্বেচ্ছাসেবক হতে চাইছে।'

'ভেরি গুড!' সিসিলিয়া খুশি। 'ওই তালিকা থেকে দশ-বারোজনকে বাছাই করব আমরা।'

হঠাৎ সে খেয়াল করল, রানা মাথা নাড়ছে। ওর দিকে তাকাল সে। 'কী ব্যাপার, মাসুদ ভাই?'

'আফ্রিকান রেইন ফরেস্টে প্রয়োজনের চেয়ে একজন বেশি লোককেও নিয়ে যাওয়া উচিত নয়,' বলল রানা।

'ও.কে., টিম লিডার সবসময় রাইট!' হাসল সিসিলিয়া।

লজিস্টিক ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি যে সমস্যার কথা বলেছিল সেটার সমাধান নিজেই বের করে ফেলেছে। 'আমরা হিমালয়ান টিম বাতিল করে দিতে পারি, তা হলে ওদের ইউনিটকে ব্যবহার করতে পারব।'

'নাহ্! ওটা তো পাহাড়ী ইউনিট।'

'সেটাকে নয় ঘণ্টার মধ্যে মডিফাই করা সম্ভব।'

'আমার কাছে খবর আছে,' বললেন জিলেট, 'কোরিয়ান এয়ারলাইন্সের একটা সেভেন-ফোর-সেভেন কার্গো জেট সান ফ্রান্সিসকোয় ফুয়েল নিচ্ছে। নয় ঘণ্টার মধ্যে ওয়াশিংটনে আনানো যায়।'

'একটা প্লেনকে নিশ্চয়ই বিনা কারণে বসিয়ে রাখেনি?'

'একজন কাস্টমার শেষ মুহূর্তে চার্টার বাতিল করেছে,' বললেন মার্ক জিলেট।

অ্যাকাউন্টস্-এর প্রতিনিধি গুঙিয়ে উঠল: 'এক বস্তা টাকা লাগবে!'

'কঙ্গো দূতাবাস থেকে সময় মত আমরা ভিসা যোগাড় করতে পারব না,' প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হলো।

তাকে সমর্থন করে দীর্ঘ একটা বক্তব্য রাখলেন মার্ক জিলেট। ব্যবসার অনেক খুঁটিনাটি বিষয় সিসিলিয়ার জানা নেই, সে-সব জানানোই উদ্দেশ্য।

কঙ্গো সরকারের সঙ্গে 'মিনারেল এক্সপ্লোরেশান রাইটস্' নিয়ে ভ্যান্স কোম্পানির একটা খসড়া চুক্তি হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কঙ্গো রেইন ফরেস্টের ভিরুঙ্গা এলাকায় হীরা আবিষ্কার হলে শতকরা আশি ভাগ পাবে সরকার, বাকি বিশ ভাগ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি। কোন্ কোম্পানি আগে সুযোগ পাবে, এটা নির্ধারিত হবে লটারির মাধ্যমে।

সেই চুক্তির অন্যতম শর্ত অনুসারেই প্রথম দফা ছোট একটা টিমকে ভিসা দেওয়া হয়। কঙ্গো সরকার একই ধরনের খসড়া চুক্তি করেছে আরও তিনটে কোম্পানির সঙ্গে। এগুলো বিদেশী কোম্পানি–জাপানি, জার্মান আর ইটালিয়ান। এই তিন কোম্পানি পরে একটা মাইনিং কনসর্টিয়াম গঠন করেছে। বলাই বাহুল্য, লটারিতে ভ্যান্স কোম্পানির কপালেই শিকে ছিঁড়েছিল।

ভ্যান্স কোম্পানি বা কনসর্টিয়াম, দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে যারা লাভজনক ওর (Ore) সংগ্রহ করতে পারবে, কঙ্গো সরকার শুধু তাদের সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদন করবে। এবং এই চূড়ান্ত চুক্তি সই হওয়ার আগে নতুন ভিসা অবশ্যই তারা ইস্যু করবে না।

এর মধ্যে আরও সমস্যা লুকিয়ে আছে। কঙ্গো সরকার যদি কোনভাবে টের পায় যে ওদের ফিল্ড পার্টি যে-কোনও কারণেই হোক 'ওর' খুঁজে পেতে দেরি করছে, কিংবা কোনও বিপদে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান্স কোম্পানিকে দেওয়া ইক্সপ্লোর করবার অনুমতি বাতিল করে দেবে তারা। তার বদলে ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়ামকে সুযোগ দেওয়া হবে ভাগ্য-পরীক্ষার।

কিনসাসায় এই মুহূর্তে ত্রিশজন জাপানি বাণিজ্য প্রতিনিধি উপস্থিত রয়েছে, ইয়েন খরচ করছে পানির মত। ভ্যান্স কোম্পানির তৎপরতার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ওরা, কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পেলেই প্রমাণ করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যাবে–খসড়া চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে, ওদের পারমিট বাতিল করে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হোক।

'তারমানে ভিসার জন্যে আবেদন করলেই সবাই জেনে যাবে আমাদের টিম বিপদে পড়েছে,' বলল সিসিলিয়া। রানার দিকে ফিরল সে। 'তুমি তো এ-সব ব্যাপারে অভিজ্ঞ। কী করা উচিত?'

'ভিসার জন্যে আবেদন করার দরকার নেই,' বলল রানা।

'ভিরুঙ্গায় এখনও আমাদের একটা এক্সপিডিশান রয়েছে। এখন যদি আমরা খুব তাড়াতাড়ি ছোট আর একটা টিমকে ফিল্ডে নিয়ে যেতে পারি, কেউ জানতেই পারবে না যে এটা প্রথম টিম নয়।'

'কিন্তু ভিসা ছাড়া সীমান্ত পেরুব কীভাবে?'

রানা বলল, 'সেজন্যে দরকার ভাল একজন গাইড।'

'শাহ্ ফুয়াদ,' নামটা যেন প্রজেক্ট ডিরেক্টর মার্ক জিলেটের ঠোঁটের কিনারায় ঝুলছিল 'দি বেস্ট।'

রানার চোখে প্রশংসা।

'কিন্তু লোকটা বড় বেশি টাকা-টাকা করে,' প্রতিবাদের সুরে বলল অ্যাকাউন্টস-এর প্রতিনিধি। 'তা ছাড়া, কঙ্গো সরকার তাকে একদম পছন্দ করে না।'

'কিন্তু তার মত অভিজ্ঞ আর ইন্টেলিজেন্ট গাইড তুমি পাচ্ছ কোথায়? ওই এলাকা নিজের হাতের তালুর মত চেনে সে। ওদিককার সবগুলো ভাষা জানে।'

আলোচনা চলল গভীর রাত পর্যন্ত। মাঝখানে অবশ্য একবার বিরতি নিতে হল। মিসেস ভ্যান্স রবার্ট ও লরেলির সঙ্গে এসে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এক্সপিডিশনের নেতৃত্ব নিতে রাজি হওয়ায় পরিবারের পক্ষ থেকে রানাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধন্যবাদ জানাল রবার্ট।

বারোটা চল্লিশ মিনিটে পরবর্তী ভিআরএমসি-র এক্সপিডিশান বা অভিযান কনফার্ম করল কমপিউটার। পুরো লোড করা একটা সেভেন-ফোর-সেভেন পরবর্তী সন্ধ্যা আটটায়, ১৪ জুনে, ওয়াশিংটন ত্যাগ করতে পারবে।

শাহ্ ফুয়াদ বা তার মত কাউকে তুলে নেওয়ার জন্য প্লেন নাইরোবিতে ল্যান্ড করবে পনেরো তারিখে। পুরো টিম কঙ্গোয় পৌঁছাবে সতেরোয়।

সব মিলিয়ে চুরানব্বুই ঘণ্টা লাগছে।

ইতোমধ্যে ভিডিও ইমেজ বিশ্লেষণ করে এক্সপার্টরা রিপোর্ট পাঠিয়েছে। লেন্সের খুব কাছে চলে আসা মুখ আর হাত কোন মানুষের নয়। ওগুলো একটা গরিলার।

কিন্তু তার চেয়ে বড় চমক হলো: বাকি সব ভিডিও ইমেজ বিশ্লেষণ করে ওখানকার গভীর জঙ্গলে ভাঙা দালান-কোঠা দেখা গেছে।

রিপোর্টটা পড়ে রানার দিকে তাকাল সিসিলিয়া। 'দালান-কোঠা এখন থাক। তবে গরিলা সম্পর্কে তোমার ধারণাই সত্যি হলো। এর তাৎপর্য আমার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে, মাসুদ ভাই।'

'আমারও,' বলল রানা। 'আমাদের সব রকম প্রস্তুতি থাকতে হবে।'

'যেমন?'

'প্রচুর অস্ত্র আর গোলাবারুদ থাকা দরকার।'

'এ ধরনের অভিযানে সাধারণত আমরা বোধহয় লেযার গান ব্যবহার করি। চলবে?'

'দেখলে বলতে পারব।'

'ঠিক আছে, দেখবে। আর কী?'

'আমরা ডক্টর আনন্দর সাহায্য নিতে পারি—নেয়া উচিত।'

'কী রকম সাহায্য?'

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা: ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনন্দ 'ওয়াইল্ড লাইফ এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড প্রিজার্ভেশন' নামে একটা এনজিও-তে রিসার্চের কাজ করে। 'প্রজেক্ট শৈলী'-র চিফ রিসার্চার সে। ওদের ল্যাব ও হেড অফিস, দুটোই নিউ ইয়র্কে। শৈলী নামে একটা বাচ্চা গরিলাকে কয়েক বছর ধরে ভাষা শেখাবার দায়িত্ব পালন করছে সে। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে শৈলী এখন ছয়শোরও বেশি শব্দ জানে।

সবশেষে রানা জানাল, ওদের এই বিশেষ অভিযানে এ-ধরনের 'শিক্ষিত' একটা গরিলা কাজে আসতে পারে। সিসিলিয়ার আপত্তি না থাকলে আনন্দকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারে ও, শৈলীকে নিয়ে কঙ্গোয় সে যেতে পারবে কি না।

'কী আশ্চর্য!' বলল সিসিলিয়া। 'আমি কেন আপত্তি করতে যাব? তোমার যেটা ভাল মনে হবে সেটাই করবে তুমি। তা না হলে তোমাকে লিডার বানিয়েছি কেন?'

হেসে ফেলল রানা। তারপর বলল, 'রিপোর্টের সঙ্গে কমপিউটার এক্সপার্টরা যে ছবিগুলো পাঠিয়েছে তার এক সেট দাও আমাকে—ডিস্কে

ভরে। মনে হচ্ছে, ওখানে সত্যিই প্রাচীন কোন সভ্যতা ছিল। জিঞ্জ কি তা হলে মিথ্যা নয়, বাস্তব সত্য?'

পরদিন রাত ন'টায় বন্ধু ডক্টর আনন্দ সেনের সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আলাপ করছে রানা। প্রথমেই আদরের ছলে গালিগালাজঃ 'এই শালা, সারাদিন চেষ্টা করেও তোকে পাইনি কেন?'

'এক জায়গায় গিয়েছিলাম। কেন, কী ব্যাপার বল তো?'

'কঙ্গোর ভিরুঙ্গা এলাকায় একটা এক্সপিডিশানে যাচ্ছি আমরা,' মেসেজ পাঠাল রানা। 'ভাবছি...'

'সত্যি? কবে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল আনন্দ।

'এই তো দু'দিন পরই। তোকে...'

'আমিও যেতে চাই, রানা!'

'আমি তো সেজন্যেই যোগাযোগ করেছি,' কী বোর্ডের বোতাম টিপে জানাল রানা। 'তোকে আর শৈলীকে নিয়ে যেতে চাই। তবে একটা কথা।'

'শোন, মহা এক কাকতালীয় ব্যাপার ঘটে গেছে,' মেসেজ পাঠাল আনন্দ। 'আমিও শৈলীকে নিয়ে আফ্রিকায় যাওয়ার প্ল্যান করছিলাম। ভালই হয়েছে—এখন তোর সঙ্গে যাওয়া হবে। কী কথা রে?'

'তোকে তো আর নতুন করে বলতে হবে না যে আফ্রিকা মানেই বিপদ। মানে খানিকটা ঝুঁকি আছে আর কী।'

'মাসুদ রানার সঙ্গে কোথাও যাব, অথচ যেখানে বিপদ, ঝুঁকি ইত্যাদি থাকবে না—এ কী হয়?' হেসে উঠল আনন্দ।

'তা হলে শোন। আমার কিছু প্রশ্ন আছে, ভেবেচিন্তে ঠিক ঠিক উত্তর দিবি। এ-সব রেকর্ড হয়ে থাকবে, আইনগত ব্যাপারে পরে কাজে লাগতে পারে। ঠিক আছে?'

'আছে।'

'শৈলী একটা গরিলা?'

'হ্যাঁ, গরিলা—একটা পাহাড়ী মেয়ে।'

'বয়স?'

'ওর সাত চলছে।'

'তার মানে এখনও শিশু সে?'

আনন্দ ব্যাখ্যা করল: গরিলারা ছয় থেকে আট বছরের মধ্যে সাবালিকা হয়। কাজেই বলা যায় কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে রয়েছে শৈলী—ষোলো বছরের একটা তরুণীর সমান।

'কোথেকে এল সে?'

'কাসান্ড্রা নামে এক মহিলা ট্যুরিস্ট আফ্রিকায় দেখতে পায় ওকে, বাগিন্দি গ্রামে। শৈলীর মা-বাবাকে খেয়ে ফেলে স্থানীয় নেটিভরা। মিসেস কাসান্ড্রা ওকে আমেরিকায় নিয়ে আসেন।'

'তারপর?'

'মিসেস কাসান্ড্রা ওকে এখানে এনে নিউ ইয়র্ক চিড়িয়াখানায় দান করেন।'

'শৈলী সম্পর্কে ভদ্রমহিলার আগ্রহ ওখানেই শেষ?'

'সেরকমই ধরে নিতে হবে,' জানাল আনন্দ। 'শৈলীর শৈশব সম্পর্কে জানবার জন্যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি। সারা বছর ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেই থাকেন তিনি।'

'তারপর?'

'নিউ ইয়র্ক চিড়িয়াখানার সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি,' দ্রুত কমপিউটারের কী বোর্ড অপারেট করে জবাব দিচ্ছে আনন্দ। 'রিসার্চ করবার জন্যে ওকে চাইলে কর্তৃপক্ষ রাজি হন। কথা হয় তিন বছর পর ফিরিয়ে দেব।'

'ওরা কোন টাকা নিয়েছে?'

'না।'

'লিখিত কোন চুক্তি হয়েছে?'

'না।'

'মৌখিক চুক্তি। তারপর, তিন বছর যখন পেরিয়ে গেল?'

আনন্দ জবাব দিচ্ছে: 'আমি ওঁদেরকে আরও ছ'বছরের জন্যে মেয়াদ বাড়াবার অনুরোধ করি। ওঁরা রাজি হন।'

'আবারও মৌখিক?'

'হ্যাঁ। আলাপ করি ফোনে।'

'কোন চিঠি-পত্রও লেনদেন হয়নি?'

'না। আমি ফোন করতে ওদের মনে পড়ে। শৈলীকে ওরা ভুলেই গিয়েছিল। ওদের ওখানে আরও চারটে গরিলা আছে।'

'একটা গরিলার দাম কত হতে পারে?'

'বিপন্ন প্রাণীদের তালিকায় নাম আছে গরিলার, পুষবার জন্যে তুই কিনতে পারবি না। বাজার নেই, তাই নির্দিষ্ট কোন বাজারদরও নেই। চিড়িয়াখানাগুলো বিশ থেকে ত্রিশ হাজার ডলারে কেনে বলে শুনেছি।'

'এতগুলো বছর শৈলীকে নিয়ে কী করছিস তুই?' জানতে চাইল রানা। 'ভাষা শেখাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ। আমেরিকান সাইন ল্যাঙগুইজ। ওর মেমোরিতে ছয়শো বিশটা শব্দ আছে।'

'খুব কি বেশি হলো?'

'মানুষ বাদে আমার জানা মতে অন্য যে-কোন প্রাইমেট-এর চেয়ে বেশি শব্দ জানে শৈলী।'

'যখন তুই এক্সপেরিমেন্ট করিস, শৈলীর কোন প্রতিক্রিয়া হয়?'

'অনুমতি না নিলে মন খারাপ করে। শুধু এক্সপেরিমেন্ট কেন, যে-কোন অ্যাকশন শুরু করার আগে জানাতে হয় ওকে। অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাণী—একটুতেই বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে, শুরু করতে পারে গোঁয়ার্তুমি।'

'ওর আচরণের রেকর্ড রাখা হয়?'

'হয়। ভিডিও টেপে।'

'তোর এক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্য বোঝে ও?'

'ও তো বলে বোঝে।

'পুরস্কার আর তিরস্কার পদ্ধতি অনুসরণ করিস?'

'আমার মত সব অ্যানিমেল বিহেইভিয়ারিস্ট-ই তাই করে।'

'শাস্তির নমুনা?'

'দুষ্টামি করলে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে এক কোণে দাঁড় করিয়ে রাখি। কিংবা বাদাম-মাখন-জেলি ইত্যাদি খেতে না দিয়ে সময়ের আগে শুতে পাঠিয়ে দিই।'

'এবার অন্য প্রসঙ্গ। তোকে আমি কিছু ফটো পাঠাচ্ছি। আফ্রিকায়

গেছিস তুই, আফ্রিকার ওপর তোর পড়াশোনাও আছে। ফটোগুলো দেখে বল কী বুঝছিস। ঠিক আছে?'

'ও.কে.। ফটো পাঠা, দেখি।'

ফটোগ্রাফি আসলে লাইট-সেনসিটিভ সিলভার সল্ট ব্যবহারের মাধ্যমে ইনফরমেশন রেকর্ড করবার ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা কেমিক্যাল সিস্টেম। ইনফরমেশন রেকর্ড করবার জন্য ভিআরএমসি কাজে লাগাচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম। ক্যামেরার বদলে মাল্টি-স্পেকট্রাল স্ক্যানার ব্যবহার করছে ওরা, ফিল্মের বদলে CCT–কমপিউটার কামপ্যাটিবল্ টেপ।

ভিআরএমসি-র ইমেজ ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড করা স্রেফ ইলেকট্রিকাল সিগনাল, ফলে সেগুলোকে প্রয়োজন মত যত খুশি ইলেকট্রিক ইমেজে পরিণত করা সম্ভব। একটা ইমেজকে বিভিন্নভাবে বদলাবার জন্য ভিআরএমসি-র আটশো সাঁইত্রিশটা কমপিউটার প্রোগ্রাম আছে–এগুলোর সাহায্যে ইমেজ বড় করা, অপ্রয়োজনীয় এলিমেন্ট মুছে ফেলা বা সূক্ষ্ম বিবরণ ফুটিয়ে তোলা যায়।

ভিআরএমসি-র এক্সপার্টরা কঙ্গো ভিডিও টেপে চোদ্দটা প্রোগ্রাম ব্যবহার করেছে–বিশেষ করে শব্দজটবহুল অংশটায়, যেখানে অ্যান্টেনা ভাঙচুর হওয়ার আগে মুখ আর হাত দেখা গিয়েছিল।

এই অংশের ঝাপসা ইলেকট্রিক সিগনালগুলোকে বড় আর পরিষ্কার করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় নিল কমপিউটার। দেড় মিনিটের মাথায় হাতটায় দেখা গেল লম্বা লম্বা লোম।

মুখটা গরিলার বলে স্পষ্ট চেনা গেল।

'এরকম গরিলা আগে কখনও দেখিনি আমি,' নির্দ্বিধায় স্বীকার করল আনন্দ। 'এর মুখ প্রায় সাদা।'

'আমরা যেখানে যাব, কঙ্গোয়, এরকম গরিলা আছে বলে ধারণা করছি,' বলল রানা।

'ভালই তো। শৈলীকে দিয়ে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করিয়ে নিতে পারব।'

'কঙ্গো থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাওয়া আরও কিছু ফটো পাঠাচ্ছি। দেখে কী মনে হয় বল।'

'ঠিক হ্যায়।'

ভিডিও স্ক্রিন থেকে ক্যামেরায় ধারণ করা ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইট ইমেজ আনন্দর কমপিউটার স্ক্রিনে ভালই ফুটল। একই পদ্ধতিতে ইলেকট্রিক সিগনাল পরিষ্কার করে ইমেজ বের করা হয়েছে, ফলে ট্র্যান্সমিট হয়ে আসবার সময় ছবিতে খালি চোখে যা দেখতে পাওয়া যায়নি, এখন তা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ব্যাপারটা প্রায় ভোজবাজির মত। ইমেজগুলোয় চোখ রাখলে জঙ্গলের ভিতর একটা শহরের ধ্বংসাবশেষ চিনতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। অথচ এ-সব তখন কারও দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। ফটোয় দেখা যাচ্ছে জানালা আর দরজাগুলো অদ্ভুত আকৃতির—প্রায় অর্ধচন্দ্রাকার।

ফটোগুলো দেখতে দেখতে প্রথমে উত্তেজিত, তারপর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ডক্টর আনন্দ। মনে পড়ে যাচ্ছে আজ সারাটা দিন কীভাবে কেটেছে তার।

সকাল ন'টায় ল্যাবরেটরিতে মাত্র ঢুকতে যাচ্ছে আনন্দ, পকেটের ভিতর মোবাইল ফোনটা কির্-র্-র্, কির্-র্-র্ শুরু করল।

সেট বের করে কানে ঠেকাল সে। হেড অফিস থেকে ফোন করেছেন প্রজেক্ট ডিরেক্টর জর্জ ওয়ালডেন স্বয়ং। জরুরি তলব। সব কাজ ফেলে ওর অপেক্ষায় চেম্বারে বসে আছেন তিনি। কেন, কী ব্যাপার? না, সেটা টেলিফোনে বলা যাবে না।

অতএব শৈলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিফথ্ অ্যাভিনিউ-এর দিকে গাড়ি ছোটাল আনন্দ। ওয়াইল্ড লাইফ এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড প্রিজার্ভেশান-এর হেড অফিসটা ওদিকেই।

জর্জ ওয়ালডেনের চেম্বারে ঢুকে আনন্দ দেখল প্রৌঢ় ভদ্রলোক দেয়ালে চোখ রেখে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। দেয়ালগুলো ফাঁকা নয়, সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশটা বাঁধানো চিত্রকর্ম ঝুলছে। সমঝদাররা দেখে কী বলবেন বলা মুশকিল, তবে সাধারণ মানুষ এগুলোকে দুর্বোধ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ভাবতে বাধ্য।

এখানকার সবগুলো ছবি আসলে শৈলীর ফিঙ্গার পেইন্টিং।

চেম্বারে আনন্দ ঢুকতেই পায়চারি থামিয়ে ওয়ালডেন হাত তুলে ছবিগুলো দেখালেন। 'এখনও কী শৈলী এ-সব আঁকছে?'

মাথা ঝাঁকাল আনন্দ। 'অবশ্যই। কেন?'

'আর এখনও আপনি জানেন না এগুলোর কী অর্থ?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল আনন্দ; সিদ্ধান্ত নিল, ওগুলোর সম্ভাব্য অর্থ কী হতে পারে তা এখনই কাউকে না জানানোই ভাল। 'না, জানি না।'

'ঠিক বলছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়ালডেন। 'আমার ধারণা এগুলোর অর্থ কেউ একজন জানে।'

'আপনার এরকম ধারণার কারণ?'

'আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটেছে,' বললেন প্রজেক্ট ডিরেক্টর। 'এক লোক শৈলীকে কিনে নিতে চাইছে।'

'কিনে নিতে…কি বলছেন আপনি! শৈলীকে কিনে নিতে চাইছে?'

'লস অ্যাঞ্জেলসের একজন লইয়ার কাল এই অফিসে ফোন করে প্রস্তাবটা দিয়েছেন আমাকে। বলছেন তাঁর ক্লায়েন্ট শৈলীকে দেড় লাখ ডলারে কিনতে চান।'

'এ বোধহয় ধনী কোন পশু-প্রেমীর খেয়াল,' বলল আনন্দ। 'শৈলীকে নির্যাতন থেকে বাঁচাতে চাইছে।'

'মনে হয় না,' বললেন ওয়ালডেন। 'প্রস্তাবটা এসেছে জাপান থেকে। ভদ্রলোকের নাম মরিয়েগা, টোকিওতে ইলেকট্রনিক্স-এর ব্যবসা করেন; এ-সব আমি জেনেছি লইয়ার ভদ্রলোক আজ সকালে আবার ফোন করে শৈলীর দাম আরও এক লাখ বাড়িয়ে দেয়ার সময়।'

'দু'লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার?' নিঃশ্বাস আটকে জিজ্ঞেস করল আনন্দ। 'শৈলীর জন্যে?' না-না, শৈলীকে বেচবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এত টাকা দিয়ে কেন কেউ ওকে কিনতে চাইবে?

ওয়ালডেনের কাছে এই প্রশ্নের জবাব আছে। 'এত বড় অঙ্কের টাকা শুধু প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ, অর্থাৎ কোন ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসতে পারে।

'বোঝাই যাচ্ছে যে মরিয়েগা আপনার এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে

পড়েছেন, তারপর ভেবেছেন কথা বলিয়ে একটা প্রাইমেটকে দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজ করানো সম্ভব।

'আমার নিজেরও ধারণা, এখানে বোধহয় নতুন একটা ক্ষেত্র উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। প্রাইমেটদের ট্রেনিং দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশানে কাজে লাগানো।'

মুখ ভার করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল আনন্দ। সে কী মাথায় হার্ড হ্যাট পরিয়ে, হাতে বালতি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য শৈলীকে ভাষা শেখাচ্ছে? প্রশ্নটা সে উচ্চারণও করল।

'ব্যাপারটা আপনি ভাল করে ভেবে দেখছেন না.' প্রজেক্ট ডিরেক্টর নরম সুরে বললেন। 'আমরা সবাই অস্তিত্ব হারাবার বিপদ থেকে বন্যপ্রাণীদের বাঁচাতে চাই, ঠিক আছে? কিন্তু ঘটছে উল্টোটা। বড় আকারের বানর এখন দুনিয়ায় নেই বললেই চলে। আফ্রিকান শিম্পাজিও সংখ্যায় দ্রুত কমছে। বাঁশঝাড় কেটে ফেলায় বোর্নিওর ওরাং-ওটাং আশ্রয় হারাচ্ছে, দশ বছরের মধ্যে অস্তিত্ব হারাবে।

'মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে গরিলাদের সংখ্যা নেমে তিন হাজারে দাঁড়িয়েছে। আমাদের জীবদ্দশাতেই ওগুলো দুনিয়ার বুক থেকে চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে।

'যদি না ওগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার একটা কারণ পাওয়া যায়। আপনি সেই কারণ যোগান দিতে পারেন, মাই ডিয়ার ডক্টর সেন। ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন।'

চিন্তা করল আনন্দ, তারপর 'প্রজেক্ট শৈলী'-র স্টাফ মিটিং ডাকল সকাল এগোরোটায়। বানর জাতীয় প্রাণীকে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজে লাগাবার সম্ভাব্যতা বিবেচনা করল তারা। বিবেচনা করল তাতে মালিক পক্ষের কী কী সুবিধে হতে পারে।

প্রাইমেটরা ইউনিয়ন করবে না। তাদের থাকবে না ফ্রিঞ্জ বেনিফিট।

তবে অলোচনায় উপসংহার টানা হলো এভাবে: শ্রমিক হিসাবে বানর একটা অবাস্তব ধারণা। শৈলীর মত একটা এইপ্ হিউম্যান ওয়ার্কার-এর সস্তা আর বুদ্ধিহীন সংস্করণ নয়।

বরং ঠিক তার উল্টো: শৈলী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী আর জটিল একটা প্রাণী। তাকে কারও তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। তার উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ সে খেয়ালী। তা ছাড়া, একটা না একটা শারীরিক সমস্যা তার লেগেই থাকে। তাকে কোন শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করবার কথা সুস্থ কোন মানুষের মাথায় খেলবে না।

মরিয়েগা যদি ভেবে থাকেন বানরকে অ্যাসেমব্লি লাইনে বসিয়ে টিভি আর হাই-ফাই সেট তৈরি করাবেন, নিশ্চয়ই তাঁর মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

মিটিঙে একা শুধু মরগান টোফেল সতর্ক করলেন সবাইকে। ভদ্রলোক চাইল্ড সাইকোলজিস্ট। 'আড়াই লাখ ডলার অনেক টাকা,' বললেন তিনি। 'আর ধরে নিতে হয় মিস্টার মরিয়েগা বোকা নন। ছবিগুলো দেখলে যে-কেউ বুঝবে যে শৈলী নিউরটিক, তার মানসিক গঠন অত্যন্ত জটিল।

'তিনি যদি শৈলীর প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকেন, বাজি ধরে বলতে পারি ছবিগুলো দেখেই হয়েছেন। তবে এটা আমার কাছেও খুব আশ্চর্য লাগছে যে কী কারণে ছবিগুলোর দাম আড়াই লাখ ডলার হবে।'

এটা কারুরই বোধগম্য না হওয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এল ছবিগুলো।

ডক্টর মেরিনা, 'প্রজেক্ট শৈলী'-র অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চার, এই বলে আলোচনার সূত্রপাত ঘটালেন: 'কঙ্গো সম্পর্কে দুঃসংবাদ আছে আমার কাছে।'

লিখিত ইতিহাস থেকে কঙ্গো সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। নীলনদের উজানে বসবাসরত প্রাচীন মিশরীয়রা শুধু জানত যে অনেক দূর দক্ষিণে 'গাছপালার একটা আলাদা জগৎ' আছে, সেখানেই নদীটার উৎপত্তি। জায়গাটা রহস্যময়; জঙ্গল এত ঘন যে ভর দুপুরবেলাও রাতের মত অন্ধকার হয়ে থাকে চারদিক। সেই অন্ধকারে অদ্ভুত সব প্রাণীদের বাস–লেজসহ খুদে মানুষ, অর্ধেক কালো অর্ধেক সাদা পশু ইত্যাদি।

এর প্রায় চার হাজার বছর পরও আফ্রিকার ভিতরের অবস্থা সম্পর্কে নিরেট কিছু জানা যায়নি। সপ্তম শতাব্দীতে পুব আফ্রিকায় এল

আরবরা; সোনা, আইভরি, মশলা আর ক্রীতদাসের খোঁজে। কিন্তু তারা জলপথে বাণিজ্য করতে এসেছিল, ভিতরে ঢোকেনি। ভিতর দিকটাকে তারা জিঞ্জ অর্থাৎ 'কালোদের এলাকা' বলত—কল্পনা আর ফ্যান্টাসীর জগৎ।

তখন লোকমুখে অনেক আজব সব গল্প শোনা গেছে। সীমাহীন বনভূমিতে লেজঅলা খুদে মানুষ বাস করে। পাহাড়গুলো মাথা থেকে আগুন বের করলে গোটা আকাশ কালো হয়ে যায়। কালোদের গ্রাম দখল করে নেয় বানরের দল, এ-সব বানর মেয়েদের সঙ্গে মিলিত হয়।

জঙ্গলে আরও বাস করে বিরাট আকারের দানব, সারা গায়ে লম্বা লম্বা লোম, নাকগুলো চ্যাপ্টা। আরও আছে অদ্ভুতদর্শন প্রাণী—অর্ধেক চিতা, অর্ধেক মানুষ। স্থানীয় কালোরা বাজার বসিয়ে চড়া দামে বিক্রি করে মানুষের মাংস আর মগজ।

এ-সব গল্প আরবদেরকে উপকূলে আটকে রাখবার জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে লোভের হাতছানিও যে ছিল না, তা নয়—সোনার ঝলমলে পাহাড়, হীরের সংখ্যা এত বেশি যে নদীর তলা ঢাকা পড়ে আছে, মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে এমন পশু, কল্পনাকে হার মানায় এমন ঐশ্বর্য আর বৈভব নিয়ে জঙ্গলের ভিতর বিরাট সভ্যতা।

তবে একটা গল্প বারবার ফিরে এসেছে: নিখোঁজ শহর জিঞ্জ।

লোককাহিনী মতে, খিস্টপূর্ব এক হাজার বছর আগে, ইজরায়েলের রাজা সলোমনের আমলে হিব্রুদের কাছে ওই জিঞ্জ শহর হীরের খনি হিসাবে পরিচিত ছিল। এই শহরে যাওয়ার পথ কেউ কাউকে বলত না, যে জানত সে মৃত্যুকালে শুধু তার ছেলেকে বলে যেত। কিন্তু হীরের খনি একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়, পরিত্যক্ত শহরের বয়স বাড়ে, ভেঙেচুরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। গহীন আফ্রিকার অন্ধকার বুকে হারিয়ে যায় একটা সভ্যতা। যে পথ ধরে কাফেলা আসা-যাওয়া করত, জঙ্গল সে-সব গ্রাস করেছে।

সর্বশেষ ব্যবসায়ী, যার সেই পথের কথা মনে ছিল, কয়েকশো বছর আগে মারা গেছে; কাউকে কিছু বলে না যাওয়ায় জিঞ্জ-এ যাওয়ার গোপন তথ্য তারই সঙ্গে ঠাঁই পেয়েছে কবরে।

এগারোশো সাতাশি সালে ইবনে বারাতু, মোম্বাসার একজন আরব, লিখে গেছেন: 'এলাকার স্থানীয় লোকজন গভীর প্রদেশের একটা সভ্যতা…একটা নিখোঁজ শহরের গল্প করে, নাম বলে জিঞ্জ। সেখানকার অধিবাসীদের গায়ের রঙ ছিল কালো, একসময় প্রাচুর্য আর বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করত। এমনকী ক্রীতদাসরাও মূল্যবান রত্ন ব্যবহার করত; বিশেষ করে ব্লু ডায়মন্ড। সেখানে নাকি এই ব্লু ডায়মন্ডের বিরাট খনি ছিল।'

বারোশো বিরানব্বুই সালে মোহাম্মদ জাইদ নামে এক ইরানি লিখেছেন: 'বড় একটা হীরে প্রদর্শিত হলো জাঞ্জিবারের রাস্তায়। তা আকারে সেটা মানুষের মুঠো করা হাতের সমান তো হবেই। সবাই বলল--জিনিসটা গভীর মধ্যপ্রদেশ থেকে আনা হয়েছে, যেখানে জিঞ্জ নামে একটা শহরের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া যেতে পারে বলে ধারণা করা হয়। ওদিকে নাকি প্রচুর হীরে আছে–নদী, ঝরণা আর মাঠে ছড়ানো–'

তেরোশো চৌত্রিশ সাল। ইবনে মোহাম্মদ নামে আরেক আরব লিখেছেন: 'আমাদের দল জিঞ্জ শহর খুঁজে বের করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু শহরটা বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত, সবই ধ্বংস হয়ে গেছে শুনে সিদ্ধান্তটা বাতিল করা হয়। শোনা যায় জিঞ্জ এলাকায় রহস্যময় একটা সভ্যতা ছিল। সেখানকার জানালা-দরজা তৈরি করা হয় আধখানা চাঁদের আকারে। শহরবাসীদের নাকি কোণঠাসা করে ফেলে একদল হিংস্র আর লোমশ প্রাণী। তারা হিসহিস করে। এটাই নাকি তাদের ভাষা–'

এরপর এল দুর্দম পর্তুগীজ অভিযাত্রীরা। পনেরোশো চুয়াল্লিশ নাগাদ বিশাল কঙ্গো নদীর পশ্চিম তীর থেকে ভিতর দিকে ঢুঁ মারতে শুরু করল তারা। কিন্তু তারপরই একের পর এক বাধার সামনে পড়তে হলো তাদের। সেই সব বাধা পেরিয়ে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী সেন্ট্রাল আফ্রিকায় পা ফেলা সম্ভব হলো না।

প্রথম এক প্রস্থ নদীপ্রপাত-এর পর কঙ্গো নাব্যতা হারায়–ভিতর দিকে প্রায় দুশো মাইল। নেটিভরা বৈরী, হিংস্র আর রাক্ষস, অর্থাৎ নরমাংসভোজী। জঙ্গল খুব গরম, রোগ-ব্যাধির উৎস। বাইরে থেকে কেউ গেলে ম্যালেরিয়া, স্লিপিং সিকনেস, বিলহার্জিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার

ফিভার-এ মারা যায়।

পর্তুগীজরা কখনোই সেন্ট্রাল কঙ্গোয় পৌঁছাতে পারেনি। ক্যাপটেন ব্রেনার-এর নেতৃত্বে ষোলোশো চুয়াল্লিশ সালে ইংরেজরাও পারেনি, তাঁর গোটা দল চিরকালের জন্য নিখোঁজ হয়ে যায়। আধুনিক সভ্যতার মানচিত্রে দুশো বছর ধরে ফাঁকা একটা জায়গা হিসাবে থেকে যায় কঙ্গো।

তবে সব যুগের অভিযাত্রীরাই লোককাহিনীর সেই নিখোঁজ শহর জিঞ্জ-এর গল্প পুনরাবৃত্তি করেছে।

পর্তুগীজ শিল্পী হোসে দিয়াগো দো ভালডেজ ষোলোশো বিয়াল্লিশ সালে নিখোঁজ শহর জিঞ্জ-এর একটা ছবি আঁকেন; ছবিটা খ্যাতি অর্জন করে, মানুষের প্রশংসা পায়।

'কিন্তু,' ডক্টর মেরিনা বললেন, 'ভালডেজ লেজঅলা মানুষের ছবিও এঁকেছেন। এঁকেছেন এমন সব বানরের ছবি, স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে যাদের শারীরিক সম্পর্ক ছিল।'

কে যেন গুঙিয়ে উঠল।

'যতদূর জানা যায় ভালডেজ পঙ্গু ছিলেন,' না থেমে বলে যাচ্ছেন ডক্টর মেরিনা। 'সারাটা জীবন সেতুবাল শহরে কাটিয়েছেন তিনি, নাবিকদের সঙ্গে বসে মদ খেয়েছেন, ছবি এঁকেছেন লোকমুখে শোনা গল্প থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে।'

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে আফ্রিকা খুব ভালভাবে ইক্সপ্লোর করা হয়নি। এরপর একে একে অনেকেই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করেন—বার্টন, স্পেকি, বেকার, লিভিংস্টোন, আর স্ট্যানলি। এঁদের কারও দ্বারাই নিখোঁজ শহর জিঞ্জ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

শহরটা আজও একটা বিরাট রহস্য হয়ে রয়েছে।

'শুরুতেই বলেছিলাম, কঙ্গো সম্পর্কে আমার কাছে দুঃসংবাদ আছে,' আলোচনার ইতি টানতে গিয়ে বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চার ডক্টর মেরিনা।

'তুমি বলতে চাইছ ভালডেজের ছবিটা কারও বর্ণনার ওপর নির্ভর করে আঁকা হয়েছে? আসলে আমরা জানি না আদৌ শহরটার অস্তিত্ব

ছিল কি না?’

‘হ্যাঁ, আমি ঠিক তাই বলতে চাইছি।’ মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর মেরিনা। ‘ছবির শহরটার অস্তিত্ব ছিল, এর কোন প্রমাণ নেই কোথাও। এটা স্রেফ একটা গল্পই।’

কিন্তু আনন্দ তার বক্তব্য মেনে নিতে রাজি নয়। ‘আর শৈলীর আঁকা ছবিগুলো? ষোলোশো বিয়াল্লিশে আঁকা ভালডেজের ছবির সঙ্গে ওর ওই সব ছবি এতবেশি মিলে যাবে কেন? এটা কি স্রেফ একটা মস্ত বড় কাকতালীয় বা দৈব-দুর্ঘটনা? তা কী করে হয়!’

‘মিলটা অবশ্যই কাকতালীয়,’ বললেন মেরিনা। ‘তা ছাড়া যতটা মিল আছে তারচেয়ে বেশি আছে অমিল, কিন্তু আমরা শুধু মিলটাকেই বড় করে দেখছি।’

মাথা নাড়ল আনন্দ। ‘আপনারা যে যাই বলুন, আমি বিশ্বাস করি জিঞ্জ শহর ছিল। আজও হয়তো সেখানে হীরের খনি আছে–’

সংবিৎ ফিরে পেয়ে আবার উত্তেজিত হয়ে পড়ল আনন্দ। কমপিউটারে টাইপ করল সে: ‘রানা, এই ছবিগুলো কীভাবে পেয়েছিস বললি? স্যাটেলাইটের মাধ্যমে?’

রানার জবাব এল স্ক্রিনে: ‘হ্যাঁ। দেখে কী মনে হলো বল্।’

‘তার মানে নিখোঁজ শহরটার...ধ্বংসাবশেষের লোকেশান তোরা জানিস?’

‘অবশ্যই।’

‘আমার কী মনে হলো? আমার কিছু মনে হয়নি, দোস্ত, আমি জানি–এটা নিখোঁজ শহর জিঞ্জ-এর ফটো।’

‘ওহ্! জিঞ্জ শহর সম্পর্কে তুই তা হলে জানিস?’

‘আলবত জানি! অ্যাই, তোরা রওনা হচ্ছিস কবে?’

‘দু’একদিনের মধ্যে, প্রস্তুতি শেষ হলেই,’ জানাল রানা। ‘তুই শৈলীকে নিয়ে তৈরি থাক। নিউ ইয়র্কে সাপ্লাই লোড করবার জন্যে প্লেন থামাব আমরা, তখন তোদেরকেও তুলে নেব। ঠিক আছে?’

‘ওকে।’

চার

৭৪৭ কার্গো জেটের নাক যেন হাঙরের খোলা চোয়াল, ভিতরে উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত গুহার মত বিশাল হোল্ড।

প্লেনটাকে আর্জ বিকেলে নিউ ইয়র্কে আনা হয়েছে। বড় আকারের অ্যালুমিনিয়াম ট্রাভেল কেইজ, ভিটামিন পিল ভর্তি বাক্স, বাচ্চাদের পেচ্ছাব করবার পাত্র, প্রচুর খেলনা ইত্যাদি লোড করবার সময় শ্রমিকরা হাসাহাসি করছে।

কংক্রিট টারমাকের বাইরে, ঘাসের উপর, শৈলীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডক্টর আনন্দ সেন। খানিক দূরে একটা কালো মার্সিডিজ দেখা যাচ্ছে। জেট ইঞ্জিনের তীব্র আওয়াজ ভাল লাগছে না, শৈলী তাই তার কান দুটো হাত দিয়ে চেপে রেখেছে। সাংকেতিক ভাষায়, অর্থাৎ ইশারায় আনন্দকে সে জানাল: 'পাখিরা বড্ড চেঁচায়।'

'আমরা পাখিতে চড়ি, শৈলী,' আনন্দও সাইন ল্যাঙগুইজ, অর্থাৎ ইশারায় মন্তব্য করল।

শৈলী আগে কখনও প্লেনে চড়েনি। এত কাছ থেকে কোন প্লেন এর আগে দেখেওনি সে। 'আমরা গাড়িতে যাব,' প্লেনটার দিকে চোখ রেখে নিজের সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিল।

'গাড়িতে করে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা উড়ে যাব।'

'কোথায় উড়ব?'

'উড়ব জঙ্গলে।'

উত্তরটা শৈলীকে যেন হতচকিত করে তুলল, তবে কোনও ব্যাখ্যা চাইল না। আর সব গরিলার মত শৈলীও পানি পছন্দ করে না, এমনকী ছোট একটা ঝরণাও পার হতে চায় না। তাই আটলান্টিক পাড়ি

দেওয়ার কথাটা ইচ্ছে করেই বলল না আনন্দ।

প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে শৈলী আর আনন্দকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল রানা। কাস্টমসের ঝামেলা আগেই মিটিয়ে ফেলা হয়েছে, বাকি শুধু অবশিষ্ট কার্গো হোল্ডে তুলে রওনা হওয়া।

সাড়ে পাঁচ ফুটী আনন্দর বুক পর্যন্ত লম্বা শৈলী, ওজন একশো পাউন্ড।

শৈলীর সঙ্গে আগেই ওর আর সিসিলিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে আনন্দ। শুধু তাই নয়, এই গরিলাসুন্দরীর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে তারও কিছু টিপস্ দিয়েছে সে।

তার সামনে যাওয়ার আগে সব সময় মনে রাখতে হবে–ও মানুষ নয়, গরিলা।

গরিলাদের নিজস্ব শিষ্টাচার আছে। তোমার সঙ্গ পেতে অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত জোরে কথা বলবে না বা হঠাৎ নড়াচড়া করবে না। যদি হাসো, দাঁত দেখিয়ো না, কারণ উন্মুক্ত দাঁত একটা হুমকি।

চোখ নামিয়ে রাখতে হবে, কারণ আগন্তুকের সরাসরি দৃষ্টিকে বৈরী বলে গণ্য করা হয়।

শৈলী অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ মেয়ে, আনন্দকে ছোঁয়া যাবে না বা তার খুব কাছাকাছি দাঁড়ানো উচিত হবে না।

তার সঙ্গে কথা বলবার সময় মিথ্যে কিছু বলা চলবে না। সাইন ল্যাঙগুইজ ব্যবহার করলেও, প্রায় সব মানুষের বক্তব্য বুঝতে পারে শৈলী। আনন্দ সাধারণত তাকে উদ্দেশ করে কথাই বলে, সংকেত ব্যবহার করে মাঝে-মধ্যে। যে-ই কথা বলুক, মিথ্যে বললে ধরে ফেলে শৈলী। ব্যাপারটা সে পছন্দ করে না।

'শৈলী খুশি তো?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করল রানা।

গলার কাছে দ্রুত আঙুল নাড়ল শৈলী, যেন মাছি তাড়াল।

হাসল আনন্দ। 'শৈলী বলছে, তুই আমাদেরকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিস।'

'দুঃখিত, শৈলী।' বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'সিসিলিয়া আসলে তার ড্রাইভারকে বলতে ভুলে গেছে যে তোদেরকে প্লেনে তুলে দিতে হবে। আয়।'

প্লেনের ভিতর ঢুকল ওরা। কার্গো হোল্ডের দেয়াল থেকে রিসিভার নামিয়ে টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে সিসিলিয়া। ওদেরকে দেখে হাসল সে, ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলল।

এক মিনিট পর ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে শৈলীর উদ্দেশে বলল, 'হ্যালো, শৈলী?' মেঝের দিকে চোখ রেখে হাসছে সে। এরকম আচরণে নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগে, কিন্তু শৈলী আকারে এত বড় যে ভয় করে তার।

শৈলী সংকেত দিল: 'বোতাম পরা মহিলা।' সম্ভ্রান্ত, অভিজাত মহিলাকে 'বোতাম পরা' বলে সে। তারপর দ্রুত কয়েকটা সংকেত দিল।

'কি বলছে?'

'বলছে না, চাইছে,' বলল আনন্দ। 'আপনার ঠোঁট লাল দেখে লিপস্টিক চাইছে।'

হেসে উঠে সিসিলিয়া বলল, 'ঠিক আছে, শৈলী, লিপস্টিক তুমি পাবে–তবে এখন নয়। আসুন, মিস্টার সেন, কী রকম আয়োজন করা হয়েছে ঘুরিয়ে দেখাই আপনাকে।' নিঃশব্দে রানার একটা হাত ধরে হোল্ডের আরও ভিতর দিকে এগোল সে।

দেখাদেখি শৈলীও আনন্দর একটা হাত ধরল।

'এটাই মেইন কার্গো হোল্ড,' বলল সিসিলিয়া।

ফোর-হুইল-ড্রাইভ ট্রাক, ল্যান্ড ক্রুজার, অ্যামফিবিয়াস ভেহিকেল, ইনফ্লেটেবল্ বোট, কাপড়চোপড় ভর্তি র‍্যাক, ইকুইপমেন্ট, খাবার ইত্যাদি অসংখ্য জিনিসে বোঝাই জায়গাটা। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি একটা মডিউল দেখা গেল, গায়ে CCCI লেখা।

'কমান্ড-কন্ট্রোল কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স,' বলল রানা।

আনন্দ আর শৈলীকে নিয়ে প্লেনের পিছনে চলে এল ওরা। এখানে ঘুমোবার আয়োজন করা হয়েছে। হালকা সব ফার্নিচার দিয়ে সাজানো জায়গাটা স্লিপিং বাঙ্কগুলো যথেষ্ট চওড়া। টিভি ছাড়াও বড়সড় একটা কমপিউটার কনসোল দেখা গেল।

শৈলী সংকেত দিল: 'সুন্দর বাড়ি।'

'হ্যাঁ, সুন্দর।' গরিলার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল আনন্দ।

'ওর জন্যে আমার কাছে নতুন একটা কলার আছে,' বলল রানা। 'পরবে তো?'

'পরবে, তুই যদি সেটা উপহার হিসেবে দিস।'

মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, তরুণ জিয়োলজিস্ট ফোর্ডের সঙ্গে আনন্দর পরিচয় করিয়ে দিল সিসিলিয়া। তারপর ডাফল ওয়াটসনের দিকে এগোল। আনন্দর সঙ্গে করমর্দনের সময় ওয়াটসন নিজের পরিচয় দিল এই বলে, 'আমি হলাম ট্রিপল ই।'

কমপিউটারে কীসের যেন সম্ভাব্যতা যাচাই করছিল তারা, তবে শৈলীর সঙ্গে করমর্দনের সুযোগটা ছাড়ল না। শৈলী তাদেরকে গাম্ভীর্যের সঙ্গে দেখল, তারপর কমপিউটারে চোখ রেখে সংকেত দিল: 'শৈলী বাক্স খেলবে।'

'এখন নয়, শৈলী,' বলল আনন্দ। সিসিলিয়ার দিকে তাকাল সে। 'বাক্স মানে টেলিভিশন–ও খুব পছন্দ করে। আচ্ছা, ট্রিপল ই কী জিনিস?'

'এক্সপিডিশান ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট,' সহাস্যে ব্যাখ্যা করল ওয়াটসন। 'আমার কাজ কোথায় কে কী করছে তার খোঁজ-খবর রাখা, এবং প্রতিপক্ষ কেউ থাকলে তাকে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য সরবরাহ করা।' হঠাৎ একটু ম্লান দেখাল তাকে: 'ঈশ্বর জানেন ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়াম কী সব আবর্জনা গেলাবে আমাদের!'

প্লেন আকাশে উঠবার পর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল শৈলী। সিট বেল্ট খুলে প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছুটোছুটি শুরু করল। প্রতিটি জানালার সামনে থেমে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে তাকাচ্ছে। লোকজনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আতঙ্কে ফোঁপাচ্ছে, সেই সঙ্গে সংকেত দিচ্ছে: 'মাটি কোথায়, কোথায় মাটি?'

আনন্দ জানে, তার এই অস্থিরতা সহজে কমবে না। এ-ধরনের পরিস্থিতির জন্য তৈরি হয়েই এসেছে সে। সিরিঞ্জে থোরালেন ট্র্যাঙ্কুইলাইজার ভরে শৈলীর বাহুতে পুশ করল। এখন তার আদর দরকার। এক জায়গায় বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল আনন্দ।

শান্ত হলো শৈলী। খানিক পর লক্ষ করল, সে ছাড়া বাকি সবাই কিছু পান করছে। অমনি আবদার ধরল: 'সবুজ ফোঁটা পানীয় চাই।' সবুজ ফোঁটা পানীয় মানে একটা জলপাই সহ মার্টিনি আর সিগারেট। এ-সব তাকে দেওয়া হয় বিশেষ কোন উপলক্ষে—বড়দিনে বা কোন পার্টিতে। আনন্দ তাকে খানিকটা মদ আর একটা সিগারেট খেতে দিল।

কিন্তু প্রবল উত্তেজনা তাকে অসুস্থ করে তুলল। এক ঘণ্টা পর, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আপন মনে সংকেত দিচ্ছে: 'সুন্দর দৃশ্য।' এই সময় বমি করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ কাউকে লক্ষ করে নয়, ক্ষমা চাইল: শৈলী দুঃখিত শৈলী নোংরা শৈলী দুঃখিত, দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, শৈলী, ঠিক আছে,' বলে তার মাথার পিছনে আদর করে চাপড় মারল আনন্দ।

একটু পরই 'শৈলী এখন ঘুমাবে' সংকেত দিয়ে একটা চাদর টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল তার পোষা গরিলা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ভীতিকর নাক ডাকা। তার পাশে শুয়ে আনন্দ ভাবল, এরকম বিকট আওয়াজের মধ্যে অন্যান্য গরিলারা ঘুমায় কীভাবে?

কিছুক্ষণ পর উঠে পড়ল সে, রানার খোঁজে কমিউনিকেশন সেন্টারের দিকে এগোল।

আনন্দর অনুরোধে ভিডিও টেপটা দ্বিতীয়বার চালাল রানা।

স্ক্রিনে কঙ্গো ফিল্ড পার্টির ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে সাদা-কালো ইমেজে। ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে সব। ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। ভাঙা খুলি সহ কয়েকটা লাশ পড়ে আছে। তারপর ক্যামেরা জুম ব্যাক করায় অশুভ ছায়াটার আউটলাইন দেখা গেল।

রানার সঙ্গে একমত হয়ে আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ, ছায়া দেখে গরিলা বলেই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু গরিলারা এই কাণ্ড করবে না। ওরা শান্তি কামী, নিরামিষভোজী প্রাণী।'

'গরিলা না হলে কে?' জানতে চাইল সিসিলিয়া।

আনন্দ কিছু বলল না।

টেপটা শেষ পর্যন্ত দেখল ওরা। তারপর আবার দেখা হলো কমপিউটারকে দিয়ে পরিষ্কার করানো ইমেজ, যাতে একটা পুরুষ গরিলার মাথা পরিষ্কার চিনতে পারা যায়।

'এটা বাস্তব সত্য,' বলল সিসিলিয়া।

আনন্দ ততটা নিশ্চিত নয়। ভিডিও টেপের শেষ তিন সেকেন্ড আরেকবার দেখল সে, বিশেষভাবে লক্ষ করল ছায়াটার মাথা। অস্থির ইমেজ, ভৌতিক একটা ছাপ রেখে দ্রুত চলে যায়, তবে কী যেন একটা অসঙ্গতি আছে। সেটা কী ঠিক ধরতে পারছে না আনন্দ।

'ইমেজটা ফ্রিজ কর,' রানাকে বলল সে। স্থির ইমেজটার দিকে তাকিয়ে থাকল। মুখ আর লোম, দুটোই ধূসর, কোন সন্দেহ নেই। 'গরিলারা আরও গাঢ় রঙের হয়,' বলল সে। 'প্রায় কালোই বলা যায়। কিন্তু এটা তো দেখছি ধূসর, সাদাটে।' আনন্দ নিশ্চিত, পাহাড়ী গরিলার রঙ এরকম সাদাটে হতেই পারে না। সে বলল, 'হয় আমরা নতুন কোন প্রাণী দেখছি, নয়তো নতুন কোন প্রজাতি। আচ্ছা, এই তিন সেকেন্ডের ভিডিও ইমেজটা আমি কী নিউ ইয়র্কে পাঠাতে পারব. আমার ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর মেরিনার কাছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, কেন নয়।'

তখনই 'প্রজেক্ট শৈলী'-র অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চার ডক্টর মেরিনার সঙ্গে যোগাযোগ করল আনন্দ। ভিডিও ইমেজটা তো পরীক্ষা করে দেখবার জন্য পাঠালই, সেই সঙ্গে ডক্টর মেরিনাকে নির্দেশ দিল গরিলা আর শিম্পাঞ্জির বিভিন্ন ভিডিও টেপ দেখে তাদের মুখভঙ্গি, হাত-পা নাড়াবার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি স্টাডি করে একটা রিপোর্ট দিতে হবে।

৭৪৭-এর লিভিং কোয়ার্টারের এক কোণে ফাইবারগ্লাস দিয়ে তৈরি একটা সাউন্ডপ্রুফ বুদ আছে, কব্জা লাগানো হুড আর ছোট CRT স্ক্রিন সহ চারদিক বন্ধ বলে এটাকে 'কফিন' বলা হয়।

প্লেনটা মধ্য-আটলান্টিক পার হচ্ছে, এইসময় নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

প্রথমেই চোখ পড়ল শৈলী আর আনন্দর উপর। দু'জনেই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। খানিক দূরে কমপিউটার কনসোলে 'সাবমেরিন বেজ'

খেলছে ফোর্ড আর ওয়াটসন।

কফিন, অর্থাৎ বুদটায় ঢুকে হুড নামিয়ে দিল রানা। সিসিলিয়ার কথা ভেবে একটু চিন্তা হচ্ছে ওর।

কোম্পানির বিশ্বস্ত অতগুলো লোককে হারিয়ে স্বভাবতই বিরাট একটা ধাক্কা খেয়েছে সিসিলিয়া। তার নির্দেশ পেয়ে অফিসের লোকজন কাগজ-পত্র তৈরি করছে, নিহত প্রত্যেকের পরিবার যাতে এক লাখ ডলার করে ক্ষতিপূরণ পায়। কিন্তু টাকা দিলেই তো আর শোক ভোলা যায় না।

তার উপর স্নায়ুতে অন্যান্য চাপ। সিসিলিয়া ক্লান্ত, কিন্তু তারপরও সে ভয় পাচ্ছে আগামী পনেরোদিন ভাল করে ঘুমাতে পারবে না। তার ধারণা এই পনেরোদিনই টিকবে ওদের অভিযান।

পনেরো দিনে—৩৬০ ঘণ্টায়—রানার টিম হয় ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়ামকে হারিয়ে দেবে, নয়তো ভিরুঙ্গা মিনারেল এক্সপ্লোরেশান রাইট চিরকালের জন্য হারাবে ভ্যান্স কোম্পানি।

প্রতিযোগিতা এরইমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। শোকে যতই কাতর হোক, এই যুদ্ধে সিসিলিয়া হারতে রাজি নয়। রানাকে সে বলেছে, 'তোমার মত একজন বিশ্বজয়ী সেনাপতি থাকতে কেন আমি হারব?'

ঈগলস্যাট উপগ্রহের সাহায্যে ভিআরএমসি-র হেড অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করছে রানা। কোড বাটনে চাপ দিয়ে নিজের পরিচয় জানাল ও।

ওর সামনের স্ক্রিনে একটা নাম ফুটল: মার্ক জিলেট, প্রজেক্ট ডিরেক্টর।

টেলিফোনের রিসিভার তুলল রানা।

'দুঃসংবাদ, মিস্টার রানা,' ওয়াশিংটন থেকে বললেন জিলেট।

'বলুন।'

'কনসর্টিয়াম আড়মোড়া ভাঙছে।'

'ভেঙে বলুন।'

'ওরা জানে আপনারা রওনা হয়েছেন,' বললেন জিলেট, 'নিজেদের শেডিউল এগিয়ে নিয়ে এসেছে। বেশি জোর লাগাচ্ছে জার্মানরা—ওই যে, ম্যাডামের বন্ধু, বার্ট কিচনার। আমার কাছে আরও খারাপ খবর

আছে।'

'বলুন।'

'গত দশ ঘণ্টায় কঙ্গো স্রেফ একটা নরকে পরিণত হয়েছে,' বললেন জিলেট। 'আমাদের কাছে অতি জঘন্য একটা GPU আছে।'

'প্রিন্ট,' নির্দেশ দিল রানা।

স্ক্রিনে জিয়োপলিটিক্যাল আপডেট প্রিন্ট হতে দেখছে রানা:

'ওয়াশিংটনের কঙ্গো দূতাবাস জানিয়েছে, রুয়াভার সঙ্গে তাদের পুব সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কোন কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঞ্জানিয়া ইউগান্ডা আক্রমণ করায়, ইউগান্ডার সৈন্যরা কঙ্গোর পুবদিকে ঢুকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। ফল হয়েছে চারদিকে চরম বিশৃংখলা।

'স্থানীয় গোষ্ঠী (কিগানি) গর্জে উঠেছে। চরম নৃশংসতা আর নরমাংস ভক্ষণের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। জঙ্গলবাসী পিগমিদের অবস্থা শোচনীয়। কঙ্গো রেইন ফরেস্টের সমস্ত ভিজিটরকে মেরে ফেলছে কিগানিরা।

'কঙ্গো সরকার "যে-কোন মূল্যে" কিগানি বিদ্রোহ দমন করবার জন্য "স্ট্যানলিভিল-এর কসাই" নামে কুখ্যাত জেনারেল পাকুড় মোয়ানাকে পাঠিয়েছেন।

'পরিস্থিতি চরম নাজুক। বৈধ পন্থায় এখন শুধু পশ্চিম দিক, অর্থাৎ কিনসাসা হয়ে কঙ্গোয় ঢোকা যাবে। আপনারা কোন রকম সরকারী সহযোগিতা পাবেন না। খরচ যত বেশিই হোক, শিকারী এবং গাইড শাহ্ ফুয়াদকে অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন। এই অভিযানে তার কোন বিকল্প নেই। সাবধান, আপনাদের আগে কোন ভাবেই কনসর্টিয়াম যেন তার কাছে পৌঁছাতে না পারে।'

স্ক্রিনে চোখ রেখে রানা ভাবল, খবর সত্যি এতটা খারাপ? জিজ্ঞেস করল, 'শেডিউল বা টাইম কোর্স জানা গেছে?'

'বিশস্ত সূত্রে জানা গেছে, কনসর্টিয়াম কঙ্গোয় ঢুকবে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। এই মুহূর্তে তারা শাহ্ ফুয়াদকে খুঁজছে।'

'তার মানে তাঞ্জিয়ারে যাচ্ছে ওরা,' বলল রানা। 'কখন?'

'ছ'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাবে। আপনারা?'

'আমাদের সাত ঘণ্টা লাগবে। শাহ্ ফুয়াদ সম্পর্কে কোন তথ্য পেয়েছেন?'

'ম্যাডাম তার সম্পর্কে সবই জানেন,' জবাব দিলেন জিলেট। 'তাঁকে বলবেন, ফুয়াদের ব্যাপারে তিনি যেন বিকল্প ব্যবস্থাও করে রাখেন।'

বিকল্প ব্যবস্থা?'

'এই কথাটা বললেই যা বুঝবার বুঝে নেবেন ম্যাডাম,' বললেন জিলেট। 'বিকল্প ব্যবস্থা মানে হলো, ফুয়াদ যদি আপনার টিমে নাম লেখাতে না চায় তা হলে ম্যাডাম এমন ব্যবস্থা করে রাখবেন–যাতে সে অন্য কারও সঙ্গেও কঙ্গোয় যেতে না পারে।'

মনে মনে হাসল রানা। ভাবল, এ-সবের আসলে দরকার হবে না।

'আপনার বাকি সব প্যাসেঞ্জাররা কেমন আছে?' জানতে চাইলেন জিলেট, আসলে শৈলীর কথা জিজ্ঞেস করছেন।

'সবাই ভাল আছে,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

ফিসফাস আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল আনন্দর।

'মুকেনকো খেপছে বলে মনে হয়।'

'ওটা কি মেঘ ঝুলে আছে?' সিসিলিয়ার গলার আওয়াজ চিনতে পারল আনন্দ।

'না, শান্ত আবহাওয়ায় মেঘ ওরকম উথলায় না। তা ছাড়া, রঙটাও তো খুব কালো। এ ধোঁয়া।'

'সব্বোনাশ!'

চোখ মেলল আনন্দ। ব্লু-ব্ল্যাক আকাশের গায়ে সরু লাল রেখা দেখা যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টের কাঁচ লাগানো জানালার বাইরে, অর্থাৎ সকাল হচ্ছে। তার হাতঘড়ির কাঁটা নিউ ইয়র্কের সময় দিচ্ছে–চারটে ত্রিশ মিনিট। রানা আর সিসিলিয়ার সঙ্গে কথা বলবার পর মাত্র দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে।

একটা হাই তুলে শৈলীর দিকে তাকাল আনন্দ, মেঝেতে জড়ো করা চাদরের উপর কুঁকড়ে ঘুমিয়ে আছে, নাক ডাকছে সেই আগের মতই। বাঙ্কগুলো সব খালি দেখা যাচ্ছে।

আবার নরম আওয়াজ শুনতে পেয়ে কমিপউটার কনসোলের দিকে তাকাল আনন্দ। ফোর্ড আর ওয়াটসনের মাঝখানে একটা চেয়ার নিয়ে বসে রয়েছে সিসিলিয়া; তিনজনই একটা স্ক্রিনের উপর চোখ রেখে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে।

'ডেঞ্জারাস সিগনেচার। আমরা কি এর একটা কমপিউটার প্রজেকশন পাচ্ছি?'

'আসছে। একটু সময় লাগবে। আমি পাঁচ বছরের রেকর্ড চেয়েছি, অন্যান্য পিএসওপি সহ।'

নিজের কট থেকে নেমে স্ক্রিনের দিকে তাকাল আনন্দ। 'পিএসওপি কী?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পিএসওপি হলো–প্রায়ার সিগনিফিক্যান্ট অরবিটাল পাসেস বাই স্যাটেলাইট,' ব্যাখ্যা করল ফোর্ড। 'আমরা এই ভলক্যানিক সিগনেচারটা দেখছিলাম।' স্ক্রিনের দিকে আঙুল তুলল সে। 'খুশি হওয়ার মত কিছু নয়।'

'ভলক্যানিক সিগনেচার কী জিনিস?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

তাকে ওরা আলোড়িত ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখাল–কমপিউটার কৃত্রিম রঙ দেওয়ায় গাঢ় সবুজ দেখাচ্ছে–বেরিয়ে আসছে ভিরুঙ্গা রেঞ্জের অন্যতম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মুকেনকো-র মুখ থেকে।

'মুকেনকো সাধারণত তিন বছরে একবার বিস্ফোরিত হয়,' বলল ওয়াটসন। 'শেষবার উদ্গিরণ হয়েছে দু'বছর আগে, কিন্তু ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে এক দেড় হপ্তার মধ্যে আরেকটা ফুল স্কেল বিস্ফোরণের জন্যে তৈরি হচ্ছে ওটা।'

'আমরা আসলে এখন প্রবাবিলিটি অ্যাসেসমেন্টের জন্যে অপেক্ষা করছি,' বলল সিসিলিয়া।

'রানা ব্যাপারটা জানে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সিসিলিয়া। 'জানে, কিন্তু চিন্তিত বলে মনে হলো না। আপনার সামনেই তো জিয়োপলিটিকাল আপডেট শোনালাম ওকে, সেটাও ওকে বিচলিত করতে পারেনি। এই তো খানিক আগে কার্গো বে-তে গিয়ে ঢুকেছে। চলুন, দেখি কী করছে।'

জেটের কার্গো বে-তে আলো খুব কম। ওদের দিকে পিছন ফিরে,

একটা টেবিলে বসে, ল্যাম্পের আলোয় কাজ করছে রানা। ওদের পায়ের শব্দ শুনে কাজ ফেলে চেয়ারটা ঘোরাল। 'কি ব্যাপার, তোমরা ঘুমাওনি?'

'ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু ঘুমটা ভেঙে গেল,' বলল আনন্দ। 'তুই এখানে কী করছিস?'

'সাপ্লাই চেক করছি,' বলল রানা। 'ভ্যান্স কোম্পানি দারুণ একটা জিনিস দিয়েছে আমাদেরকে–এই যে।' ছোট একটা ব্যাকপ্যাক তুলে আনন্দকে দেখাল। 'অ্যাডভান্সড্ টেকনলজি ইউনিট।'

'আমরা ফিল্ড পার্টির জন্যে মিনিয়েচার প্যাকেজ ডেভলপ্ করেছি,' বলল সিসিলিয়া। 'বিশ পাউন্ড ইকুপমেন্টে একটা মানুষের দু'হপ্তায় যা যা দরকার হতে পারে তার সব আছেঃ খাবার, পানি, কাপড়–সব।'

'এমনকী পানিও?'

পানি খুব ভারীঃ মানুষের শরীরের দশভাগের সাত ভাগই পানি, খাবারের বেশির ভাগটাও পানি, সেজন্যই শুকনো ফল অত হালকা হয়। মানুষের জীবনে খাবারের চেয়ে পানির গুরুত্ব অনেক বেশি। খাবার ছাড়াও মানুষ কয়েক মাস বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া পারবে না।

রানা হাসল। 'গড়ে একজন মানুষ চার থেকে ছ'লিটার পানি খায়–ওজন ধরো আট থেকে তেরো পাউন্ড। মরু এলাকায় দু'হপ্তার এক্সপিডিশানে গেলে মাথাপিছু পানি দরকার হবে দুশো পাউন্ড।'

'এত পানি ওই ছোট্ট ইউনিটে ভরবি কীভাবে?'

'আরে, চিন্তার কিছু নেই! আমাদের সঙ্গে ওয়াটার রিসাইক্লিং ইউনিট আছে, যেটা ক্লেদ বা মানুষের সমস্ত তরল ময়লা পিউরিফাই করতে পারে– পেচ্ছাব সহ–'

'থাম তুই!' আনন্দ বিরক্ত, ভাব দেখে মনে হলো সঙ্গে রুমাল থাকলে নাকে চেপে ধরত।

'মেশিনটার ওজন মাত্র ছয় আউন্স,' বলল রানা। 'আশা করি তোর প্রশ্নের জবাব তুই পেয়ে গেছিস।'

আনন্দর প্রতিক্রিয়া দেখে হাসল সিসিলিয়া। 'আপনার ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, মিস্টার সেন। আমাদের পিউরিফাইড্ জল আপনি

ট্যাপ থেকে যা পান তারচেয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার।'

'বলছেন যখন, নিশ্চয়ই তাই।' অদ্ভুতদর্শন একজোড়া সান গ্লাস হাতে নিল আনন্দ। অত্যন্ত মোটা আর গাঢ় রঙের জিনিস, ফোরহেড ব্রিজ-এর উপর আশ্চর্য একটা লেন্স দেখা যাচ্ছে। 'এটা কী?'

'হলগ্র্যাফিক নাইট গগলস্,' বলল রানা। 'থিন-ফিল্ম ডিফ্র্যাকশান অপটিক্স ব্যবহার করা হয়েছে।'

এরপর হাত তুলে একটা ভাইব্রেশন-ফ্রি ক্যামেরা লেন্স, স্ট্রোব ইনফ্রারেড লাইট আর মিনিয়েচার সার্ভে লেযার দেখাল রানা–শেষটা পেন্সিল ইরেজার-এর চেয়ে আকারে বড় নয়। এক সারিতে ছোট অনেকগুলো তেপায়াও রয়েছে, মাথার দিকে র‍্যাপিড-গিয়ারড় মোটর আর ব্র্যাকেট বসানো। তবে এগুলো সম্পর্কে বিশদ কিছু বলল না ও। আনন্দর চোখে প্রশ্ন দেখে শুধু বলল, 'ডিফেন্সিভ ইউনিটস্।'

দূরের একটা টেবিল লক্ষ্য করে এগোল আনন্দ। টেবিলটায় ছ'টা সাব-মেশিনগান পড়ে রয়েছে। একটা তুলল সে; খুব ভারী লাগল, গ্রিজ লেগে চকচক করছে। টেবিলের একপাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অ্যামিউনিশন ক্লিপ। স্টক-এর লেটারিং আনন্দর চোখে পড়েনি; মেশিনগানগুলো রাশিয়ান একে-ফোরটিসেভেন, লাইসেন্স নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ায় তৈরি করা হয়েছে।

চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল আনন্দ।

'স্রেফ সাবধানতা, দোস্ত,' বলল রানা।

'এ-সব আমাদের প্রতিটি অভিযানেই থাকে,' ওকে সমর্থন করবার সুরে বলল সিসিলিয়া। 'জানেনই তো, কঙ্গো পিকনিক স্পট নয়।'

'বিপদ হলে জান বাঁচানো ফরজ।' অভয় দিয়ে হাসছে রানা।

'জিপিইউ,' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল আনন্দ, 'কিগানিরা কি সত্যি এখনও মানুষ খাচ্ছে?'

নিজের মুখের সামনে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে একটা হাত ঝাপটাল রানা, বলল, 'বাদ দে তো। এ নিয়ে আমি মোটেও চিন্তিত নই।'

'কিন্তু আমি চিন্তিত,' বলল আনন্দ।

রানা শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল। GPU আসলে একটা টেকনিকাল

রিপোর্ট। কঙ্গো সরকার তার পুব সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে, বলেছে রুয়ান্ডা আর ইউগান্ডা থেকে কোন ট্যুরিস্ট বা কমার্শিয়াল ট্র্যাফিক কঙ্গোয় ঢুকতে পারবে না। অথচ হঠাৎ কেন পুব সীমান্ত বন্ধ করা হলো তার কোন ব্যাখ্যা নেই। ব্যাখ্যা না থাকলেও, ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক মহলে গুজব ছড়ানো হয়েছে–কিগানিরা বিদ্রোহ করেছে। তারা নাকি তাদের পুরানো অভ্যাস–অর্থাৎ মানুষ খাওয়া–আবার শুরু করেছে।

'তুই মনে হচ্ছে এ-সব বিশ্বাস করছিস না?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'না। ইউরো-জাপানিজ ইলেকট্রনিক্স কনসর্টিয়াম জানে ভিআরএমসি ভিরুঙ্গায় গুরুত্বপূর্ণ ডায়মন্ড রিজার্ভ আবিষ্কারের···কি বলে···আবিষ্কারের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। তারা এখন আমাদেরকে যতটা সম্ভব দেরি করিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।'

'দেরি করিয়ে দিতে চেষ্টা করছে–কঙ্গো সরকারের সাহায্য নিয়ে?' জানতে চাইল সিসিলিয়া।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। জার্মান আর জাপান কঙ্গোকে প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার সাহায্য, ঋণ আর অনুদান দিচ্ছে না? সরকারকে দিয়ে পুব সীমান্ত বন্ধ করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু খোলা রেখেছে পশ্চিম সীমান্ত।' হাসল রানা।

'হাসছ যে?'

'ওরা চাইছে খবরটা পেয়ে আমরা যেন কিনসাসা সীমান্ত দিয়ে কঙ্গোয় ঢুকি। আমাদের দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে নিশ্চয়ই একটা দলকে ওখানে বসিয়ে রেখেছে ওরা।'

'যদি কোন বিপদের ভয় না-ই থাকে, মেশিনগানগুলো কী জন্যে?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

তার প্রশ্নের জবাব দিল সিসিলিয়া। 'বিপদের ভয় একেবারেই নেই, এ-কথা তো একবারও কেউ বলছি না আমরা। আমাদের সব এক্সপিডিশানেই অস্ত্র থাকে, এবারও রাখা হয়েছে। তবে আপনাকে আমরা একটা নিশ্চয়তা দিতে পারি, এবারের অভিযানে কোন মেশিনগান ব্যবহার করা হবে না।'

খোলা ফাইলটা বন্ধ করে টেবিল ছাড়ল রানা। 'এবার খানিকটা

ঘুমিয়ে নিলে হয় না? তাঞ্জিয়ার-এ ল্যান্ড করতে আর খুব বেশি দেরি নেই।'

'তাঞ্জিয়ার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওখানে শাহ্ ফুয়াদ আছে।'

পাঁচ

শাহ্ ফুয়াদের ব্যাপারটা হলো, বিপজ্জনক বা দুঃসাহসিক কোন কাজ থেকে নিজেকে সে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। মরোক্কান, জন্ম রাবাতে; বাবা আর দাদার পথ অনুসরণ করে প্রথম জীবনে সে-ও শিকারকে পেশা হিসাবে নিয়ে প্রায় গোটা আফ্রিকা চষে বেড়িয়েছে।

কিছুদিনের মধ্যেই পোচার হিসাবে কুখ্যাত হয়ে ওঠে ফুয়াদ। দক্ষ শিকারী সে; গণ্ডায় গণ্ডায় হাতি মেরে আইভরি বেচেছে, গণ্ডার মেরে বেচেছে শিং। কিন্তু তার এই ব্যবসা বেশিদিন টিকল না। ত্রিশ বছর বয়েসে জিম্বাবুয়েতে চিতা শিকার করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল সে। বিচারে ছ'বছরের জেল হলো ফুয়াদের।

জেলার ছিল একজন শ্বেতাঙ্গ। ফুয়াদকে দেখে সে তো একেবারে হাঁ। আর ফুয়াদ? তার মুখে হাসি আর ধরে না! কেন, কী ব্যাপার? ব্যাপার হলো, এই লালমুখো সাহেব এক সময় ছিল ফুয়াদের সবচেয়ে বড় খদ্দের। এই লোকের কাছে অন্তত দুই টন আইভরি, বাইশটা চিতার ছাল আর ছয় জোড়া গণ্ডারের শিঙ বেচেছে সে।

এরপর শুরু হলো নাটক। শ্বেতাঙ্গ জেলার নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে ফুয়াদের কাছ থেকে বেআইনী জিনিস কিনে গোপনে ইউরোপ-আমেরিকায় পাচার করে দিয়েছে। মোটা টাকা কামিয়ে চুপচাপ সাধু সেজে বসে আছে সে। স্বভাবতই ফুয়াদকে এখন তার

চিনতে চাওয়ার কথা না। চাইলও না।

কিন্তু ফুয়াদ তাকে ছাড়বে কেন? সে জেলারকে ডেকে পাঠিয়ে চুপি চুপি হুমকি দিল: 'জেল থেকে পালাবার সুযোগ করে দাও, তা না হলে সব ফাঁস করে দেব।'

না, জেলার অত সহজে ভয় পাওয়ার লোক নয়। সমস্যাটা যে ভয়ানক, এটা সে ঠিকই টের পেল, মনে মনে তাই ভয়ানক একটা সমাধানও ঠিক করে রাখল।

যাবজ্জীবন দণ্ড পাওয়া কিছু দাগী কয়েদীকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধে দেয় জেলার, ফলে ঠেকায়-বেঠেকায় তাদেরকে দিয়ে অনেক অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে পারে। তাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করল জেলার। নতুন আসা মরোক্কান কয়েদীকে খতম করতে হবে: ঠিক আছে, জেলার সাহেব, আপনি আমাদের মা-বাপ। তা, কবে?

রবিবারে সবাই মাঠে খেলাধুলো করতে বেরোয়, সেদিন।

অর্থাৎ আর মাত্র দু'দিন আয়ু আছে ফুয়াদের।

হারারের জেল ভেঙে পরদিন রাতে এক বিদেশী আসামী পালাবে। জিম্বাবুইয়ের একজন মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে অন্যায়ভাবে তাকে অ্যারেস্ট করে, বিনা বিচারে, জেলখানায় ভরে রাখা হয়েছে। খবর রটেছে, নরহত্যার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবার প্রস্তুতি চলছে।

সে যাই হোক, এই নির্দোষ বিদেশীর কানে যেভাবেই হোক খবরটা পৌঁছাল–তার সেলেরই একজন নতুন কয়েদীকে জেলারের নির্দেশে পুরানো একদল কয়েদী রবিবারদিন খেলার মাঠে খুন করবে। তার নাম শাহ্ ফুয়াদ।

বিদেশী আসামীর মনটা নরম, তার মায়া হলো। সে ভাবল, আমার পালাবার সব ব্যবস্থা যখন পাকা, তা হলে একই সেল থেকে ফুয়াদকে সঙ্গে নিয়ে যেতে অসুবিধে কী? অনায়াসে, বিনা খরচায়, যদি একজনের প্রাণ বাঁচে তো বাঁচুক না।

সন্ধ্যায় ভাত খেতে দেওয়া হলো। বিদেশী অতিথি ভাতের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দুটো চাবি পেল। একটা চাবি দিয়ে সেলের, আরেকটা দিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষা ম্যানহোলের ঢাকনিতে লাগানো তালা খোলা যাবে। এই ম্যানহোলের নীচে আছে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ

টানেল। টানেলটা জেলখানা থেকে বেরিয়ে দুই মাইল দূরের একটা খালে গিয়ে শেষ হয়েছে।

গভীর রাত। সেলের ভিতর একজন বাদে সবাই ঘুমাচ্ছে। কানের কাছে ফিসফিস আওয়াজ আর মৃদু স্পর্শে শাহ্ ফুয়াদের ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেল, কে যেন বলছে, 'জেলার তোমাকে খুন করাবে। যদি বাঁচতে চাও তো এসো আমার সঙ্গে।'

ব্যস, আর কিছু নয়। ফুয়াদ চোখ বড় বড় করে দেখল দীর্ঘদেহী আসামী সেলের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তড়াক করে লাফ দিয়ে ছুটল সে। 'আমিও যাব!'

'আস্তে!' বলল উপকারী বন্ধু।

এরপর সব পানির মত...না, ভোজবাজির মত সহজে ঘটে গেল। সেল থেকে বেরিয়ে দেখা গেল গেটের দু'জন সেন্ট্রিই নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। তাদের কোমর থেকে চাবি নিয়ে গেট খোলা হলো। উঠানে বেরিয়ে এসে দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে হলো কিছুটা। ম্যানহোলের ঢাকনি খুলে ধাপ বেয়ে নীচে নামা, তারপর টানেল ধরে খালের পানিতে বেরিয়ে আসা, যেন স্বপ্নের ভিতর ঘটে গেল।

'এবার তোমার পথে তুমি যাও,' খাল থেকে ডাঙায় উঠে রহস্যময় সেই বিদেশী বলল ফুয়াদকে, 'আমার পথে আমি। খোদা হাফেজ।'

জবাবের অপেক্ষায় থাকল না, ঘুরে চলে যাচ্ছে।

তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ফুয়াদ। একেবারে শেষ মুহূর্তে চেঁচিয়ে জানতে চাইল, 'সার, আপনার নামটাও কি জানতে পারব না?'

সে থামেনি, ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকিয়ে ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল শুধু: রানা।

এই ঘটনাটির মধ্যে তাৎপর্যময় কী এমন ছিল তা একমাত্র ফুয়াদই বলতে পারবে, তবে সেদিন থেকে সম্পূর্ণ নতুন একটা মানুষে পরিণত হলো সে।

পোচিং ছেড়ে দিয়ে পথ-প্রদর্শক, অর্থাৎ গাইড হলো ফুয়াদ। ধীরে ধীরে দেশী-বিদেশী মাইনিং কোম্পানিগুলোর কাছে তার চাহিদা বাড়তে লাগল। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ আর আরবী ছোটবেলা থেকেই বলতে পারে সে, গোটা আফ্রিকা চষে বেড়ানোর ফলে স্থানীয় অসংখ্য ভাষায় কাজ

চালিয়ে নেওয়ার মত দক্ষতাও অর্জন করেছে। মাইনিং কোম্পানিগুলো তার এই গুণটাকে খুব বড় করে দেখে। তারা জানে, ফুয়াদকে গাইড হিসাবে নিলে টিমে দোভাষী রাখবার দরকার হয় না।

জেল থেকে পালাবার পর সাত বছর পার হয়ে গেছে। ওই নামের সেই রহস্যময় লোকটাকে কোথায় না খুঁজেছে ফুয়াদ, কিন্তু তার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায়নি কোথাও। লোকটার কথা একদিনের জন্যও ভোলেনি সে। আর যখনই মনে পড়ে, বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে: 'যেখানেই থাকুন, ভাল থাকুন, সার!'

আগে থেকে কলকাঠি নেড়ে রাখায় তাঞ্জিয়ার এয়ারপোর্টে ভিআরএমসি-র কার্গো জেট আর জেটের সমস্ত কার্গো বন্ড-এর সুবিধে পেল, অর্থাৎ কাস্টমস্ চেকিং-এর ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। তবে প্যাসেঞ্জারদের সবাইকে একবার করে ঢুকতে হলো কাস্টমস্ শেডে, শুধু শৈলী বাদে। তাদের মধ্যে ফোর্ড আর ওয়াটসনকে সার্চ করবার নাম করে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল অফিসাররা। খানিক পর জানানো হলো, তাদের হ্যান্ডব্যাগে অল্প করে হেরোইন পাওয়া গেছে।

ফোর্ড আর ওয়াটসন দু'জনেই প্রবল প্রতিবাদ জানাল: অসম্ভব! তাদের কাছে হেরোইন থাকবার কোন প্রশ্নই ওঠে না!

প্রতিবাদ করে কোন লাভ হচ্ছে না দেখে সিসিলিয়া সিদ্ধান্ত নিল, মার্কিন কনসুলার অফিসে অভিযোগ করবে। তবে রানা তাকে জানাল, 'মিথ্যে হলেও কেসটা যেহেতু হেরোইনের, তোমাদের কনসাল অফিসও ব্যাপারটা আগে ভাল করে তদন্ত করে দেখবে। বেশ ক'টা দিন সময় লাগবে তাতে।'

'তা হলে কী করতে বলো?'

'এটা ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়ামের কাজ,' বলল রানা। 'ওরা আমাদেরকে পিছনে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা পিছিয়ে পড়তে না চাইলে ওদের দু'জনকে এখানে রেখেই এগোতে হবে।'

'কিন্তু জিয়োলজির কাজ কে দেখবে?'

'তুমি,' বলল রানা।

'আমি!' আকাশ থেকে পড়ল সিসিলিয়া।

'জানি জিয়োলজিতে তোমার ডিগ্রি নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু এ-ও জানি যে এই সাবজেক্ট সম্পর্কে তোমার আগ্রহ আছে, পড়াশোনাও করেছ।'

সিসিলিয়া হার মানবার একটা ভঙ্গি করল। 'আর ইলেকট্রনিক্স?'

'ওটা যতটুকু পারা যায় আমাকেই দেখতে হবে।'

প্লেনে ফিরে গিয়ে মার্ক জিলেটের সঙ্গে যোগাযোগ করল সিসিলিয়া, তার সঙ্গে রানাও থাকল। সব শুনে জিলেট বললেন: 'মিস্টার রানার সিদ্ধান্ত ঠিক। আপনারা শাহ্ ফুয়াদকে দলে নেযাটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিন। কঙ্গো রেইন ফরেস্টের চাবি সে।'

গোধূলি এল, তারপর চলে গেল; তাঞ্জিয়ারের প্রাচীন দুর্গের পাশে উঁচু মিনার থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল মোয়াজ্জিনের আহ্বান।

রানা আর আনন্দকে নিয়ে শাহ্ ফুয়াদের টেরেসে বসে রয়েছে সিসিলিয়া। টেরেস থেকে দুর্গ আর মিনার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। শাহ ফুয়াদ সম্পর্কে সিসিলিয়ার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, সময় কাটাবার ফাঁকে রানা আর আনন্দকে সে-সব কিছু কিছু শোনাচ্ছে সে।

ওদের কোম্পানির তিনটে এক্সপিডিশানে গাইড ছিল ফুয়াদ। একটা জাম্বিয়ায়, একটা অ্যাঙ্গোলায়, আর শেষটা ক্যামেরুনে। অ্যাঙ্গোলায় গোটা টিম মাও-মাও গেরিলাদের হাতে বন্দি হয়েছিল। মুক্তিপণ ছাড়াই, স্রেফ আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করে আনে ফুয়াদ। সিসিলিয়া তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলে সে শর্ত দেয়–পুরস্কার হিসাবে টাকা নেবে সে, এবং টাকার অঙ্কটা সে নিজে নির্ধারণ করবে।

সিসিলিয়া রাজি হয়।

ফুয়াদ এক লাখ ডলার চেয়েছিল। টিমের সদস্য ছিল পাঁচজন, তার হিসাবে মাথা পিছু বিশ হাজার ডলার মোটেও বেশি চাইছে না সে। আরও যুক্তি দেখায়–গেরিলারা মুক্তিপণ চেয়েছিল পাঁচ লাখ ডলার।

টাকাটা দিতে সিসিলিয়ার খারাপ লাগেনি।

তবে এরপর কেনিয়ায় তাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ ততদিনে গাইড হিসাবে দুনিয়ার সবচেয়ে দামী লোক হয়ে উঠেছে

ফুয়াদ। তার অবশ্য সঙ্গত কারণও আছে। এক সময় মাইনিং কোম্পানিগুলো দেখতে পেল, সঙ্গে ফুয়াদ থাকলে খনি আবিষ্কার হবেই হবে। ও পথ দেখিয়েছে, অথচ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি খালি হাতে ফিরে এসেছে, এরকম প্রায় ঘটেইনি।

প্রায় দু'ঘণ্টা হলো অপেক্ষা করছে ওরা। সিসিলিয়া স্বভাবতই একটু উদ্বিগ্ন। ফুয়াদের বাড়িটা মুরিশ ডিজাইনে তৈরি, বাইরের দিকে খোলা। অন্দরমহলের কোথাও থেকে বাতাসের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় দু'একটা শব্দ ভেসে আসছে।

রানাকে সিসিলিয়া আগেই জানিয়ে রেখেছে, ফুয়াদের সঙ্গে সে-ই কথা বলবে।

একজন মরোক্কান পরিচারিকাকে দেখা গেল। হাতে ট্রে রয়েছে, তাতে একটা টেলিফোন। মিষ্টি কণ্ঠে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সে বলল, 'এই টেলিফোনে আপনারা ওয়াশিংটন, ভিআরএমসি-র হেড অফিসের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। ডাক শুরু হতে যাচ্ছে।'

আনন্দর কাঁধ ধরে ঝাঁকাল রানা। চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে। 'ওহে, ওঠো–ডাক শুরু হবে।'

চোখ মেলে আনন্দ দেখল পাশের একটা টেরেসে জড়ো হয়েছে কনসর্টিয়ামের লোকেরা। জাপানি, জার্মান, ইটালিয়ান–চেহারা দেখেই বোঝা যায় কে কোন্ দেশের।

লোকগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে ছে। প্রায় সবার চোখই গরম। তা সত্ত্বেও চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে 'আসছি' বলে ঘরের ভিতর দিয়ে ওদের টেরেসে চলে গেল সিসিলিয়া। তরুণ এক স্বর্ণকেশী জার্মানের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে।

খানিক পর সিসিলিয়া ফিরে এলে রানা জানতে চাইল, 'কে ও?'

'বার্ট কিচনার,' জবাব দিল সিসিলিয়া। 'পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে মেধাবি টপোলজিস্ট। আমার বন্ধুও বটে।'

'কিন্তু সে তো দেখা যাচ্ছে কনসর্টিয়ামের সঙ্গে কাজ করছে।' আনন্দ বিস্মিত।

'স্বভাবতই। বার্ট জার্মান।'

'তা হলে তার সঙ্গে আপনি কথা বললেন যে?' আনন্দর বিস্ময়

কাটছে না।

হাসল সিসিলিয়া। 'কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্যে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে বোধ করছি। বার্টের মারাত্মক একটা লিমিটেশান আছে। সে শুধু প্রি-এগজিস্টিং ডাটা পেলে কাজ করতে পারে। নতুন কিছু কল্পনা করা তার সাধ্যের বাইরে। ফ্যাক্ট-এর সঙ্গে বাঁধা, বাস্তবতার জিম্মি।' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে।

'তুমি বোধহয় ওকে কোন ইনফরমেশন দিতে গিয়েছিলে।' হাসিটা রানা চেপে রেখেছে।

'হ্যাঁ।'

আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল, 'আপনি ওকে শৈলীর কথা বলেছেন নাকি?'

'কেন বলব না!'

'কী বলেছেন?'

'বলেছি মেয়েটা অসুস্থ, সম্ভবত মারা যাচ্ছে।'

'কিচনার বিশ্বাস করেছে?'

'দেখা যাক। ওই যে, ফুয়াদ।'

পাশের টেরেসে হাজির হয়েছে ফুয়াদ। খাকি সাফারি পরেছে সে, দাঁতের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট। যথেষ্ট লম্বা সে, পোড় খাওয়া চেহারা। গোঁফ জোড়া সরু, বড় বড় চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। জাপানি, ইটালিয়ান আর জার্মানদের সঙ্গে বেশ কয়েক মিনিট কথা বলল সে। এদিক থেকে পরিষ্কারই বোঝা গেল, তার কথা শুনে কনসর্টিয়ামের প্রতিনিধিরা খুশি হতে পারছে না।

আরও এক মিনিট পর ঘরের ভিতর দিয়ে ওদের টেরেসে বেরিয়ে এল ফুয়াদ। সিসিলিয়াকে চেনে সে, জানে তার সঙ্গেই কথা বলতে হবে। আনন্দ আর রানার উপর একবার শুধু চোখ বুলাল, পরিচিত হওয়ার কোন আগ্রহ দেখাল না।

মুখে চওড়া হাসি, সিসিলিয়াকে সে বলল, 'এবার দেখছি ম্যাডাম নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন। কঙ্গোয় যাওয়া হবে, তাই না?'

'ইচ্ছে তো আছে, মিস্টার ফুয়াদ,' জবাব দিল সিসিলিয়া। 'বাকিটা নির্ভর করে ঈশ্বরের দয়া আর আপনার সহযোগিতার ওপর।'

ঠোঁট টিপে একটু হাসল ফুয়াদ। 'দেখা যাচ্ছে সবাই যেতে চায়।'

'কিন্তু আমরা আপনার পুরানো ক্লায়েন্ট।'

'দেবেন কত?'

'আপনি চান কত?'

'এক লাখ ডলার।'

'বেশি হয়ে যাচ্ছে। পঞ্চাশ হাজার পাবেন।'

'এই যদি আপনার শেষ কথা হয়, তা হলে আমাকেও দেখতে হয় ওরা আরও বেশি কিছু সাধে কি না,' বলল ফুয়াদ।

সিসিলিয়া ঝট করে রানাকে একবার দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি শেষ কথা বলব আমার লিডারের সঙ্গে পরামর্শ করে।'

ফুয়াদকে সন্তুষ্ট দেখাল। হাসতে হাসতে ঘরের ভিতর ঢুকল সে, আরেক টেরেসে বেরুবে। সেখানে ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়াম তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

'বাস্টার্ড,' ফুয়াদের পিঠে চোখ রেখে বিড়বিড় করল সিসিলিয়া। 'নাহ্, আমরা হেরে গেলাম। ওকে ছাড়া কনসর্টিয়ামের চলবে না...'

আনন্দ বলল, 'আপনি শুরুতেই অনেক বেশি টাকা দিতে চেয়েছেন।'

'হি ইজ দি বেস্ট,' বলল সিসিলিয়া। 'শুরুতে ওরা হয়তো আমার চেয়েও বেশি বলছে।'

দেখা গেল পাশের টেরেসে বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে ফুয়াদ, যেন কনসর্টিয়ামের প্রস্তাব মেনে নিতে পারছে না। রানা লক্ষ করল, বার্ট কিচনারের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

সিসিলিয়ার কাছে আবার ফিরে এল ফুয়াদ। 'মরিয়া হয়ে যেতে চাওয়ার সম্ভাব্য কারণ তো একটাই–ওখানে কিছু পাওয়া গেছে।'

'কিছু পাওয়া গেছে কি না আমি জানি না।'

'জানেন না, না বলবেন না?' জিজ্ঞেস করল ফুয়াদ। 'সলিড কোন কারণ না থাকলে এতগুলো টাকা কেউ খরচ করবে কেন?'

মুখ তুলে অ্যান্টিকস্ ঝাড়বাতি আর কারুকাজ করা সিলিং দেখছে সিসিলিয়া।

'ভিরুঙ্গা ফুলবাগান নয়,' বলে যাচ্ছে ফুয়াদ। 'কিগানিরা খেপে

উঠেছে—সবাই জানে তারা ক্যানিবল্, মানুষের মাংস খায়। পিগমিরাও এখন আর কারও বন্ধু নয়। এত কাঠখড় পুড়িয়ে যাচ্ছেন স্রেফ হয়তো পিঠে একটা বিষাক্ত তীর খাবার জন্য

'ৎসেৎসি মাছি। দূষিত পানি। নষ্ট প্রশাসন। খুব বড় কোন কারণ না থাকলে ওখানে কেউ যেতে চাইবে না, কী বলেন? পরিবেশ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের বোধহয় অপেক্ষা করা উচিত।'

একেবারে আনন্দর মনের কথা। সে বিড়বিড় করে বলল, 'আপনি অভিজ্ঞ মানুষ, মিস্টার ফুয়াদ, আপনার কথা তো উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'আপনি জ্ঞানী মানুষ,' ফুয়াদের মুখে চওড়া হলো হাসিটা।

'বোঝাই যাচ্ছে,' বলল সিসিলিয়া, 'আমরা একমত হতে পারছি না।'

'সেটা তো পরিষ্কারই।' মাথা ঝাঁকাল ফুয়াদ।

আনন্দ বুঝল, আলোচনা ভেঙে গেছে। করমর্দন করে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো সে। কিন্তু তার আগেই টেরেস থেকে ঘরে ঢুকে পড়ল ফুয়াদ। একটু পরই পাশের টেরেসে দেখা গেল তাকে, ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়ামের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

'আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি,' বলল সিসিলিয়া।

'কী রকম?' জানতে চাইল আনন্দ।

'কারণ, ফুয়াদের ধারণা, সাইট লোকেশান সম্পর্কে ওদের চেয়ে অনেক বেশি জানি আমরা। আমাদের কাছে মূল্যবান তথ্য আছে, ফলে 'ওর' খুব তাড়াতাড়ি পাব।' হঠাৎ তার খেয়াল হলো, ডাক শুরু হওয়ার পর থেকে একটা কথাও বলেনি রানা। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল সে।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে বসে রয়েছে রানা, চোখে চিকচিক করছে বহুদূর নক্ষত্রের আলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বলে ওর ঠোঁটে রহস্যময় এক চিলতে হাসি ঝুলে থাকতে দেখল সিসিলিয়া।

'মাসুদ ভাই?' ডাকল সে।

'বলো।'

'তুমি একদম চুপচাপ যে?'

'নাক গলাবার প্রয়োজন দেখছি না, তুমি তো বেশ ভালই ম্যানেজ করছ।'

পাশের টেরেসে হঠাৎ করে ত্রিদেশীয় প্রতিনিধিরা সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ব্যস্ত ভঙ্গিতে দরজার দিকে এগোচ্ছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ইটালিয়ান আর জার্মানদের সঙ্গে করমর্দন করল ফুয়াদ, জাপানিদের উদ্দেশে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল।

'বোধহয় আপনার কথাই ঠিক,' সিসিলিয়াকে বলল আনন্দ। 'মিস্টার ফুয়াদ ওদেরকে বিদায় করে দিচ্ছেন।'

কিন্তু সিসিলিয়ার কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। 'ওদের এই আচরণ স্বাভাবিক নয়,' বলল সে। 'এভাবে রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে যাওয়ার লোক নয় ওরা।'

ওদের টেরেসে ফিরে এসে ফুয়াদ জানাল, ডাইনিং রুমে সাপার পরিবেশন করা হয়েছে।

মরোক্কান স্টাইলে খেল ওরা। মেঝেতে বসে, চামচ ছাড়া শুধু আঙুল দিয়ে। প্রথম কোর্স কবুতরের পাই, তারপর এক ধরনের স্টু। সঙ্গে নানরুটি আর বটি কাবাবও আছে।

'আপনি তা হলে ওদেরকে বিদায় করে দিলেন?' জিজ্ঞেস করল সিসিলিয়া। 'স্রেফ না বলে দিলেন?'

'নাহ্, তা কী কেউ বলে নাকি!' মাথা নাড়ল ফুয়াদ। 'বললে ইমপোলাইট হত। আমি বলেছি ওদের অফার নিয়ে চিন্তা করব।'

'কী ছিল ওদের অফার?'

'আপনার তিনগুণ।'

'তা হলে?' সিসিলিয়াকে হতচকিত দেখাল।

'তা হলে কী?' জিজ্ঞেস করল ফুয়াদ।

'ওরা চলে গেল কেন? মানে, আপনি ওদের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি কেন?'

'সেটা জানেন আপনাদের লিডার,' বলে এই প্রথম সরাসরি রানার দিকে তাকাল ফুয়াদ। 'ওস্তাদ যখন এসে গেছেন, আমি কোনও টাকাই

নিচ্ছি না।'

'মানে?' সিসিলিয়া কিছুই বুঝতে পারছে না।

'আমার কাছে গোটা ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে,' মন্তব্য করল আনন্দ।

রানা এক মনে খাচ্ছে। 'খুব ভাল স্টু,' বলল ও।

'উটের মাংস, সার,' সমীহভরা কণ্ঠে বলল ফুয়াদ। 'আরেকটু দিই, সার।' এগিয়ে এসে রানাকে পরিবেশন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে।

সিসিলিয়া আর আনন্দ আক্ষরিক অর্থেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ফুয়াদের দিকে। তার আচরণ আর সংলাপ, কিছুই তাদের বোধগম্য হতে চাইছে না।

'আপনাকে সার কোথায় না আমি খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি। না পেলেও, আমার মনে আর কল্পনায় সব সময় ধরে রেখেছি আপনাকে। এই কল্পনার আপনিই বদলে দিয়েছেন ফুয়াদকে। অতি জঘন্য একটা পোচার থেকে আজ সে বিখ্যাত গাইড।

'বিশ্বাস করুন, সার, আপনার কাল্পনিক মূর্তিই আমাকে পোচিং ছেড়ে দিতে বলেছিল। আফ্রিকা মরতে বসেছে এইডস-এ। জাতিসংঘের এইডস ফান্ডে দশ লাখ ডলার দান করেছি আমি...'

হাত ধুয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ফুয়াদের কাঁধে হাত রেখে হাসল। তারপর দেখা গেল দু'জন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে।

ফুয়াদের নতুন একটা পরিচয় পেয়ে সিসিলিয়া একাধারে বিস্ময়ে বিমূঢ় এবং আনন্দিত। এতদিন যাকে প্রচণ্ড লোভী বলে জেনে এসেছে, দেখা যাচ্ছে ফুলের মতই নরম একটা মন আছে তার, আছে সাগরের মত উদারতা।

আবেগঘন মুহূর্তগুলো দ্রুতই পার হয়ে গেল। রানার সঙ্গে কোথায় কীভাবে পরিচয় হয়েছিল, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ফুয়াদ। সেইসঙ্গে রানাও জানাল সে-বার কেন ওকে জেল ভেঙে পালাতে হয়েছিল, সিসিলিয়া আর আনন্দর সঙ্গে ওর সম্পর্ক কতটুকু গভীর।

ও থামতে আবার কাজের কথায় ফিরে এল ফুয়াদ। আনন্দর উপর চোখ রেখে সে বলল, 'আপনার কাছে তা হলে একটা গরিলা আছে, ডক্টর সেন?'

'আপনি জানলেন কীভাবে?'

'জাপানিরা বলল আমাকে। আপনার কাছে গরিলা আছে শুনে ওদের তো শুধু পাগল হতে বাকি! বলছে, একজন তরুণের সঙ্গে একটা গরিলা? আরও বলছে, এক মার্কিন সুন্দরী কিনা খুঁজতে এসেছে–?'

'ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড ডায়মন্ড,' বলল সিসিলিয়া।

'হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড ডায়মন্ড।' আনন্দর দিকে ফিরল সে। 'আমি খোলাখুলি আলোচনা পছন্দ করি। ডায়মন্ড–খুবই দামী পাথর।'

'আপনি আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন, মিস্টার ফুয়াদ,' বলল সিসিলিয়া। 'অথচ কোনও টাকা নেবেন না–আমাদের লিডার মাসুদ রানার খাতিরে, তাই তো?' পরিস্থিতিটা ভাল করে বুঝতে চাইছে সে।

'হ্যাঁ,' বলল ফুয়াদ। 'সার যখন আপনাদের সঙ্গে আছেন, ফুয়াদ আপনাদের জন্যে জান কোরবান করে দেবে। কিন্তু ম্যাডাম, আপনার কাছ থেকে আরও দু'একটা প্রশ্নের জবাব আমাকে পেতে হবে। এ শুধু আমার প্রফেশনাল কৌতূহল নয়। সারকে নিয়ে যাব, তাই প্রথমেই জানতে হবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, কেন নিয়ে যাচ্ছি।'

'বলুন কী জানতে চান।'

'দুনিয়ার চারদিকেই আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড ডায়মন্ড পাবেন। আফ্রিকা, ইন্ডিয়া, রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা–কোথায় নেই? এমনকী আমেরিকাতেও পাওয়া যায়–আরকানসাস, নিউ ইয়র্ক, কেন্টাকিতে। কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কঙ্গোয়।'

অনুচ্চারিত প্রশ্নটা বাতাসে ভেসে থাকল।

'আমরা Type IIb, বোরন-কোটেড ব্লু ডায়মন্ড খুঁজছি,' বলল সিসিলিয়া। 'যার সেমিকনডাক্টিং প্রপার্টিজ মাইক্রোইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লিকেশনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।'

গোঁফে তা দিল ফুয়াদ। 'ব্লু ডায়মন্ড,' বলল সে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'এতক্ষণে পরিষ্কার হচ্ছে। এর কি বিকল্প তৈরি করা সম্ভব নয়? আর্টিফিশিয়াল?'

'না। আমেরিকান আর জাপানিরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।'

'কাজেই আপনাকে একটা ন্যাচারাল সোর্স পেতে হবে?' নাক

চুলকে জানতে চাইল ফুয়াদ।

'হ্যাঁ। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছাতে চাইছি ওখানে।' তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সিসিলিয়া।

হাঁটতে হাঁটতে জানালার সামনে চলে এসে মাথা ঝাঁকাল ফুয়াদ। কিছু বলতে যাবে, এইসময় কাছাকাছি কোথাও থেকে মেশিনগান গর্জে উঠবার বিকট শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে একপাশে ডাইভ দিয়ে পড়ল ফুয়াদ। দেয়ালে টাঙানো ফটো ঝন-ঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ভেসে এল, হাঁক-ডাক ছাড়তে ছাড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'ভয় নেই, আমার বডিগার্ড শত্রুদের ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিচ্ছে,' সিধে হয়ে বলল ফুয়াদ।

'এই শত্রু কারা?' জানতে চাইল আনন্দ।

'তাও বলে দিতে হবে? জাপানি আর জার্মানরা এই কাজের জন্যেই তো ইটালিয়ানদের সঙ্গে রেখেছে–প্রয়োজনে মানুষকে ভয় দেখাবে। আমি প্রত্যাখ্যান করায় খেপে গেছে ওরা...'

'তাই বলে গুলি করবে?'

'কাউকে লেগেছে?' হাসল ফুয়াদ। 'লাগাবার জন্যে করাও হয়নি। শুধু ভয় দেখাল, সাবধান করে দিল।'

জামা থেকে ধুলো আর প্লাস্টার ঝেড়ে সিধে হলো সিসিলিয়াও।

'পাঁচ মিনিট সময় দিন,' বলল ফুয়াদ। 'আমি তৈরি হয়ে আসি। নাইরোবিতে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হলে এখানে আমাদের দেরি করাটা উচিত হবে না।'

'ইয়ে, মানে, তাই বলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে?' সিসিলিয়াকে হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখাল, চট করে একবার হাতঘড়িও দেখল।

'কেন, ম্যাডাম, আপনার সমস্যাটা কী?' জানতে চাইল ফুয়াদ।

'চেক একে-ফোরটিসেভেন,' বলল সিসিলিয়া। 'আপনার ওয়্যারহাউসে।'

ফুয়াদ মোটেও অবাক হলো না। 'ওগুলো সরিয়ে ফেলা উচিত,' বলল সে। 'সন্দেহ নেই কনসর্টিয়ামও একই ধরনের কিছু একটা করে রেখে গেছে। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় অনেক কাজ সারতে হবে

আমাদের।' তার কথার মাঝখানেই পুলিশ কার-এর সাইরেন শোনা গেল, শব্দটা দ্রুত কাছে চলে আসছে। ফুয়াদ সিদ্ধান্ত পাল্টাল: 'আমরা পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে কেটে পড়ব।'

এক ঘণ্টা পর আকাশে উঠল ওদের কার্গো প্লেন, নাইরোবির দিকে ছুটে চলেছে।

ছয়

আটলান্টিকের উপর দিয়ে নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডন যত দূর, তারচেয়ে অনেক বেশি দূর আফ্রিকার আকাশের উপর দিয়ে তাঞ্জিয়ার থেকে নাইরোবি। তিন হাজার ছয়শো মাইল, ঝাড়া আট ঘণ্টার ফ্লাইট। সময়টা কমপিউটার কনসোলে কাটাল রানা, ওর ভাষায় 'হাইপারস্পেস প্রোবাবিলিটি লাইনস'-এর উপর কাজ করে।

স্ক্রিনে কমপিউটার-জেনারেটেড আফ্রিকার একটা ম্যাপ দেখা যাচ্ছে, ম্যাপের উপর বহুরঙা রেখা টানা। 'এগুলো টাইম লাইন,' বলল রানা আনন্দকে। 'জার্নির মেয়াদ নির্ধারণ আর বিলম্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে হিসাব পেতে সাহায্য করবে।' স্ক্রিনের নীচে একটা টোটাল-ইল্যাপস্‌টাইম ক্লক রয়েছে, দ্রুত বদলে যাওয়া সংখ্যাগুলো দেখাচ্ছে সেটা।

'সহজ করে বল, দোস্ত।'

'কমপিউটার দ্রুততম রুট খুঁজে দিচ্ছে। দেখলি না, এইমাত্র একটা টাইমলাইন আইডেনটিফাই করল ওটা, বলল ছয়দিন আঠারো ঘণ্টা একান্ন মিনিটের মাথায় সাইটে পৌঁছে দেবে আমাদেরকে। এখন আবার ওই সময়টাকে কমিয়ে আনবার চেষ্টা করছে।'

আনন্দকে জোর করে হাসতে হলো। কমপিউটার মিনিট ধরে বলে

দেবে কখন তারা কঙ্গো রেইন ফরেস্টে পৌঁছাবে, এই ধারণাটাই তার কাছে বিদঘুটে লাগছে। কিন্তু রানা পুরোপুরি সিরিয়াস।

একটু পরেই কমপিউটারের ঘড়িতে সময়টা বদলে গেল: এখন অকুস্থলে পৌঁছাতে পাঁচদিন বাইশ ঘণ্টা চব্বিশ মিনিট লাগবে ওদের।

'ভাল,' বলল রানা, মাথা ঝাঁকাল। 'তবে এখনও খুব ভাল বলা চলে না।' আরেকটা বোতামে চাপ দিল ও। লাইনগুলো বদলে যাচ্ছে–রাবার ব্যান্ড-এর মত বড় হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের উপর।

'এটা হলো কনসর্টিয়াম রুট,' বলল ও, 'বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে কিছুটা আন্দাজ মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বড় দল নিয়ে যাচ্ছে ওরা–ত্রিশ বা তারও বেশি লোকজন।

'কিন্তু শহরটার সঠিক অবস্থান ওদের জানা নেই। অন্তত আমরা জানি যে ওরা জানে না। তবে আমাদের চেয়ে বারো ঘণ্টা এগিয়ে আছে ওরা, যেহেতু কাস্টমসের ঝামেলা সেরে ওদের প্লেন আগে থেকেই নাইরোবিতে অপেক্ষা করছিল।'

'উৎসাহিত হওয়ার মত কিছু নয়,' বলল আনন্দ।

কমপিউটারকে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ হিসাব করিয়ে নিয়ে রানা বলল, 'এই দেখ, এটা হলো এখনকার চূড়ান্ত টাইমলাইন। দু'পক্ষই ম্যাক্সিমাম অনুকূল পরিস্থিতি পেলে, কনসর্টিয়াম সাইটে পৌঁছাবে আমাদের চেয়ে চারঘণ্টার কিছু বেশি আগে, আজ থেকে পাঁচদিন পর।'

পাশ ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে ফুয়াদ, মচ্-মচ্ শব্দ করে স্যান্ডউইচ চিবাচ্ছে। 'সার, কমপিউটারকে বলুন আর একটু কম সময়ে আমাদেরকে পৌঁছে দিতে হবে।'

চেয়ার থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল রানা। 'তোমরা কেউ বলে দেখো পারে কী না। আমি কফি খেতে চললাম।'

নিজের সিট ছেড়ে উঠে এল সিসিলিয়া, কমপিউটারের সামনের সিটে বসে দ্রুত চাপ দিল কয়েকটা বোতামে। স্ক্রিনের নীচে ক্যাপিটাল লেটারে ফুটে উঠল লেখাটা: BLUE CONTRACT.

'ব্লু কন্ট্র্যাক্ট মানে কী?' জানতে চাইল আনন্দ।

'অফুরন্ত টাকা,' জবাব দিল সিসিলিয়া। 'অন্তত আমার তাই ধারণা।' আসলে এখনও জানে না সে।

ভিআরএমসি-র প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টের একটা নাম দেওয়া হয়। ব্লু কন্ট্র্যাক্ট অ্যাসাইনমেন্টটা হলো: কঙ্গো সরকারের অনুমতি নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড ডায়মন্ড-এর ন্যাচারাল সোর্স খুঁজে বের করা হবে।

সেই ডায়মন্ড হতে হবে Type IIb, 'নাইট্রজেন-পুওর' ক্রিস্টাল। কোনও ডাইমেনশন উল্লেখ করা হয়নি, কাজেই ক্রিস্টাল সাইজের কোন গুরুত্ব নেই।

একটা ইন্ডাস্ট্রি কয়েক মাস পরপর বড় মাপের লাফ দিয়ে কীভাবে উন্নতি করছে, এর আলোকে দেখলে ব্লু কন্ট্র্যাক্ট-এর মাহাত্ম্য আর গুরুত্ব বোঝা যাবে।

যে-সব ইন্ডাস্ট্রিতে এক কি দু'মাসকে স্কেল ধরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিনারা মাপা হয়, সে-সব ইন্ডাস্ট্রির কোম্পানি নতুন টেকনিক আর ডিভাইস ব্যবহার করে মাত্র কয়েক হপ্তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে বিপুল লাভের মুখ দেখেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার সিনটেল কোম্পানি প্রথম যখন একটা 256K মেমোরি চিপ বানাল, বাকি সব কোম্পানি তখনও 16K চিপস বানাচ্ছে, আর স্বপ্ন দেখছে কবে 64K চিপস বানাতে পারবে।

সিনটেল এগিয়ে থাকতে পেরেছিল মাত্র ষোলো হপ্তা, কিন্তু এই চারমাসে তারা কামিয়ে নেয় একশো ত্রিশ মিলিয়ন ডলার।

'আর এখানে আমরা পাঁচ বছরের কথা আলোচনা করছি,' বলেছেন মার্ক জিলেট। 'এই এগিয়ে থাকাটাকে মিলিয়ন নয়, বিলিয়ন দিয়ে মাপতে হবে–হয়তো কয়েকশো বিলিয়ন দিয়ে। সত্যি যদি ওই ডায়মন্ড আমরা পাই।'

নাইরোবির পাঁচ মাইল বাইরে যে-কেউ বন্যপ্রাণীর দেখা পেতে পারে। শহরের পর পুব আফ্রিকার খোলা প্রান্তর ধু-ধু করছে। আগের দিনে শোনা গেছে মানুষের উঠানেও নাকি চরে বেড়াত হরিণ, মোষ আর জিরাফ। এমনকী মাঝে-মধ্যে দু'একটা চিতাও ঢুকে পড়ত বেড রুমে। তবে সে-সব দিন আর নেই।

১৬ জুন ভোরবেলা নাইরোবি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামল ওদের কার্গো প্লেন। সঙ্গে সঙ্গে অভিযানের জন্য পোর্টার আর সহকারী

সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফুয়াদ। রানা তাকে বলে দিয়েছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে নাইরোবি ত্যাগ করতে চায় ও।

দু'ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই ওয়াশিংটন থেকে মার্ক জিলেট যোগাযোগ করলেন। অপ্রত্যাশিত একটা তথ্য দিলেন তিনি। পেমব্রোক, প্রথম কঙ্গো অভিযানের একজন জিয়োলজিস্ট, যেভাবেই হোক প্রাণ নিয়ে নাইরোবিতে ফিরতে পেরেছেন।

শুনে আনন্দে-উত্তেজনায় প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়ল সিসিলিয়া। 'এখন তিনি কোথায়?'

'মর্গে,' বললেন জিলেট।

কাছাকাছি আসতে শিউরে উঠল রানা: স্টেইনলেস স্টীল টেবিলে পড়ে থাকা লোকটা শ্বেতাঙ্গ, ওরই সমবয়েসী হবে। লাশের হাত দুটো ভাঙা, চামড়া ফুলে আছে, সারা গায়ে কালশিটের দাগ।

সিসিলিয়ার দিকে তাকাল ও। ঠাণ্ডা সে, চোখ দুটো কঠিন।

প্যাথলজিস্ট ওদের কাগজ-পত্র দেখতে চাইলেন। পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর বললেন, 'আমরা সবাই খুব আশ্চর্য হয়েছি। এ তো গল্পকেও হার মানায়।'

কাল, ১৫ জুন, ছোট একটা চার্টার করা কার্গো প্লেনে করে নাইরোবিতে নিয়ে আসা হয় পেমব্রোককে। তখনও অজ্ঞান ছিলেন তিনি। কয়েক ঘণ্টা পর মারা যাওয়ার সময়ও জ্ঞান ফেরেনি।

চার্টার প্লেনটা যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে কঙ্গোর একটা মেটো পথের ধারে, গারোনা ফিল্ডে ল্যান্ড করতে বাধ্য হয়েছিল। ওই সময় পেমব্রোক হোঁচট খেতে খেতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেন, তারপর আরোহীদের পায়ের কাছে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান।

আঙুল তাক করে দেখালেন প্যাথলজিস্ট, দুই হাতের হাড়ই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আঘাতগুলো নতুন নয়, দিন চারেক আগের। 'ভাবতেও শিউরে উঠতে হয় কী ভয়ঙ্কর ব্যথা সহ্য করেছেন ভদ্রলোক।'

'এরকম আঘাত কীভাবে পেলেন তিনি, কোন ধারণা দিতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এরকম আগে কখনও দেখিনি আমি,' বললেন প্যাথলজিস্ট। 'মেকানিকাল ক্র্যাশ নয়, এটুকু বলতে পারি–অর্থাৎ, হাতের ওপর দিয়ে কোন ট্রাক বা অন্য কোন গাড়ি চলে যায়নি। ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। লাশের নখেও রক্ত পেয়েছি আমরা। রক্ত আর কয়েক গাছি চুল। টেস্ট করে দেখা হচ্ছে।'

মর্গের আরেক প্রান্তে মাইক্রোস্কোপ থেকে মুখ তুললেন দ্বিতীয় প্যাথলজিস্ট। 'চুলগুলো অবশ্যই মানুষের নয়। ক্রস সেকশন মিলছে না। কোনও ধরনের জানোয়ার, মানুষের কাছাকাছি।'

বড় একটা স্টেইনলেস-স্টীল অ্যানালাইজার পিংপিং আওয়াজ শুরু করল। দ্বিতীয় প্যাথলজিস্ট বললেন, 'ব্লাড টেস্ট কমপ্লিট।'

ভিডিও স্ক্রিনে ব্লাড সেল-এর নকশা ফুটল, পাশাপাশি দুটো। একটা মানুষের রক্ত, আরেকটা পেমব্রোকের নখের ভিতর থেকে পাওয়া।

'মিলছে না,' প্যাথলজিস্ট বললেন। 'এটা কোনও মানুষের রক্ত নয়।'

'তা হলে কীসের রক্ত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডোমেস্টিক বা ফার্ম অ্যানিমেল-এর রক্ত হতে পারে–সম্ভবত শুয়োরের। কিংবা হয়তো কোন প্রাইমেট-এর। মাঙ্কি আর এইপ্ সেরোলজিক্যালি মানুষের খুব কাছাকাছি। এক মিনিট অপেক্ষা করুন, প্লিজ–এখনই আমরা একটা কমপিউটার অ্যানালিসিস পাব।'

স্ক্রিনে কমপিউটার প্রিন্ট করল–আলফা অ্যান্ড বেটা সেরাম গ্লবিউলিনস্ ম্যাচ: গরিলা ব্লাড।

প্যাথলজিস্ট বললেন, 'নিঃসন্দেহে জানা গেল নখের ভিতর কী ছিল। গরিলার রক্ত।'

'ভয় পাও কেন, অ্যাই, ভয় পাও কেন? ও তোমার কোন ক্ষতি করবে না,' সন্ত্রস্ত আরদালিকে বলল আনন্দ। ৭৪৭ কার্গো জেটের প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে রয়েছে ওরা। 'দেখছ, কেমন হাসছে ও?'

কথাটা সত্যি, শৈলী হাসছে। হাসলেও, খুব সতর্ক হয়ে আছে যাতে দাঁত না বেরোয়। কিন্তু নাইরোবির একটা নাম করা ক্লিনিক

থেকে আসা আরদালি এরকম সূক্ষ্ম গরিলাসুলভ কেতাকায়দার সঙ্গে পরিচিত নয়। তার সিরিঞ্জ ধরা হাত কাঁপছে।

নাইরোবি ছিল শৈলীকে পুরোদস্তুর চেকআপ করাবার শেষ সুযোগ। নিউ ইয়র্কে একদিন অন্তর তার ইউরিন পরীক্ষা করা হয়েছে। অকাল্ট ব্লাড-এর খোঁজে স্টুল পরীক্ষা করা হয়েছে প্রতি হপ্তায়। মাসে একবার কমপ্লিট ব্লাড স্টাডি। তিন মাস পরপর একবার করে যেতে হয়েছে ডেন্টিস্টের কাছে।

এ-সব খুব সহজভাবে নেয় শৈলী। কিন্তু তা তো আর আতঙ্কিত আরদালির জানবার কথা নয়। সে সিরিঞ্জটাকে অস্ত্রের মত সামনে ধরে এগোল। 'ঠিক বলছেন, কামড়ে দেবে না?'

শৈলী সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়ে ইঙ্গিত করল: 'শৈলী কথা দিচ্ছে কোন কামড় নয়।' সংকেত বা ইঙ্গিতগুলো ধীর ভঙ্গিতে দিচ্ছে সে, তার ভাষা জানে না এমন নতুন কাউকে দেখলে যেভাবে দেয়।

রক্তের নমুনা নেওয়ার পর আরদালির পেশীতে ঢিল পড়তে দেখা গেল। নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'সন্দেহ নেই যে কুৎসিত একটা দানব।'

আনন্দ বলল, 'তুমি ওর মনে আঘাত দিচ্ছ।'

আর, সত্যি, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে সংকেত দিচ্ছে শৈলী: 'কী কুৎসিত?'

'কিছু না, শৈলী,' বলল আনন্দ। 'সে আগে কখনও গরিলা দেখেনি আর কী।'

'মানে?' আরদালি অবাক।

'ও দুঃখ পেয়েছে। তোমার মাফ চাওয়া উচিত।'

মেডিকেল কেসটা ঝট করে বন্ধ করে আনন্দর দিকে তাকাল আরদালি। তারপর আবার শৈলীর দিকে ফিরল। 'আপনি আমাকে ওই ব্যাটার কাছে মাফ চাইতে বললেন?'

'বেটি,' বলল আনন্দ। 'হ্যাঁ। তোমাকে কুৎসিত বললে তোমার কেমন লাগত?'

'আপনি বলতে চাইছেন, আপনার এই গরিলা ইংরেজি বোঝে?'

'বোঝে।'

মাথা নাড়ল আরদালি। 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'শৈলী, লোকটাকে দরজা দেখিয়ে দাও।'

থপ্ থপ্ করে পা ফেলে এগোল শৈলী, তারপর আরদালির জন্য দরজার কবাট খুলে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। চৌকাঠ পেরোবার সময় লোকটার চোখ মনে হল ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। তার পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল শৈলী।

'বোকা হিউম্যান,' সংকেত দিল সে।

'ভুলে যাও,' বলল আনন্দ। 'এসো, আনন্দ তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে।'

পরবর্তী পনেরো মিনিট মাথায় হাত বুলাবার ছলে শৈলীকে আদর করল আনন্দ। সারাক্ষণ মেঝেতে গড়াগড়ি খেল শৈলী, তৃপ্তিকর আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা থেকে।

আনন্দ লক্ষই করল না তার পিছনে খুলে গেল দরজা। ছায়া পড়ল, সেটাও তার পিছনে, দেখতে পাওয়ার কথা নয়। অবশ্য একটু পর তাকে পাশ কাটাতে শুরু করল সেটা। কেউ প্লেনে ঢুকেছে, বুঝতে পারল আনন্দ। রানা আর সিসিলিয়া বোধহয় ফিরল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গেল সে।

গাঢ় রঙের একটা সিলিন্ডার এক পলকের জন্য দেখা গেল। পরিষ্কার নয়, ঝাপসা, সবেগে নেমে আসছে। অন্ধ করে দেওয়ার মত তীব্র ব্যথা বিস্ফোরিত হলো মাথায়। সব কালো হয়ে গেল।

তীক্ষ্ণ আর কর্কশ ইলেকট্রনিক আওয়াজে জ্ঞান ফিরল তার।

'নড়বেন না, সার,' কে যেন বলল।

চোখ মেলে আনন্দ দেখল তার মুখের উপর উজ্জ্বল একটা আলো ফেলা হয়েছে। এখনও প্লেনের পিছন দিকে শুয়ে রয়েছে সে। টর্চ হাতে কে যেন ঝুঁকে পরীক্ষা করছে তাকে।

'বাম দিকে তাকান...এবার ডান দিকে...আঙুলগুলো নাড়তে পারেন?'

যেমন বলা হচ্ছে করছে আনন্দ। টর্চ নেভালেন ভদ্রলোক–নিগ্রো, সাদা ড্রেস বলে দিচ্ছে পেশায় ডাক্তার। আনন্দর মাথার পিছনটা হাত দিয়ে পরীক্ষা করলেন। তাঁর আঙুলে রক্ত দেখল আনন্দ।

'উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কিছু নয়,' বললেন তিনি। 'ক্ষত গভীর নয়।' আরেক দিকে তাকালেন। 'আন্দাজ কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলেন উনি?'

'মিনিট বিশেক, তার বেশি নয়,' বলল সিসিলিয়া।

কর্কশ ইলেকট্রনিক আওয়াজটা আবার হলো। রানাকে দেখতে পেল আনন্দ–প্যাসেঞ্জার সেকশনের ভিতর ঘুর ঘুর করছে, বয়ে বেড়াচ্ছে একটা শোল্ডার প্যাক, সামনে ধরা আছে ধাতব একটা লাঠি। গা রি-রি করা শব্দটা আবার শোনা গেল।

'ধুস্ শালারা!' বলল রানা, জানালার কাঠামো থেকে কী যেন একটা টেনে ছাড়িয়ে নিল। 'এটা নিয়ে পাঁচটা।'

ফুয়াদ অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। 'আপনি এখন কেমন বোধ করছেন, ডক্টর সেন?' জানতে চাইল সে।

'ওঁকে চব্বিশ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখতে হবে,' নিগ্রো ডাক্তার বললেন। 'স্রেফ সাবধানতা আর কী।'

'চব্বিশ ঘণ্টা!' গলায় অসন্তোষ নিয়ে বলল রানা, কমপার্টমেন্টের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আনন্দ জানতে চাইল, 'ও কোথায়?'

'ওরা ওকে নিয়ে গেছে,' বলল সিসিলিয়া। 'পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে তারা, নিউম্যাটিক স্লাইড ফোলায়, তারপর কী ঘটেছে কেউ বোঝবার আগেই চলে গেছে। এটা আমরা আপনার পাশে পেয়েছি।' আনন্দর হাতে ছোট একটা কাঁচের ভায়াল গুঁজে দিল সে। ভায়ালটার গায়ে জাপানি ভাষায় কী সব লেখা। কাঁচের গায়ে আঁচড়ের দাগ রয়েছে। একপ্রান্তে রাবার প্লাঞ্জার, আরেক প্রান্তে ভাঙা সুই।

উঠে বসল আনন্দ।

'সাবধান,' বললেন ডাক্তার।

'আমি সুস্থ,' বলল আনন্দ, যদিও মাথাটা ব্যথায় দপদপ করছে। ভায়ালটা চোখের সামনে তুলল সে। 'যখন পেলেন তখন কী এটার গায়ে ঘাম লেগে ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল সিসিলিয়া। 'খুব ঠাণ্ডা লাগছিল।'

'Co_2,' বলল আনন্দ। এটা গ্যাস গান থেকে ছোঁড়া একটা খুদে বর্শা। মাথা নাড়ল সে। 'ভাঙা সুই শৈলীর শরীরে রয়ে গেছে।' শৈলীর

প্রচণ্ড রাগ আর গর্জন কল্পনা করতে পারছে সে।

নরম ব্যবহার, যত্ন আর আদর ছাড়া বাকি সব কিছুতে অনভ্যস্ত শৈলী। আনন্দর গবেষণার এটাই বোধহয় সবচেয়ে দুর্বল দিক: শৈলীকে সে বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার মত করে তৈরি করেনি।

ভায়ালটা শুঁকল আনন্দ। 'লোবাক্সিন। ফাস্ট-অ্যাকটিং সপারিফিক, পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে কাজ শুরু করে।' রাগ হচ্ছে তার। এ-ধরনের ঘুম পাড়ানোর ড্রাগ সাধারণ পশুদের দেওয়া হয় না, কারণ তাতে লিভারের ক্ষতি হয়। তার উপর তারা সুইটা ভেঙে ফেলেছে–

সিধে হয়ে দাঁড়াল আনন্দ। দেখতে পেয়ে পায়চারি থামিয়ে তার কাছে চলে এল ফুয়াদ। 'আমার গায়ে হেলান দিন।'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন।

'আমি সুস্থ,' আবার বলল আনন্দ।

কমপার্টমেন্টের আরেক প্রান্ত থেকে আবার সেই আওয়াজ, এবার প্রলম্বিত। রানা তার ধাতব দণ্ড মেডিসিন কেবিনেটে সাজানো ট্যাবলেটের বোতল আর সাপ্লাইয়ের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কালো একটা ডিভাইস তুলে নিয়ে ওখান থেকে সরে এল রানা। 'মাইক্রোফোন লুকাবার জন্যে সঙ্গে করে তারা আলাদা একজন লোক এনেছিল,' বলল ও। 'গোটা প্লেন পরিষ্কার করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে।' দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে কমপিউটার কনসোলের সামনে বসল ও. টাইপ করছে।

আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় তারা? গড ড্যাম কনসর্টিয়াম?'

'নাইরোবির দ্বিতীয় এয়ারপোর্ট কুবালা থেকে ওদের মূল পার্টি ঘণ্টা ছয়েক আগে রওনা হয়েছে,' বলল ফুয়াদ।

'তারমানে শৈলীকে তারা সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি।'

'তা তো নিয়ে যাবেই না, বলল রানা। 'ওকে তাদের কী দরকার?'

'তা হলে কি মেরে ফেলেছে?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'অসম্ভব নয়,' মৃদুকণ্ঠে বলল ফুয়াদ।

'ভগবান! ও ভগবান!'

'আমি মনে করি না মেরে ফেলেছে,' কমপিউটার কনসোল থেকে

বলল রানা। 'আনন্দর ক্ষত পরীক্ষা করে আমি বুঝেছি, ওকে তারা খুন করতে চায়নি। আর শৈলীকেও যে খুন করেনি, তার প্রমাণ–এখানেই তো মেরে রেখে যেতে পারত, অজ্ঞান করে নিয়ে যাবে কেন?'

'হ্যাঁ, এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে,' বলল ফুয়াদ। 'কনসর্টিয়াম পাবলিসিটি চায় না। শৈলী বিখ্যাত গরিলা, ভাষা জানে, তাকে মেরে ফেললে হইচই পড়ে যাবে।'

'তা হলে?'

'এ তো সহজ কথা,' বলল রানা। আমাদেরকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে শৈলীকে তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু তারা জানে না যে শৈলীকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।'

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেয়ে রানাকে এক মুহূর্ত দেখল আনন্দ। 'এখন আমরা কী করব?' আহত কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'ওরা আমাদেরকে দেরি করিয়ে দিতে পারবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'শৈলীর কোন গুরুত্ব নেই। তার জন্যে আমরা সময় নষ্ট করতে পারি না।' কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও। 'আমাদের টাইমলাইন ভেঙে পড়বে বাহাত্তর মিনিট পর।' ঘাড় ফিরিয়ে ফুয়াদের দিকে তাকাল। 'ভুলো না যে আমাদেরকে সেকেন্ড কনটিনজেন্সি প্ল্যান কাজে লাগাতে হবে।'

'জী, সার।' শিরদাঁড়া খাড়া করে টান টান হলো ফুয়াদ।

'আমি একটা নতুন প্লেন চাই,' বলল রানা। 'এটা দূষিত হয়ে গেছে। ঠিক আছে?'

'জী, সার,' বলল ফুয়াদ। 'এখনই আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

আনন্দ বলল, 'শৈলীকে রেখে কোথাও আমি যাব না। তোরা যদি ওকে ফেলে যেতে চাস, আমাকেও রেখে যেতে হবে–' স্ক্রিনে চোখ পড়তে থেমে গেল সে।

ওয়াশিংটন থেকে মার্ক জিলেটের পাঠানো মেসেজ আসছে স্ক্রিনেঃ 'গরিলার কথা ভুলে যান। পরবর্তী চেকপয়েন্টে পৌঁছানোটা জরুরি। গরিলার কোন গুরুত্ব নেই। টাইমলাইন ঠিক রাখাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৈলীকে রেখেই রওনা হয়ে যান।'

'এটা তোদের অন্যায়,' বিষণ্ন স্বরে প্রতিবাদ করল আনন্দ। 'ঠিক

আছে, আমাকেও রেহাই দে, শৈলীকে ছাড়া আমিও যাচ্ছি না।'

'কথাটা তা হলে খুলেই বলি তোকে,' বলল রানা, চেহারায় রাগ-রাগ ভাব। 'আমি কখনোই ভাবিনি যে শৈলী বা তুই এই এক্সপিডিশানের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। শুরু থেকেই শৈলীকে আমরা স্রেফ একটা ডাইভারশান হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছি। তোকে আর শৈলীকে–দুজনকেই। তোদের ধাঁধার সমাধান করতে না পেরে কনসর্টিয়ামকে লাটিমের মত পাক খেতে হয়েছে।

'সত্যি কথা বলতে কী, তখন তোদের দু'জনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এখন নেই। দরকার হলে তোদের দু'জনকে এখানে আমরা ফেলে রেখে যাব। এরকম একটা কঠিন মিশনে কোনও রকম আবেগকে প্রশ্রয় দেয়া চলে না।'

সাত

'কে তুই?' চেঁচিয়ে উঠল আনন্দ। 'রানা? হায় ভগবান, তোকে আমি চিনতে পারছি না কেন?'

'চিনতে না পারাটা তোর দুর্বলতা,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'তবে যত নির্মমই শোনাক, কথাটা সত্যি–তোকে আর তোর গরিলাকে নির্দ্বিধায় আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি।' তবে কথা বলতে বলতেই কনসোল ছেড়ে সরে এসে প্লেন থেকে আনন্দকে বের করে আনল ও, ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকিয়ে রেখেছে।

আনন্দ বুঝল, নিভৃতে তাকে সান্ত্বনা দেবে রানা। কিন্তু শৈলী তার আত্মার কাছাকাছি একটা প্রাণ। ওকে ফেলে কোথাও সে যাবে না।

কংক্রিট রানওয়েতে পা দিয়ে জেদের সুরে সে বলল, 'শৈলীকে রেখে কোথাও আমি যাচ্ছি না।'

'আমিও যাচ্ছি না রানওয়ের উপর দিয়ে একটা পুলিশ হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটছে রানা।

রানার সঙ্গে তাল মেলাবার জন্য ছুটতে শুরু করল আনন্দ। 'কী?'

'এই গাধা, তোর মাথায় কি ঘিলু বলে কিছু নেই?' বলল রানা। 'ওই প্লেন পরিষ্কার নয়। ওখানে আরও অনেক খুদে মাইক্রোফোন আছে, সেগুলোর সাহায্যে আমাদের সব কথা শুনছিল কনসর্টিয়াম। ওখানে বসে যা কিছু বলেছি আমি, সবই ওদেরকে মিথ্যে তথ্য দেয়ার জন্যে।'

'শৈলী আর আমি তা হলে শুধু একটা ডাইভারশান নই?'

'আরে, না!' আনন্দর কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'শোন। সিসিলিয়ার শেষ কঙ্গো টিমের কপালে কী ঘটেছে আমরা জানি না। কে কী বলল তাতে কিছু আসে যায় না, আমি মনে করি গরিলারা দায়ী। আমার এ-ও বিশ্বাস যে ওখানে পৌঁছবার পর শৈলী আমাদের কাজে লাগবে।'

'একজন অ্যামব্যাসাডার হিসেবে?'

'আমাদের তথ্য দরকার,' বলল রানা। 'আর শৈলী গরিলা সম্পর্কে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানে।'

'কিন্তু তাকে কি তুই এক ঘণ্টা বারো মিনিটের মধ্যে খুঁজে বের করতে পারবি?'

'দূর, না,' বলল রানা, হাতঘড়িতে সময় দেখল। 'এই কাজে বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'নীচে! আরও নীচে!'

পুলিশের হেলিকপ্টারে পাইলটের পাশে বসে নিজের রেডিও হেডসেটে চেঁচাচ্ছে রানা। কপ্টার গভর্নমেন্ট হাউসের টাওয়ারকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বড় করে বাঁক নিল, উত্তর দিকে যাচ্ছে। হিলটন হোটেলটা ওদিকেই।

'এটা বেআইনী কাজ হচ্ছে, সার,' নরম সুরে বলল পাইলট। 'এয়ারস্পেস লিমিটেশনের নীচে দিয়ে উড়ছি আমরা।'

'তা হলে তারপরও এত উঁচু লাগছে কেন?' রানা তাকিয়ে আছে

হাঁটুর উপর ফেলে রাখা একটা বাক্সের দিকে। বাক্সটায় চারটে কম্পাস-পয়েন্ট ডিজিটাল রিডআউট দেখা যাচ্ছে। দ্রুত কয়েকটা সুইচ অন করল ও। ওদিকে রেডিও থেকে ভেসে আসছে নাইরোবি টাওয়ারের ক্ষুব্ধ অভিযোগ।

'এবার পুবে চলুন,' নির্দেশ দিল রানা। কাত হয়ে বাঁক নিচ্ছে কপ্টার। পুবদিকের শহরতলিতে পৌঁছে যাচ্ছে ওরা।

ওদের পিছনে বসে দরদর করে ঘামছে আনন্দ। প্রতিটি বাঁক ঘুরবার সময় তার পেটের ভিতরটা মোচড় খাচ্ছে। মাথার ব্যথাটাও বেড়ে গেছে আগের চেয়ে।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'একটা রিডিং পাচ্ছি!' হাত তুলে পাইলটকে উত্তর-পুবদিকটা দেখাল।

বড়সড় একটা চালাঘরের উপর দিয়ে ছুটল কপ্টার। অসংখ্য পরিত্যক্ত মোটর গাড়ি ফেলে রাখা হয়েছে বিরাট একটা এলাকা জুড়ে। কাঁচা একটা রাস্তাকে পিছনে ফেলে এল ওরা।

'ধীরে। ধীরে-ধীরে।'

রিডআউট জ্বলজ্বল করছে, সংখ্যাগুলো বদলে যাচ্ছে দ্রুত। রানার কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে সবগুলো সংখ্যাকে শূন্য হয়ে যেতে দেখল আনন্দ।

'নামুন!' নির্দেশ দিল রানা। কপ্টার বিশাল একটা গারবিজ ডাম্প-এর মাঝখানে নামল।

নিজের মেশিন ছেড়ে নড়বে না পাইলট। তার মন্তব্য একটু অস্বস্তি কর লাগল আনন্দর।

'যেখানে আবর্জনা সেখানেই ইঁদুর। সাবধানে যাবেন।'

বাক্সটা নিয়ে নামছে রানা, ওর পিছু নিয়ে আনন্দ বলল, 'ইঁদুরকে আমি ভয় পাই না।'

'যেখানে ইঁদুর সেখানেই সাপ,' বলল পাইলট।

আনন্দকে নিয়ে ডাম্পটা পেরুচ্ছে রানা। চারদিকে শুকনো আবর্জনা, তাই গন্ধটা তীব্র নয়। ধুলো আর কাগজ উড়ছে বাতাসে। আনন্দ রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরল।

'আর বেশি দূরে নয়,' বাক্সের উপর চোখ রেখে বলল রানা।

উত্তেজিত । হাতঘড়ি দেখল।

'এখানে?'

ঝুঁকল রানা, খালি হাতটা দিয়ে আবর্জনা সরাচ্ছে। আনন্দ হতচকিত। ভাবছে, এই আবর্জনার ভিতর শৈলী ডুবে আছে?

হতাশ রানা মরিয়া হয়ে উঠেছে। জঞ্জালের ভিতর কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে খুঁজছে ও।

অবশেষে নেকলেসটা পেল। এই নেকলেস শৈলীকে উপহার দিয়েছিল রানা, প্লেনে প্রথম যেদিন তোলা হয় তাকে।

জিনিসটা উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করছে রানা। পিছনদিকে তাজা আঁচড়ের দাগ ফুটে রয়েছে।

'সেরেছে,' বলল রানা। 'ষোলো মিনিট বেরিয়ে গেছে।'

সিধে হয়েই হেলিকপ্টারের দিকে ছুটল ও।

ওর পাশেই থাকল আনন্দ। 'শৈলীর নেকলেস মাইক্রোফোন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওরা, এখন তা হলে ওকে আমরা পাব কীভাবে?'

'কেউ কখনও,' জবাব দিল রানা, 'একটা মাইক্রোফোন লুকায় না। এটা স্রেফ একটা টোপ, রাখাই হয়েছিল যাতে দেখতে পায়।' মাইক্রোফোনের পিছনের দাগগুলো দেখাল আনন্দকে। 'তবে তারা খুব চালাক লোক, ফ্রিকোয়েন্সি বদলে ফেলেছে।'

'হয়তো দ্বিতীয় মাইক্রোফোনটাও সরিয়ে ফেলেছে তারা,' বলল আনন্দ।

'না, সরায়নি।'

ওদেরকে নিয়ে আবার আকাশে উঠল কপ্টার। নীচে রাশি রাশি আবর্জনা পাক খাচ্ছে। মাউথপিসটা মুখে চেপে ধরে পাইলটকে রানা বলল, 'নাইরোবিতে বাতিল আর পুরানো লোহা-লক্কড়ের সবচেয়ে বড় স্তূপটা যেন কোথায়? ওদিকে নিয়ে চলুন আমাদের।'

ন'মিনিটের মাথায় আরেকটা অত্যন্ত দুর্বল সিগনাল পেল রানা, উৎস একটা অটোমোবাইল জাঙ্কইয়ার্ড।

জাঙ্কইয়ার্ডের বাইরের রাস্তায় ল্যান্ড করল কপ্টার। আশপাশ থেকে হইহই করে ছুটে এল একদল ছেলেমেয়ে। আনন্দকে নিয়ে জাঙ্কইয়ার্ডে

ঢুকল রানা, গাড়ি আর ট্রাকের মরচে ধরা স্তূপগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে।

'তুই ঠিক জানিস শৈলী এখানে আছে?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'জানি বৈকি। ওকে তাদের মেটাল দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে।'

'কেন?'

'শীল্ড করার জন্যে।' ভাঙাচোরা গাড়ির ভিতর দিয়ে পথ করে নিচ্ছে রানা, মাঝে-মধ্যে থেমে ইলেকট্রনিক বক্সটা পরীক্ষা করছে।

হঠাৎ কেমন যেন ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শুনতে পেল আনন্দ।

একটা মার্সিডিজ বাসের ভিতর থেকে এল আওয়াজটা, বাইরেটা মরচে ধরে লাল হয়ে গেছে। ভাঙা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেল শৈলীকে, বাসের মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়ে রয়েছে। রানাকে দেখে প্রথমে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, তবে একটু পরই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সংকেত দিলঃ 'বন্ধু মানুষ।'

ঘুম-ঘুম ভাব এখনও কাটেনি শৈলীর, তবে আনন্দ তার চুল থেকে টেপ ছিঁড়বার সময় জোর গলায় প্রতিবাদ জানাল।

ভাঙা সুইটা শৈলীর ডান বুকে খুঁজে পেল আনন্দ। ফরসেপ দিয়ে বের করল সেটা। চেঁচিয়ে উঠল, তারপর আলিঙ্গন করল শৈলী। দূর থেকে ভেসে আসা পুলিশ সাইরেনের আওয়াজ শুনল আনন্দ।

'সব ঠিক আছে, শৈলী, সব ঠিক আছে,' বলল সে। তাকে বসিয়ে আরও সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করল। কোথাও কোন সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে না।

তারপর জিজ্ঞেস করল রানাকে, 'দ্বিতীয় মাইক্রোফোনটা কোথায়?'

ঝিক করে উঠল সাদা দাঁত, নিঃশব্দে হাসল রানাঃ 'ও গিলে ফেলেছে।'

শৈলী এখন নিরাপদ, তাই যেন রাগ চেপে রাখবার আর দরকার নেই আনন্দর। 'তুই ওকে জিনিসটা গেলালি? একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র? অন্তত এটুকু বুঝলি না যে অত্যন্ত ডেলিকেট একটা প্রাণী ও, ওর স্বাস্থ্য সব সময় একটা ঝুঁকির মধ্যে—'

'মাথা গরম করবি না,' বলল রানা। 'মনে আছে, কয়েকটা

ভিটামিন দিয়েছিলাম তোকে? একটা তুইও গিলেছিস।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বত্রিশ মিনিট। খুব একটা খারাপ বলা চলে না। নাইরোবি ছাড়ার জন্যে আমাদের হাতে এখনও চল্লিশ মিনিট সময় আছে।'

ছোট আকারের ফকার এম-১৪৪ প্রপ প্লেনটাকে টেনে আনা হয়েছে দৈত্যাকার ৭৪৭ কার্গো জেটের পাশে, যেন একটা শিশুকে তার মা বুকে নিয়ে আদর করবে এখন। বড়টা থেকে ছোটটায় ইকুইমেন্ট স্থানান্তর করবার জন্য দু'দল লোক দুটো র‍্যাম্প ব্যবহার করছে।

৭৪৭ কার্গো জেটে শুধু মাইক্রোফোন আছে বলে নয়, ওদের এখনকার প্রয়োজনের চেয়ে আকারে ওটা অনেক বেশি বড় বলেও ফকার নিয়ে রওনা হচ্ছে ওরা।

শৈলীকে নিয়ে ওরা এয়ারপোর্টে ফিরে আসবার পর সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ফকারে উঠে শৈলীকে আরও ভালভাবে পরীক্ষা করতে গিয়ে আনন্দ দেখল লোমের ভিতর প্রায় সারা শরীরেই আঁচড়ের দাগ রয়েছে, চামড়া উঠে গেছে কয়েক জায়গায়। ছুঁলেই ব্যথা পায় বলে অভিযোগ করছে শৈলী। তবে কোন হাড় ভাঙেনি।

কালো কিছু লোক মালপত্র তুলবার সময় হাসাহাসি করছে, চাপড় মারছে পরস্পরের পিঠে। একটু বিরক্ত মনে হলো শৈলীকে। জানতে চাইল: 'কী নিয়ে এত কৌতুক?' কিন্তু তারা কেউ ওর দিকে খেয়াল দিল না, নিজেদের কাজে ব্যস্ত। ওষুধের প্রভাবে এখনও একটু একটু ঢুলছে শৈলী। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দাঁড়িয়ে থেকে লোডিং সুপারভাইজ করছে রানা আর সিসিলিয়া; প্লেনের পিছনে ওদের কাছে চলে এল আনন্দ। হাসিখুশি এক কালো লোকের সঙ্গে আলাপ করতে দেখা গেল সিসিলিয়াকে। আনন্দর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল সে। লোকটার নাম কয়কয়।

'ওহো, আপনি তা হলে একজন ডক্টর, মিস্টার সেন,' হ্যান্ডশেক করবার সময় বলল কয়কয়। 'সত্যি, দারুণ!'

আনন্দ বুঝতে পারল না ডক্টর হওয়ার মধ্যে দারুণ কী আছে।

কয়কয় যেন নিজের ছোঁয়াচে হাসির দ্বারা নিজেই আক্রান্ত!

'কাভার হিসেবে এইসব ডিগ্রি খুব কাজে লাগে,' বলে চলেছে সে। 'ওস্তাদ শাহ্ ফুয়াদ বদলে গেছেন। দলে একজন ডাক্তার থাকায় এটাকে একটা মেডিকেল মিশন হিসেবে চালাতে কোন সমস্যা নেই। সত্যি দারুণ! তা "মেডিকেল সাপ্লাই" দেখছি না কেন?' একদিকের ভুরু কপালে তুলল সে।

হাসি চেপে সিসিলিয়া বলল, 'আমাদের কাছে কোন মেডিকেল সাপ্লাই নেই।'

'তা হলে ভাষা বদলে সাদাকে সাদা, কালোকে কালোই বলি, ঠিক আছে?' হাসিটা সারাক্ষণ মুখে ঝুলিয়ে রেখেছে কয়কয়। 'আপনি তো আমেরিকান। ওখানে এম-সিক্সটিন তৈরি হয়। খুব ভাল রাইফেল। আমার খুব পছন্দ।'

এদিকে একটা কান ছিল রানার, বলল, 'কয়কয়ের ধারণা আমরা আর্মস্ স্মাগল করছি।'

হেসে উঠল কয়কয়। 'সত্যি করছেন না?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে লেবারদের কাজ দেখতে চলে গেল সে।

রানাকে একান্তে পেয়ে ফিসফিস করে আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ-রে,, তোর বান্ধবীর বোন সিআইএ এজেন্ট নন তো? ঠিক জানিস, উনি কঙ্গোর বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে আর্মস সাপ্লাই দিতে যাচ্ছেন না?'

'সিসিলিয়া সিআইএ নয়,' আশ্বস্ত করল রানা। সমস্ত ইকুইপমেন্ট রিপ্যাকিং করছে ও, কাজ করছে দ্রুত হাত চালিয়ে। 'ওর ব্যবসা আর্মস স্মাগলিঙের চেয়ে অনেক বেশি প্রফিটেবল্।' কাজটায় আনন্দ সাহায্য করতে চাইলে মাথা নাড়ল ও। 'এ আমাকে নিজের হাতে করতে হবে। মাথা পিছু চল্লিশ পাউন্ডে নামিয়ে আনছি।'

'চল্লিশ পাউন্ড? সব মিলিয়ে?'

'কমপিউটার প্রজেকশান তার বেশি অনুমোদন করছে না। কয়কয় ছাড়াও আরও ছয়জন কিকুয়া সহকারী যোগাড় করেছে ফুয়াদ। আমাদের চারজনকে নিয়ে হলো এগারোজন, যোগ শৈলী। সব মিলিয়ে চারশো আশি পাউন্ড।' খাবারের পার্সেল আর প্যাক ওজন করছে রানা।

এ-সব কথা গম্ভীর আর উদ্বিগ্ন করে তুলল আনন্দকে। অভিযানটা

আরও একটা বাঁক নিচ্ছে, ঢুকে পড়ছে আরও কঠিন বিপদের মধ্যে। পিছু হটবার তাৎক্ষণিক ইচ্ছেটায় বাধা দিল ভিডিও স্ক্রিনে দেখা ছবির স্মৃতি

গরিলাসদৃশ প্রাণীটা তাকে টানছে। সম্পূর্ণ নতুন, অচেনা একটা প্রাণী হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। এ-ধরনের আবিষ্কারের জন্য ঝুঁকি নেওয়া যায়। জানালা দিয়ে পোর্টারদের দিকে তাকাল সে: 'ওরা কিকুয়া?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কথা একটু বেশি বললেও, পোর্টার হিসেবে খুব দক্ষ। ভাল কথা–সবাই ওরা পরস্পরের ভাই, কাজেই যা বলবি বুঝে শুনে বলবি।' একটু থেমে আবার বলল, 'আশা করি ফুয়াদ ওদেরকে খুব বেশি কিছু জানাচ্ছে না।'

'কিকুয়াদের?'

'না, এনসিএনএ-কে।'

'এনসিএনএ?'

'হ্যাঁ, চিনারা। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ সম্পর্কে খুব আগ্রহ ওদের,' বলল রানা। 'ফুয়াদকে বুদ্ধি-পরামর্শ দেয়ার বিনিময়ে নিজেরাও নিশ্চয়ই কিছু জেনে নিচ্ছে।' ইঙ্গিতে জানালাটা দেখাল ও, ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে তাকাল আনন্দ। আসলেও তাই, ৭৪৭-এর ছায়ায় দাঁড়িয়ে চারজন চিনার সঙ্গে আলাপ করছে ফুয়াদ।

'নে, ধর,' বলল রানা। 'ওই কোণে সাজিয়ে রাখ এগুলো।' ইঙ্গিতে বড় আকারের তিনটে স্টাইরোফোম কার্টন দেখাল, গায়ে লেখা–স্পোর্ট ডাইভারস্।

'আমরা কি পানির তলায়ও নামব?' আনন্দ বিস্মিত।

কিন্তু তার দিকে রানার খেয়াল নেই। 'জানতে পারলে ভাল হত ওদেরকে আসলে কী বলছে ফুয়াদ,' বলল ও।

খানিক পর জানা গেল, চিনাদের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে ফুয়াদ, বিনিময়ে শুধু টক-ঝাল-মিষ্টি আচার পেয়ে আনন্দে বগল বাজাতে বাজাতে বিদায় নিয়েছে তারা।

নাইরোবি রানওয়ে থেকে ১৪:২৪ ঘণ্টায় আকাশে উঠল ফকার,

ওদের নতুন টাইমলাইন শেডিউলের চেয়ে তিন মিনিট এগিয়ে আছে।

শৈলীকে উদ্ধার করবার পর থেকে পরবর্তী ষোলো ঘণ্টায় ভিআরএমসি এক্সপিডিশান চারটে দেশের সীমান্ত পার হয়ে—কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, রোয়ান্ডা আর জায়ার—৫৬০ মাইল পাড়ি দিল। নাইরোবি থেকে বারাওয়ানা ফরেস্ট-এ পৌঁছাল ওরা, কঙ্গো রেইন ফরেস্টের কিনারায়। ফুয়াদের মতে 'বন্ধুদের সাহায্য' ছাড়া এই জটিল ভ্রমণ সম্ভব হত না। এখানে তার বন্ধুরা হলো তাঞ্জানিয়ায় কর্মরত চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা। এদের সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা নাইরোবি থেকেই করে এসেছে সে।

সেই উনিশশো ষাট সাল থেকে আফ্রিকায় চিনারা তৎপর। কঙ্গোলিজ সিভিল ওঅর প্রভাবিত করবার চেষ্টা চালিয়েছে তারা, কারণ কঙ্গোর কাছে বিক্রি করবার মত বিপুল পরিমাণে ইউরেনিয়াম আছে। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব থেকে আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোকে মুক্ত করা ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তবে পরে আফ্রিকায় তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় জাপান। এরকম পরিস্থিতিতে ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়ামকে পরাজিত করবার ফুযাদের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করল তারা।

ফুয়াদ খালি হাতে কোন কাজে কারও সাহায্য প্রত্যাশা করে না। চিনারা কী পছন্দ করে জানে সে। বন্ধুদের প্রথম দলটাকে টক-ঝাল-মিষ্টি খাইয়ে খুশি করেছিল, দ্বিতীয় দলটার জন্য সুপ বানিয়ে খাবার জন্য সাপের গুঁড়ো, টিনে ভরা বানরের শুকনো মগজ আর ভারতীয় মশলার একটা বস্তা আগে থেকেই যোগাড় করে রেখেছে সে।

এ-সবের বিনিময়ে নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি (চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের কাভার)-র তাঞ্জানিয়ান শাখা ফুয়াদকে পেপারওঅর্ক, ম্যাপ, সংগ্রহ করা কঠিন এমন কিছু ইকুইপমেন্ট আর তথ্য দিয়ে সাহায্য করল। ম্যাপগুলো বিশদ হওয়ায় খুব কাজের জিনিস; জায়ার-এর উত্তর-পুব সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সরেজমিন রিপোর্টও আছে ওটার সঙ্গে, যেহেতু তাঞ্জানিয়ান সেনাবাহিনী ইউগান্ডা আক্রমণ করছে চিনাদের সহযোগিতা নিয়ে।

চিনারা ফুয়াদকে জানাল জঙ্গলের ভিতর নদীতে এখন বন্যা শুরু হয়েছে। তারা বুদ্ধি দিল, নদী পেরুবার জন্য বেলুন ব্যবহার করাটাই সবদিক থেকে নিরাপদ।

তবে এই বুদ্ধি ফুয়াদ গ্রহণ করেনি। তার নিজস্ব একটা প্ল্যান আছে, সেই প্ল্যানের বৈশিষ্ট্য হলো কোন নদী না পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো। কিন্তু কীভাবে, চিনাদের কল্পনায় তা ধরা পড়ল না।

১৬ জুন রাত দশটায় রোয়ান্ডা-র রাজধানী কিগালি-র বাইরে রওয়ামাগেনা এয়ারপোর্টে রিফুয়েলিং-এর জন্য থামল ফকার। একটা ক্লিপবোর্ড আর ফর্ম নিয়ে লোকাল ট্র্যাফিক কন্ট্রোল অফিসার প্লেনে উঠলেন, জানতে চাইলেন ওদের পরবর্তী গন্তব্য।

ফুয়াদ নির্বিকারচিত্তে জবাব দিল, 'রওয়ামাগেনা এয়ারপোর্ট।' অর্থাৎ সে বলতে চাইছে—প্লেন একটা লূপ তৈরি করবে, তারপর যে পথ ধরে এসেছে সেই পথ ধরেই ফিরে যাবে।

আনন্দ ভুরু কোঁচকাল। 'কিন্তু কথা ছিল আমরা এমন জায়গায় ল্যান্ড করব, যেখান থেকে—'

'শ্-শ্-শ্,' বলল রানা, মাথা নাড়ছে। 'ওকে ওর কাজ করতে দাও।'

দেখা গেল ট্র্যাফিক অফিসার এই ফ্লাইট প্ল্যানে সন্তুষ্ট। ক্লিপবোর্ডে পাইলটের সই নিয়ে প্লেন থেকে নেমে গেলেন তিনি।

রানা ব্যাখ্যা করল, পুরোটা প্ল্যান ফাইল করে না এমন প্লেন দেখতে রোয়ান্ডার ফ্লাইট কন্ট্রোলাররা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। 'ট্র্যাফিক অফিসার শুধু জানতে চায় প্লেনটা কখন তার ফিল্ডে ফিরে আসবে। বাকিটা সম্পর্কে তার কোন আগ্রহ নেই।'

রওয়ামাগেনা এয়ারপোর্ট ঘুমকাতুরে; পেট্রল ভরবার জন্য দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো ওদেরকে। অথচ রানার মধ্যে কোন রকম অস্থিরতা নেই, সিসিলিয়ার সঙ্গে খোশগল্পে মেতে আছে। আর ফুয়াদ ঝিমাচ্ছে, সময়ের অপচয় নিয়ে তারও কোন উদ্বেগ নেই।

'টাইমলাইনের কী হবে?' জানতে চাইল আনন্দ।

'ওটা কোন সমস্যা নয়,' বলল রানা। 'এমনিতেও আমরা

ঘণ্টাতিনেকের আগে রওনা হতে পারব না। মুকেনকোর ওপর আলো দরকার হবে আমাদের।'

'এয়ারফিল্ডটা কি ওখানেই?' জানতে চাইল আনন্দ।

'যদি সেটাকে এয়ারফিল্ড বলা যায়,' বলল ফুয়াদ, তারপর সাফারি হ্যাট দিয়ে চোখ ঢেকে আবার ঝিমাতে শুরু করল।

উদ্বিগ্ন আনন্দকে কাছে ডেকে সিসিলিয়া ব্যাখ্যা করল, শহর থেকে দূরে বেশিরভাগ আফ্রিকান এয়ারপোর্টই জঙ্গল কেটে তৈরি করা এক ফালি ফাঁকা জায়গা মাত্র। পাইলটরা রাতের বেলা বা কুয়াশা ঢাকা সকালে ল্যান্ড করতে পারে না, কারণ মাঠে প্রায়ই জন্তু-জানোয়ার চরে বেড়ায়, কিংবা যাযাবররা তাঁবু গাড়ে, অথবা আগে নামা অন্য একটা প্লেন টেক-অফ করতে না পেরে পড়ে থাকে। 'তাই আমাদের আলো চাই,' সবশেষে বলল সিসিলিয়া। 'সেজন্যেই এখানে অপেক্ষা করা হচ্ছে। চিন্তা করবেন না, এ-সব হিসেবের মধ্যে ধরা আছে।'

সিসিলিয়ার ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে শৈলী কেমন আছে দেখতে চলে গেল আনন্দ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানাকে সিসিলিয়া জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মনে হচ্ছে না, মিস্টার সেনকে আমাদের বলা দরকার?'

'কেন?'

'হয়তো শৈলীকে নিয়ে সমস্যা আছে।'

'শৈলীকে আমি সামলাব,' হ্যাটের ভিতর থেকে বলল ফুয়াদ।

'জানতে পারলে মিস্টার সেন নার্ভাস হয়ে পড়বেন।'

'হ্যাঁ, আপসেট তিনি হবেন,' বলল ফুয়াদ। 'কিন্তু বাধ্য না হলে সময়ের আগে তাকে আপসেট করার কোন মানে হয় না। আফটার অল, এই জাম্পটার গুরুত্ব কতখানি?'

'চব্বিশ ঘণ্টা, কম করেও,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা বিপজ্জনক, কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন একটা টাইমলাইন পেয়ে যাব আমরা। ওদেরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হবে।'

'এরপর আর কথা চলে না,' বলল ফুয়াদ। 'আসুন, সবাই একটু ঝিমিয়ে নিই।'

আট

রওয়ামাগেনা থেকে রওনা হওয়ার পাঁচ ঘণ্টা পর প্রাকৃতিক দৃশ্য বদলে গেল। জায়ার সীমান্তের কাছে গোমা-কে পাশ কাটাতেই দেখা গেল কঙ্গো রেইন ফরেস্টের পুবপ্রান্তের সর্বশেষ ফালিটার উপর দিয়ে উড়ছে ওদের ফকার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল সিসিলিয়া।

সকালের ম্লান আলোয় গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝুলে রয়েছে সাদা ধোঁয়ার মত কিছু কুয়াশা। হঠাৎ করে সাপের মত আঁকাবাঁকা একেকটা নদী বা লালচে মাটির রাস্তা পিছিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। তবে বেশিরভাগটাই গভীর বনভূমির অবিচ্ছিন্ন বিস্তার, যতদূর দৃষ্টি চলে।

দৃশ্যটা অবশ্যই একঘেয়ে, আবার ভীতিকরও। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত প্লেনের আরামদায়ক সিটে বসেও এটা উপলব্ধি না করাটা অসম্ভব যে এই গহীন বনভূমি প্রকৃতির এমন একটা বিশাল সৃষ্টি, আকারের দিক থেকে মানুষের তৈরি যে-কোন মহানগরকেও নগণ্য বলে মনে হবে!

একেকটা গাছের কাণ্ড এখানে ডায়ামিটারে চল্লিশ ফুট, খাড়া উপরে উঠেছে প্রায় দুশো ফুট, ছড়ানো ডাল-পালার নীচে একটা গথিক ক্যাথেড্রাল তৈরি করা যাবে অনায়াসে। সিসিলিয়া জানে, এই বনভূমি পশ্চিম দিকে প্রায় দু'হাজার মাইল এগিয়েছে, থেমেছে আটলান্টিকের কিনারায়, জায়ারর পশ্চিম উপকূলে।

প্রথমবার জঙ্গল দেখে শৈলীর কী প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ করছে আনন্দ। জঙ্গল ওর ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট। জানালার বাইরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ও। আবেগ বর্জিত ভঙ্গিতে সংকেত দিলঃ 'আমার জঙ্গল।'

আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'শৈলী জঙ্গল পছন্দ করে?'

'এখানে জঙ্গল আছে,' জানাল শৈলী। 'এটা জঙ্গল।'

আনন্দ নাছোড়বান্দা। তার বিশ্বাস, জঙ্গল দেখে শৈলীর আবেগ উথলে না উঠে পারে না। 'শৈলী জঙ্গল পছন্দ করে?'

'এটা জঙ্গল। জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। শৈলী জঙ্গল দেখছে।'

অন্য এক কায়দা ধরল আনন্দ। 'এই জঙ্গলে শৈলী বাস করেছে?'

'না।' নির্বিকারচিত্তে।

'শৈলী কোথায় বাস করত?'

'শৈলী বাস করত শৈলীর বাড়িতে।' নিউ ইয়র্কের ল্যাব আর ট্রেইলার-এর কথা বলছে ও।

আনন্দ দেখল, সিট বেল্ট ঢিলে করে চিবুকটা হাতের তালুতে রাখল শৈলী, অলসভাবে তাকিয়ে থাকল জানালা দিয়ে। তারপর জানাল, 'শৈলী সিগারেট চায়।'

ফুয়াদকে চুরুট ফুঁকতে দেখেছে সে।

'পরে,' বলল আনন্দ।

সকাল সাতটায় মাশাই-এর টিন আর ট্যানটানাম মাইনিং কমপ্লেক্সের ধাতব ছাদের উপর দিয়ে উড়ে এল ফকার। রানার পিছু নিয়ে ফুয়াদ, কয়কয় আর অন্যান্য পোর্টাররা প্লেনের পিছন দিকে চলে গেল; ওখানে তারা ইকুইপমেন্ট নিয়ে কাজ শুরু করল। সোয়াহিলি ভাষায় উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে পোর্টাররা।

ওদেরকে যেতে দেখে শৈলী মন্তব্য করল: 'ওরা উদ্বিগ্ন।'

'কী নিয়ে উদ্বিগ্ন, শৈলী?'

'উদ্বিগ্ন…সমস্যায় উদ্বিগ্ন।'

খানিক পর প্লেনের পিছন দিকে এসে আনন্দ দেখল ফুয়াদের লোকজন খড়ের স্তূপে অর্ধেক ডুবে আছে। টর্পেডো আকৃতির সুতি কাপড়ের তৈরি ব্যাগে ইকুইপমেন্ট ভরছে তারা, ইকুইপমেন্টের চারপাশে গাদা-গাদা খড় গুঁজছে। ওগুলোর দিকে হাত তুলে আনন্দ জানতে চাইল, 'কী ওগুলো?'

'ওগুলোকে ক্রসলিন কন্টেইনার বলে,' জানাল ফুয়াদ। 'খুবই

কাজের জিনিস।'

'আমি এভাবে কখনও ইকুইপমেন্ট প্যাক করতে দেখিনি,' বলল আনন্দ, সবার হাতের কাজ দেখছে। 'আমাদের সাপ্লাই এত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করতে চাওয়ার কারণ কী?'

'কারণ সাবধানের মার নেই,' বলল ফুয়াদ। প্লেনের সামনের দিকে রওনা হলো সে। ককপিটে ঢুকে পাইলটের সঙ্গে আলাপ করবে। তার আগে রানাও ওখানে ঢুকেছে।

শৈলী সংকেত দিল, 'চুরুটঅলা আনন্দকে মিথ্যে বলল।' চুরুট খেতে দেখে ফুয়াদের এই নামকরণ করেছে ও।

ওর কথায় আনন্দ গুরুত্ব দিল না। কয়কয়ের দিকে ফিরল সে। 'এয়ারফিল্ড আর কতদূরে?'

চোখ তুলে তাকাল কয়কয়। 'এয়ারফিল্ড?'

'মুকেনকোয়।'

কথা না বলে চিন্তা করছে কয়কয়। তারপর সরু এক চিলতে হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'দু'ঘণ্টা,' বলল সে। হঠাৎ খিক-খিক করে হেসে ফেলল। সোয়াহিলি ভাষায় কিছু বলতে তার সব ভাইরাও গলা ছেড়ে হাসতে শুরু করল।

'এত হাসির কী হলো?'

'ভাই ডাক্তার,' আনন্দর পিঠে চাপড় মেরে বলল কয়কয়, 'আপনি তো আপাদমস্তক শুধু হাস্যরসই ধারণ করে আছেন।'

প্লেন কাত হলো, ধীরেসুস্থে বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করছে। কয়কয় আর তার ভাইরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। দেখাদেখি আনন্দও।

বিরতিহীন বনভূমিই শুধু দেখতে পাচ্ছে সে। তারপর একেবারে চমকে দিয়ে চোখের সামনে হাজির হলো সবুজ জীপ গাড়ির একটা দীর্ঘ সারি, অনেক নীচের মেটোপথ ধরে ছুটছে। দেখে একটা মিলিটারি ফরমেশন বলে মনে হলো। 'পাকুড় মোয়ানা।' নামটা কয়েকবার উচ্চারিত হতে শুনল সে।

'কী ব্যাপার বলো তো?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ। 'ওটা কী জেনারেল পাকুড় মোয়ানার কলাম?'

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল কয়কয়। 'আরে, না! ওই ব্যাটা পাইলট একদম কাঁচা। মিস্টার ফুয়াদকে আগেই আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। ব্যাটা পথ হারিয়ে ফেলেছে।'

'পথ হারিয়েছে?' চিন্তাটা আনন্দর বুকে ভয় ধরিয়ে দিল।

হেসে উঠল কয়কয়: 'আপনাদের লিডার ভুলটা আগেই ধরতে পেরেছেন। সম্ভবত পাইলটের কান মলে সংশোধন করাচ্ছেন এখন।'

প্লেন ঘুরে পুব দিকে রওনা হলো, সমতল বনভূমি পিছনে ফেলে গাছপালা ঢাকা ঢাল-এর উপর দিয়ে। সামনে ঢেউ খেলানো পাহাড় শ্রেণী।

কয়কয়ের ভাইরা আনন্দ-উত্তেজনায় মুখর হয়ে উঠল।

এরপর ককপিট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল রানাকে। আইল ধরে দ্রুত হেঁটে এল ও, ওর পিছু নিয়ে ফুয়াদ আর সিসিলিয়াও।

তিনজনই ওরা কার্ডবোর্ডের বাক্স খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, ভিতর থেকে মেটাল ফয়েলে মোড়া বাস্কেটবল আকারের গোল কী সব বের করছে।

'কী ওগুলো?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

এই সময় প্রথম বিস্ফোরণটা শোনা গেল। বিষম এক ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল ফকার।

ছুটে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আনন্দ। সাদা ধোঁয়ার তৈরি সরল একটা সরু রেখা দেখতে পেল, শেষ মাথাটা বিস্ফোরিত হয়ে কালো ধোঁয়ার বিরাট মেঘে পরিণত হলো। কাত হচ্ছে ফকার, ঘুরে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে। নীচের সবুজ বনভূমি থেকে সাদা আরেকটা রেখাকে আকাশে উঠে আসতে দেখা গেল।

ওটা একটা মিসাইল, উপলব্ধি করল আনন্দ। একটা গাইডেড মিসাইল।

'ফুয়াদ!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

'রেডি, সার!' পাল্টা চিৎকার ছাড়ল ফুয়াদ।

লাল কী যেন একটা বিস্ফোরিত হলো, আনন্দর জানালার সামনের দৃশ্য ঘন ধোঁয়ায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল। বিস্ফোরণের কারণে কেঁপে

উঠেছে প্লেন, তবে বাঁক ঘোরা বন্ধ হয়নি। সব বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করতে পারছে না আনন্দ: কারা যেন ওদেরকে টার্গেট করে মিসাইল ছুঁড়ছে।

'রেইডার!' আবার চেঁচাল রানা। 'নট অপটিকাল! রেইডার!' রুপালি বাস্কেটবলগুলো হাতে নিয়ে আইল ধরে পিছু হটল ফুয়াদ, প্লেনের পিছনের দরজা খুলতে কয়কয়কে সাহায্য করছে সিসিলিয়া। তীব্র বাতাস চাবুকের মত আঘাত করছে চোখে-মুখে।

'কী ব্যাপার, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!' অসহায় আর দলছুট লাগছে আনন্দকে।

'চিন্তা করবি না,' কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে বলল রানা। 'সময়টা আমরা পুষিয়ে নেব।'

হু-উ-উ-স করে জোরাল একটা আওয়াজ শুরু হলো, শেষ হলো আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রায় খাড়াভাবে উপরে উঠছে প্লেন, মোড়ক খুলে বাস্কেটবলগুলো এক এক করে খোলা আকাশে ফেলে দিচ্ছে ফুয়াদ আর সিসিলিয়া

ইঞ্জিন গজরাচ্ছে, দক্ষিণ দিকে আট মাইল সরে এসেছে ফকার। বারো হাজার ফুট উপর থেকে জঙ্গলের উপর চক্কর দিতে শুরু করল পাইলট। প্রতিবার ঘুরবার সময় শূন্যে কয়েল স্ট্রিপ ঝুলে থাকতে দেখছে আনন্দ, ধাতব মেঘের মত চকচক করছে।

বিস্ফোরণের আওয়াজ আর শক ওয়েভ শৈলীর স্নায়ুর জন্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। নিজের সিটে বসে আগুপিছু দুলছে সে, নরম সুরে গোঙাচ্ছে।

'ওগুলোকে বলে চাফ,' আনন্দকে বলল রানা, কমপিউটার কনসোলের সামনে বসে কী বোর্ডে আঙুল চালাচ্ছে। 'রেইডারের উইপন সিস্টেমকে কনফিউজ করে দেয়। ওদের রেইডার-গাইডেড স্যাম মিসাইলগুলো আমাদেরকে এখন ওই ধোঁয়ার ভেতর খুঁজবে।'

আনন্দর মনে হলো, রানা একটা স্বপ্নের ভিতর ধীর লয়ে উচ্চারণ করে কথাগুলো বলল। এ-সব কথার অর্থ যেন তার জানা নেই। 'কিন্তু কে আমাদেরকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়বে?'

'সম্ভবত জায়ার আর্মি।'

'জায়ার আর্মি? কেন?'

'ভুল করে,' জবাব দিল রানা, মুখ না তুলে এখনও বোতাম টিপছে।

'ভুল করে মানে? একের পর এক সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল ছুঁড়ে আমাদেরকে মেরে ফেলতে চাইছে, অথচ তুই বলছিস ভুল করে? তা হলে ডেকে বলছিস না কেন যে তোমরা ভুল করছ?'

'বলা সম্ভব নয়,' বলল রানা।

'কেন?'

'কারণ,' এবার জবাব দিল ফুয়াদ, 'রওয়ামাগেনায় আমরা একটা ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করতে চাইনি। এর মানে হলো, টেকনিক্যালি আমরা জায়ার এয়ারস্পেসে অনধিকার প্রবেশ করেছি।'

'দুর্গতিনাশিনী, মাগো, রক্ষে করো!' বিড়বিড় করল আনন্দ।

রানা কথা না বলে কমপিউটার কনসোলে কাজ করে যাচ্ছে, চেষ্টা করছে স্ক্রিন থেকে অবাঞ্ছিত রেখা আর দাগ সরাতে।

'আমি যখন এই অভিযানে যোগ দিতে রাজি হই,' বলল আনন্দ, কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে চড়ছে, 'তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে পড়ে যাব।'

'তা আমরা কেউই ভাবিনি,' বলল রানা। 'দেখা যাচ্ছে, আমরা যতটা চেয়েছি পাচ্ছি তারচেয়ে বেশি।'

আনন্দ কিছু বলবার আগে সিসিলিয়া তার কাঁধে একটা হাত তুলে দিয়ে একপাশে টেনে নিয়ে এল। 'ঘাবড়াবার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে,' নরম সুরে বলল সে। 'ওগুলো ষাট দশকের স্যাম–প্রায় নষ্টই বলা যায়। বিশ্বাস করুন, ওগুলো আমাদের জন্যে কোন বিপদ নয়। আপনি শুধু শৈলীর ওপর খেয়াল রাখুন। আপনার সাহায্য দরকার ওর। এদিকটা আমরা তিনজন সামলাই। ঠিক আছে?'

প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল রানা। চাফ-এর তৈরি মেঘ থেকে আট মাইল দূরে চক্কর দিচ্ছে ফকার, এই ফাঁকে দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে।

ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়াম একেবারে সেই প্রথম থেকেই ওদের

কিন্তু ফুয়াদ বলছে, নষ্ট হওয়া সময় এখনও পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব।

কীভাবে?

মাথায় যেটা প্রথমে এল সেটাই বলল ফুয়াদ। 'আমরা রাগোরা ধরে এগোব। অত্যন্ত খরস্রোতা নদী।'

মাথা ঝাঁকালেও, বিড়বিড় করল রানা, 'রাগোরা অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

'সেটা দেখতে হবে,' বলল ফুয়াদ, তবে জানে রানার কথাই ঠিক। রাগোরা অত্যন্ত বিপজ্জনক, বিশেষ করে জুন মাসে সে তার কণ্ঠস্বর নিচু রাখল। 'সিসিলিয়া ম্যাডামের কাছে যা শুনলাম, আফ্রিকা আপনার হাতের উল্টোপিঠ। এখন আপনি যদি ভেবেচিন্তে সাহস করেন, তা হলেই হয়।'

রানা চিন্তা করছে।

এক মিনিট পর আবার ফিসফিস করল ফুয়াদ। 'সবাইকে তা হলে জানাই, সার?'

'জানাও,' বলল রানা। দূরে আরেকটা রকেট বিস্ফোরিত হতে শুনল ওরা। 'চলো এখান থেকে কেটে পড়ি।'

দ্রুত প্লেনের পিছন দিকে চলে এসে কয়কয়কে ফুয়াদ বলল, 'ওদেরকে তৈরি হতে বলো।'

'ইয়েস, বস্।' মাথা ঝাঁকাল কয়কয়। হুইস্কির একটা বোতল হাত বদল হলো, পুরুষরা সবাই এক ঢোক করে খাচ্ছে।

'জানতে পারি কী হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'তৈরি হচ্ছে ওরা,' বলল ফুয়াদ।

'কীসের জন্যে তৈরি হচ্ছে?'

এই সময় সিসিলিয়াকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, মুখটা গম্ভীর। 'এখান থেকে আমরা পায়ে হেঁটে এগোব, মিস্টার সেন।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল আনন্দ। 'এয়ারফিল্ড কোথায়?'

'নেই,' বলল সিসিলিয়া।

'কী বলতে চান?'

'এদিকে কোন এয়ারফিল্ড নেই।'

'তার মানে কি কোন মাঠে নামবে প্লেন?' আনন্দ কিছুই বুঝতে

পারছে না।

'না,' বলল সিসিলিয়া। 'প্লেন আসলে কোথাও নামবে না।'

'তা হলে আমরা হাঁটব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ। আর সেই মুহূর্তে তার তলপেট মোচড় খেল। কারণ হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে সে।

'শৈলী ভাল থাকবে,' কণ্ঠস্বরে আশ্বাস আর হাসি ঝরিয়ে বলল রানা, আনন্দর বুকের চারধারে আঁটসাঁট করে স্ট্র্যাপ বাঁধছে। 'ওকে একটা থোরালেন ট্র্যাঙ্কুইলাইজার ইঞ্জেকশান দেব। দেখবি একদম শান্ত হয়ে থাকবে ও। বাকিটা ফুয়াদের ওপর ছেড়ে দিবি। সে ওকে শক্ত করে ধরে রাখবে।'

'ফুয়াদ শক্ত করে ধরে রাখবেন?' আনন্দ বিমূঢ়। 'মানে?'

'শৈলী ছোট তো, অভ্যস্তও নয়, হারনেস ঠিকমত পরানো যাবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'ফুয়াদ ওকে কোলে নিয়ে নামবে।'

ঘোঁৎঘোঁৎ আওয়াজ ছেড়ে রানার কাঁধে চাপড় মারল শৈলী। এটা ওর উৎসাহ দেখানোর ভঙ্গি। দু'হাত দিয়ে ধরে মেঝেতে তাকে বসিয়ে দিল রানা।

শৈলী সংকেত দিল, 'আমার ভাল বন্ধু।'

'কথাগুলো মন দিয়ে শোন্,' বলল রানা। 'প্যারাফয়েল আপনা-আপনি খুলবে। দেখবি তোর দু'হাতেই লাইন রয়েছে। বাঁয়ে যেতে চাইলে ওদিকের লাইন টানবি, ডানে যেতে চাইলে সেদিকের। আর–'

'ওর কী হবে?' শৈলীর দিকে হাত তুলে জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'বললাম না, ওকে ফুয়াদ দেখবে। আমার কথায় মন দে। যদি কোন ত্রুটি দেখা দেয় বা বিপদ ঘটে, রিজার্ভ শুট এখানে–তোর বুকে। চিন্তার কিছু নেই, গোটা ব্যাপারটা অটোমেটিক।'

ঘামে গোসল হয়ে যাচ্ছে আনন্দ। 'আর ল্যান্ডিং?'

'সেটা কোনও ব্যাপারই নয়,' হাসল রানা। 'তুই ল্যান্ডও করবি অটোমেটিক্যালি। পেশি ঢিল দিয়ে রাখবি, ধাক্কাটা নিবি পায়ে। পাঁচ ফুট ওপর থেকে লাফ দিলে যেমন ঝাঁকি লাগে, এটাতেও সেরকম লাগবে। এরকম লাফ তুই অন্তত এক হাজারবার দিয়েছিস।'

ঘাড় ফেরাতেই খোলা দরজা দেখতে পেল আনন্দ, চোখ-ধাঁধানো রোদ ঢুকছে প্লেনের ভিতর। বাতাস গজরাচ্ছে আর চাবুক কষছে। কয়কয়ের লোকগুলো হাসতে হাসতে একের পর এক লাফ দিল। সিসিলিয়ার দিকে তাকাল সে। উত্তেজিত, নীচের ঠোঁট একটু একটু কাঁপছে, তবে আতঙ্কিত নয় মোটেও। 'মিস সিসিলিয়া, আপনি–'

আনন্দর কথা শেষ হলো না, লাফ দিয়ে রোদের মধ্যে হারিয়ে গেল সিসিলিয়া।

রানা বলল, 'এরপর তুই।'

'আমি আগে কখনও জাম্প করিনি,' বলল আনন্দ।

'তা হলে তো আরও ভাল। ভয় লাগবে না।'

'বললেই হলো! ভয়ে আমি অসুস্থ বোধ করছি!'

'দাঁড়া, তোর ভয় আমি দূর করে দিচ্ছি,' বলে আনন্দকে ধাক্কা দিয়ে প্লেন থেকে ফেলে দিল রানা।

আনন্দর নাড়িভুঁড়ি সব গলায় উঠে এল। কানের পাশে বাতাস গর্জন করছে, টান দিচ্ছে চুল ধরে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, অথচ প্যারাফয়েল খুলছে না।

তারপর একটা ঝাঁকি খেল শরীর। আনন্দ ভাবল মাটিতে পড়ে গেছে সে। কিন্তু চোখ মেলে দেখল সবুজ বনভূমি এখনও অনেক নীচে। তারপর উপর দিকে তাকিয়ে সদ্য খোলা প্যারাফয়েলটা দেখতে পেল।

কিকুয়াদের এক-এক করে মাটিতে নামতে দেখল আনন্দ। এরপর তার পালা।

আশ্চর্য হলেও সত্যি, আনন্দর মাটিতে নামা হলো না, অন্তত সরাসরি নয়। তার প্যারাফয়েল একটা গাছে আটকে গেছে। মাটি থেকে তিন হাত উপরে ঝুলছে সে।

হারনেস বাকল্ হাতড়াচ্ছে আনন্দ, সিসিলিয়া আর কয়কয় ছুটে এসে জানতে চাইল কোথাও লেগেছে কি না।

'কোথাও একটুও লাগেনি,' বলল আনন্দ 'আমার শৈলীর কী খবর তাই বলুন।' বাকল্ খুলে মাটিতে পা দিল সে। পরমুহূর্তে পড়ে

গেল, কারণ পা দুটোয় কোন সাড় নেই, যেন রাবার হয়ে গেছে। শুয়ে শুয়েই খানিকটা বমি করল।

কয়কয় হেসে উঠে বলল, 'কঙ্গোতে স্বাগতম।'

ঠোঁট আর চিবুক মুছে সিধে হলো আনন্দ। 'শৈলী কোথায়?'

এক মুহূর্ত পর ল্যান্ড করল ফুয়াদ। ভয় পেয়ে শৈলী তার কান কামড়ে দিয়েছে, রক্ত ঝরছে ক্ষতটা থেকে। তবে প্রিয় বন্ধুর দুর্দশা অনুধাবন করতে পেরে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলে গেল শৈলী। দ্রুত ছুটে এসে পরীক্ষা করল আনন্দকে, কোথাও কোন হাড়-গোড় ভেঙেছে কিনা দেখছে, সেই সঙ্গে সংকেত দিচ্ছে, 'ওড়াউড়ি শৈলী পছন্দ করে না।'

রানা নামল সবার শেষে।

'সাবধান! ওপরে তাকাও!'

টর্পেডো আকৃতির প্যাকেটগুলোর প্রথমটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। পড়েই বিস্ফোরিত হলো, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ইকুইপমেন্ট আর খড়।

'ওই আরেকটা নামছে!'

সিসিলিয়া আর আনন্দ আত্মরক্ষার জন্য একই দিকে ডাইভ দিল। কুঁই-কুঁই করে রানার পাশে শুয়ে পড়ল শৈলী। অক্ষত কানটা হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল ফুয়াদ। 'খবরদার!' শৈলিকে চোখ রাঙাল সে। পরমুহূর্তে ওদের পাশে এসে পড়ল দ্বিতীয় প্যাকেট। ভিতরে চাল ছিল, ঝাঁক ঝাঁক খুদে বর্শার মত বিঁধল এসে গায়ে।

সিসিলিয়া চিৎকার করে বলল, 'সাবধান, পরের দুটোয় লেযার আছে!'

হঠাৎ শুরু হয়ে দ্রুতই শেষ হলো ব্যাপারটা। মাথার উপর থেকে আরেকদিকে উড়ে গেল ফকার। আকাশ এখন খালি আর নিস্তব্ধ। লোকজন প্যারাফয়েল মাটিতে পুঁতে ফেলল, তারপর ইকুইপমেন্টগুলো নতুন করে প্যাকেট করল। গোটা ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করল ফুয়াদ, সোয়াহিলি ভাষায় ধমক-ধামক দিচ্ছে।

বিশ মিনিট পর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এক লাইনে রওনা হলো

ওরা–এটা দুশো মাইল ট্রেক-এর সূচনা, ওদেরকে পৌঁছে দেবে কঙ্গোর পুবপ্রান্তে, যেখানে সভ্য মানুষের পা প্রায় পড়েনি বললেই চলে।

ওখানে ওদের সবার জন্য রাখা আছে বিপুল ঐশ্বর্য।

এখন শুধু ওরা যদি সময় মত পৌঁছাতে পারে।

বারাওয়ানা ফরেস্ট ধরে হাঁটাটা উপভোগ করছে সবাই। গাছে গাছে বাঁদরামি করছে বানররা, ঠাণ্ডা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে পাখিদের কল-কাকলি।

কিকুয়া পোর্টাররা লাইনের মাঝখানে থাকছে। সিগারেট ফুঁকছে তারা, সারাক্ষণ কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে। লাইনের মাথায় রয়েছে ফুয়াদ, পাশে কয়কয়। সবার পিছনে রানা আর সিসিলিয়া। শৈলীকে নিয়ে কখনও ফুয়াদের পিছনে থাকছে আনন্দ, আবার কখনও পিছিয়ে রানার কাছে চলে আসছে। জাম্প-এর ধকলটা কাটিয়ে উঠবার পর এখন সে অভিযানটা উপভোগ করছে বলে মনে হলো।

'ভাল বন্ধু বলে প্রশংসা করবার ছলে মাঝেমধ্যে রানার পিঠে চড়বার সুযোগ করে নিচ্ছে শৈলী।

ফুয়াদ এক সময় আনন্দকে বলল, 'জঙ্গলটা উপভোগ করে নিন, ডক্টর সেন। সামনে এরকম শুকনো আর ঠাণ্ডা পরিবেশ পাবেন না।'

আনন্দ সায় দিয়ে জানাল, 'জঙ্গলটা সত্যি ভাল।'

'হ্যাঁ, খুবই ভাল।' মাথা ঝাঁকাল ফুয়াদ, তার চেহারায় অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে আছে।

বারাওয়ানা বনভূমি নির্দোষ কুমারী নয়। কিছু সময় পর পর পরিচ্ছন্ন মাঠ, মানববসতির অন্যান্য আলামত চোখে পড়ল। তবে কোন কৃষককে ওরা দেখল না।

মানুষজন নেই কেন? আনন্দর এই প্রশ্নের উত্তরে ফুয়াদ শুধু মাথা নাড়ল। জঙ্গলের যত ভিতরে ঢুকছে ওরা, ততই যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে উঠছে ফুয়াদ, কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। মাঝে-মধ্যে থামছে সে, গভীর মনোযোগ দিয়ে পাখির ডাক শুনছে, তারপর তার দলকে অনুমতি দিচ্ছে সামনে এগোবার।

বেলা বারোটায় পিছিয়ে এসে রানাকে জিজ্ঞেস করল আনন্দ, 'লাঞ্চের জন্যে থামবি না?'

সে তো বটেই. কিকুয়া পোর্টাররাও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেক আগেই থেমে গেছে তাদের হইচই আর হাসি-তামাশা।

'ফুয়াদকে জিজ্ঞেস কর্,' জবাব দিল রানা।

লাইনের সামনে আসতে হলো আনন্দকে। তার প্রশ্ন শুনে কথা না বলে ফুয়াদ এবারও শুধু মাথা নাড়ল।

বেলা একটার খানিক পর হেলিকপ্টারের ভট-ভট আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। ফুয়াদ আর পোর্টারদের রিফ্লেক্স দেখবার মতই, প্রায় চোখের পলকে ডাইভ দিয়ে বড় একটা গাছের তলায় আড়াল নিল তারা। দেখাদেখি শৈলীকে নিয়ে আনন্দও। শুধু রানা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল, সিসিলিয়ার একটা হাত ধরেছে। ওদের মাথার উপর গাছের ডালপালা থাকায় ভাল আড়াল পাচ্ছে।

মাত্র পাঁচ-ছয় সেকেন্ড পরই বিরাট আকারের দুটো সবুজ হেলিকপ্টার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। সাদা স্টেনসিল পরিষ্কার পড়তে পারল রানা—জায়ার আর্মি।

চোখ কুঁচকে অদৃশ্যমান কপ্টার দুটোর দিকে তাকিয়ে থেকে ফুয়াদ বলল, 'জায়ার আর্মি কিগানিদের খুঁজতে বেরিয়েছে।'

এক ঘণ্টা পর একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছল ওরা, খেতে কিছু ভুট্টা ফলানো হয়েছে। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে আনাড়ি হাতে তৈরি একটা বেঢপ ফার্মহাউস দেখা যাচ্ছে। চিমনি থেকে হালকা নীল ধোঁয়া বেরুচ্ছে, বাতাসে মাংস পুড়বার গন্ধ। অল্প বাতাসে দোল খাচ্ছে রোদে শুকাতে দেওয়া কিছু কাপড়চোপড়। তবে লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

এর আগে ফাঁকা জায়গা বা বসতি দেখা গেলে সেটাকে পাশ কাটিয়ে এসেছে ওরা। কিন্তু এবার হাত তুলে সবাইকে থামাল ফুয়াদ। পোর্টাররা মাথার বোঝা নামিয়ে ঘাসের উপর বসল, কেউ কথা বলছে

এরপর রানা ট্র্যান্সমিটার বক্স আটকাল, প্লাগ ঢোকাল ক্রাইলন-ক্যাডমিয়াম ফুয়েল সেলে। সবশেষে অ্যান্টি-জ্যামিং মডিউল আর তিন ইঞ্চি ভিডিও স্ক্রিন ও ছোট্ট কী বোর্ড বিশিষ্ট মিনিয়েচার কমপিউটার টার্মিনালের সংযোগ দিল।

সূর্য পাটে বসেছে, কোড কোঅর্ডিনেটস্ পাঞ্চ করে মোরুতি আর ওয়াশিংটনের ট্র্যান্সমিশন লক করল রানা, সিগনাল স্ট্রেংথ চেক করল, তারপর ট্র্যান্সপন্ডারগুলোকে অ্যাডজাস্ট করবার জন্য সময় দিল ছয় মিনিট। কিন্তু ছোট্ট স্ক্রিনে অবাঞ্ছিত রেখা আর দাগ ছাড়া কিছু ফুটছে না। অর্থাৎ ওর ওয়াশিংটন ট্র্যান্সমিশন জ্যাম করছে কেউ।

ফ্রিকোয়েন্সি বদলে ওয়াশিংটনের বদলে ওর নিজের এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে বহুরঙা, ঝকঝকে একটা ম্যাপ ফুটল স্ক্রিনে–কঙ্গোর যে জায়গাটায় এই মুহূর্তে রয়েছে ওরা। অর্থাৎ রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি ঈগলস্যাটের কাছ থেকে পাওয়া ম্যাপ রিসিভ করছে।

দ্রুত টাইপ করে অপারেটরকে রানা প্রশ্ন করল, 'কঙ্গো ফিল্ড পার্টি টু-এর জন্যে কোন খবর আছে?' ভাল কিছু শুনবার আশায় রয়েছে ও।

আনুমানিক একটা হিসাব করা আছে ওর–নির্ধারিত টাইমলাইনের চেয়ে প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা পিছিয়ে আছে ওরা, আর কনসর্টিয়ামের চেয়ে পিছিয়ে আছে কমবেশি পঁচিশ ঘণ্টা।

মূল প্ল্যান অনুসারে মুকেনকোর ঢালে ১৭ জুন দুপুর দুটোয় জাম্প করবার কথা ছিল, জিঞ্জ-এ পৌঁছাবে আনুমানিক ছত্রিশ ঘণ্টা পর–১৯ জুন দুপুরের কোন এক সময়। এই হিসাবে কনসর্টিয়ামের চেয়ে দু'দিন এগিয়ে থাকবার কথা।

কিন্তু স্যাম ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা হওয়ায় নির্দিষ্ট ড্রপ জোন থেকে আশি মাইল দক্ষিণে জাম্প করতে হয়েছে ওদেরকে।

এখন সামনে অচেনা ঘন জঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাপে দেখা যাচ্ছে বেশ ক'টা নদী আছে জঙ্গলে, পার হতে হবে ভেলায় চড়ে। আশি মাইল কম দূর নয়, পেরুতে অন্তত তিনদিন তো লাগবেই।

এর মানে হলো, কনসর্টিয়ামের চেয়ে আগে ওরা অকুস্থলে পৌঁছাতে পারবে না। পরিস্থিতি এখন এমনই দাঁড়িয়েছে, আটচল্লিশ

ঘণ্টা আগে পৌঁছানোর বদলে চব্বিশ ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছাতে পারলেও নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করতে হবে।

রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখাকে আগেই কিছু কাজ দিয়েছে ও। দেখা গেল, অন্তত একটা কাজ তারা নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছে। স্ক্রিনে ফুটে ওঠা মেসেজটার দিকে খুশি মনে তাকিয়ে আছে রানা:

'সিমিউলেশন টাইমলাইনের চেয়ে মাত্র নয় ঘণ্টা পিছিয়ে আছে কনসর্টিয়াম।'

'এরমানে কী?' জিজ্ঞেস করল সিসিলিয়া, স্ক্রিনে চোখ।

এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল ফুয়াদও। 'নিশ্চয়ই কোথাও কেউ ভুল করছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'কনসর্টিয়ামকে স্লো করিয়ে দেয়ার মত কিছু ঘটেছে।'

তারপরই স্ক্রিনে লেখাগুলো ফুটে উঠল: 'জায়ার-এর গোমা এয়ারপোর্টে ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়াম ঝামেলায় পড়েছে। তাদের প্লেনে রেডিওঅ্যাকটিভিটি পাওয়া গেছে। বেচারিদের দুর্ভাগ্য।'

'নিউ ইয়র্ক থেকে তোমার এজেন্সি কলকাঠি নেড়েছে,' বলল সিসিলিয়া। রানা ওদেরকে কি কাজ করতে দিয়েছিল, সে জানে। ভাবল, শহর থেকে অনেক দূরে গোমা এয়ারপোর্ট, সেখানে কনসর্টিয়ামের প্লেনকে আটকে দিতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে রানা এজেন্সির এজেন্টদের।

ফুয়াদ উল্লসিত। 'তারমানে, সার, ওদেরকে এখনও আমরা হারিয়ে দিতে পারি, শুধু যদি মাত্র এই নয় ঘণ্টা এগিয়ে যাওয়া যায়।'

'হ্যাঁ, সম্ভব,' বলল রানা। 'অন্তত চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই।'

অন্ধকার আর ভেজা ভেজা রেইন ফরেস্টে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল শৈলীর আচরণ। বনভূমি ওর প্রথম আর প্রকৃত ঠিকানা। সেটা মনে রেখে আনন্দও আন্দাজ করতে পেরেছিল কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে ওর।

শৈলী আর দলের সঙ্গে থাকল না।

নিষেধ না শুনে ট্রেইল ছেড়ে সরে গেল, এখানে-সেখানে বসে নরম

ঘাস চিবাচ্ছে। একবার বসলে সহজে নড়ানো যাচ্ছে না। তাগাদা দিলেও শুনছে না। দলের সঙ্গে থাকবার আনন্দর অনুরোধ গায়েই মাখল না।

আচরণে অলস একটা ভাব এসে গেছে, চোখে খানিকটা শূন্য দৃষ্টি। টানেল আকৃতির রোদ গায়ে মেখে মাটিতে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকল, তৃপ্তির সঙ্গে ঢেকুর তুলছে বা সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে।

'এরকম করছে কেন?' জানতে চাইল রানা।

'আবার গরিলা হয়ে গেছে,' বলল আনন্দ। 'গরিলারা নিরামিষ ভোজী। সারাদিনই চিবায়—শরীরটা বিরাট তো, প্রচুর খাবার লাগে।' শৈলী জঙ্গলে ঢুকেই বৈশিষ্ট্যগুলো ফিরে পেয়েছে।

'তা না হয় বুঝলাম,' বলল রানা। 'ওকে তুই দলের সঙ্গে ধরে রাখতে পারিস না?'

'চেষ্টা তো করছি। কিন্তু আমার দিকে মন নেই ওর।' কারণটা সে জানে—অবশেষে এমন এক জগতে ফিরে এসেছে শৈলী, যেখানে আনন্দ সেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে; সেখানে নিজেই নিজের খাবার, আশ্রয় আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে ও।

'ঠিক আছে,' অবশেষে সমাধান দিল রানা। 'ওকে এখানে রেখেই এগোব আমরা।' আনন্দর কনুইটা শক্ত করে ধরে হাঁটা ধরল ও, বাকি সবাইও রওনা হয়ে গেছে। 'খবরদার, একবারও পিছন ফিরে তাকাবি না,' বলল ও। 'স্রেফ হাঁটতে থাক। ওকে গ্রাহ্য করার দরকার নেই।'

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে হাঁটল ওরা।

আনন্দ বলল, 'ও আমাদের পিছু না-ও নিতে পারে।'

'অ্যানিমেল বিহেইভিয়ারের ওপর পিএইচডি করেছিস,' বলল রানা। 'আমার ধারণা ছিল গরিলাদের সম্পর্কে তোর ধারণা আছে।'

'আছে বৈকি।'

'তা হলে জানিস যে রেইন ফরেস্টের এই অংশে নেই ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল আনন্দ। গাছে কোন বাসা দেখেনি সে, মাটিতেও দেখেনি পায়ের কোন ছাপ। 'তবে ওর যা যা দরকার তার সবই এখানে আছে।'

'সব নেই,' বলল রানা। 'অন্যান্য গরিলা না থাকলে সব থাকে কী

করে?'

উঁচু স্তরের সমস্ত প্রাইমেটের মত গরিলারাও সামাজিক প্রাণী। দলবদ্ধভাবে বাস করে ওরা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্বস্তি পায় না, নিরাপদও বোধ করে না।

'আমরাই ওর দল,' বলল রানা। 'আমাদের ছেড়ে বেশিক্ষণ পিছনে থাকতে পারবে না।'

কয়েক মিনিট পর ঝোপ-ঝাড়ের ডালপালা ভেঙে পঞ্চাশ গজ সামনে হাজির হলো শৈলী। দলটার উপর চোখ বুলিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আনন্দর দিকে তাকাল।

'কাছে এসো, শৈলী,' বলল রানা। 'আমি তোমাকে আদর করব।' ছুটে এসে ঘাসের উপর, ওর সামনে পিঠ দিয়ে শুলো শৈলী।

ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে রানা। 'দেখলি?' আনন্দকে বলল ও। 'কোন ব্যাপারই না।'

এরপর একবারও দল ছেড়ে কোথাও গেল না শৈলী।

দশ

জঙ্গলে ঢুকবার পর কিকুয়া পোর্টারদেরও আচরণ পাল্টাল। তারা হাসছে, গাইছে, যত বেশি পারা যায় শব্দ করছে।

একসময় কয়কয়কে ডেকে রানা বলল, 'ওদের আনন্দ দেখছি ধরে না।'

'না, সার!' হেসে ফেলল কয়কয়। 'ওরা আনন্দ করছে না। সাবধান করছে।'

'সাবধান করছে মানে?'

কয়কয় ব্যাখ্যা করল, পোর্টাররা বুনো মোষ আর চিতাবাঘকে দূরে

সরিয়ে রাখবার জন্য চেঁচামেচি করছে। তারপর বলল, 'ওগুলো তো আছেই, ওরা টেমবো-ও খেদাতে চাইছে।'

'এটা কি টেমবো ট্রেইল?' জানতে চাইল রানা, জানে টেমবো মানে হাতি।

মাথা ঝাঁকাল কয়কয়।

'হাতির পাল কাছাকাছি থাকে?'

'বলা মুশকিল।'

খানিক পর পুরানো একটা প্রসঙ্গ তুলল রানা। 'আমাকে বলা হয়েছে ওরা সবাই তোমার ভাই,' বলল ও, ইঙ্গিতে পোর্টারদের লাইনটা দেখাল।

'হ্যাঁ, ওরা সবাই আমার ভাই।'

'ও।'

'তবে, সার, আপনি যদি ধরে নেন যে ওরা আমার ভাই হওয়ায় আমাদের মা একজনই, তা হলে ভুল করবেন।'

'তোমাদের মা এক নন?'

'না,' জবাব দিল কয়কয়।

'তারমানে তোমরা আপন ভাই নও?'

'মর জ্বালা! আপন ভাই হব না কেন। আপন ভাই-ই। তবে মা আমাদের এক নয়।'

'মা এক না হলে তোমরা আপন ভাই হলে কী ভাবে?'

'হলাম, কারণ আমরা একই গ্রামে থাকি।'

'তোমার মা আর বাবার সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'একই বাড়িতে?'

কয়কয়কে আহত দেখাল। 'না,' বলল সে। 'সার, আমার আসলে বোঝাতে ভুল হচ্ছে। আমরা কিকুয়া। যেখানে যত কিকুয়া আছে সবাই আমরা পরস্পরের আপন ভাই।' চোখে-মুখে গর্ব নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

ব্যাখ্যাটা ভাল লাগল রানার। উন্নত আর সভ্য বলে দাবি করে এমন অনেক জনগোষ্ঠীর লোকজনও পরস্পরকে এতটা আপন করে নিতে পারে না।

রানার কাঁধ থেকে ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট ঝুলছে। ওর এই বোঝা খানিকটা লাঘব করতে চাইল কয়কয়। খানিক পরপরই ওয়াশিংটন বা নিউ ইয়র্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে, তাই রাজি হলো না রানা।

সকাল সাড়ে দশটায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো। মার্ক জিলেটও কনসর্টিয়াম-এর পিছিয়ে পড়বার খবরটা দিলেন। তবে এ-ও জানালেন যে ওদের এগোবার গতিও খুব কম।

সিসিলিয়া আর ফুয়াদকে ডেকে ব্যাপারটা জানাল রানা।

'আমাদের আরও দ্রুত এগোতে হবে,' বলল সিসিলিয়া।

'কিভাবে? জগ করবেন? ব্যায়াম হিসেবে খুব ভাল,' বলল ফুয়াদ। তারপর ভাবল, সিসিলিয়ার জন্য কাজটা না বেশি কঠিন হয়ে যায়। তাই আবার বলল, 'এই জায়গা আর ভিরুঙ্গার মাঝখানে অনেক কিছু ঘটতে পারে।'

দূরে মেঘ ডাকবার গমগমে আওয়াজ শুনল ওরা। তারপর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে ঝম ঝম করে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

ফোঁটাগুলো এত বড় আর ভারী যে সত্যি ব্যথা লাগছে। পরবর্তী এক ঘণ্টা বিরতিহীন ঝরতে থাকল। থামল ঠিক যেভাবে শুরু হয়েছিল তেমনি ভাবেই–হঠাৎ।

সবাই ঠক ঠক করে কাঁপছে, ভিজে কাপড়চোপড় চামড়ার সঙ্গে সেঁটে গেছে। লাঞ্চের জন্য থামবার কথা বলল ফুয়াদ। রানা আপত্তি করল না।

সঙ্গে সঙ্গে খাবার সন্ধানে ছুটল শৈলী।

চাল-ডাল-মাংস দিয়ে খিচুড়ি রাঁধল পোর্টাররা। নিজের আর সিসিলিয়ার পায়ে সেঁটে থাকা জোঁকগুলোকে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে পোড়াল রানা। সবগুলো রক্ত খেয়ে বেলুনের মত ফুলে আছে।

সিসিলিয়া বলল, 'আমি টেরই পাইনি।'

আনন্দর পা থেকে ফুয়াদও জোঁক খসাচ্ছে। 'বৃষ্টি হলে উপদ্রবটা আরও বাড়ে,' বলল সে। তারপর ঝট করে মুখ তুলল, জঙ্গলের উপর চোখ বুলাচ্ছে।

'কোনও সমস্যা?'

'না, কিছু না,' বলল ফুয়াদ। তারপর জোঁক প্রসঙ্গে ফিরে এসে ব্যাখ্যা করল কী কারণে ওগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা দরকার–টেনে ছাড়ানো হলে জোঁকের মাথার অংশবিশেষ মাংসের ভিতর আটকে থাকে, আর পরে সেটা ইনফেকশনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কয়কয় ওদের জন্য খাবার নিয়ে এল। ফুয়াদ তাকে প্রশ্ন করল, 'লোকগুলো সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ,' বলল কয়কয়। 'সবাই ঠিক আছে। ওরা ভয় পাবে না।'

রানা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, ভয় পাওয়ার কী ঘটল? কিন্তু ফুয়াদের চোখের ভাষা পড়তে পেরে মুখ খুলল না।

'কিসের ভয়?' জানতে চাইল আনন্দ।

'খাওয়ায় মন দিন। স্বাভাবিক থাকুন,' বলল ফুয়াদ।

ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটার চারদিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল আনন্দ।

'খান!' ফিসফিস করল ফুয়াদ। 'ওদেরকে অপমান করবেন না। আপনার জানার কথা নয় যে ওরা এখানে আছে।'

দলের সবাই চুপচাপ খাওয়ায় ব্যস্ত থাকল। কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল, কিছুই ঘটছে না। তারপর কাছাকাছি একটা ঝোপ নড়ে উঠল। ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল একজন পিগমি।

বুকটা ড্রাম আকৃতির। লম্বায় সাড়ে চার ফুট। গায়ের রঙ কালো হলেও, ঘন কালো নয়। পরনে শুধু নেংটি। কাঁধে ঝুলছে তীর আর ধনুক। সবার উপর চোখ বুলাচ্ছে, বুঝতে চাইছে এদের মধ্যে কে দলনেতা।

দাঁড়াল ফুয়াদ। দ্রুত কয়েকটা কথা বলল সে, ভাষাটা সোয়াহিলি নয়। সঙ্গে সঙ্গে জবাবে কিছু বলল পিগমি লোকটা। তাকে একটা আধ পোড়া সিগারেট দিল ফুয়াদ, যেটা দিয়ে আনন্দর পা থেকে জোঁক খসাচ্ছিল।

ফুয়াদের এই আচরণ রানার ভাল লাগল না। কিন্তু লোকটার সামনে এখন যদি ভুলটা ধরিয়ে দেওয়া হয়, ফুয়াদকে অপমান আর ছোট করা হবে।

'ওকে সিগারেটের পুরো একটা প্যাকেটই তুমি দিতে পারো,'

বলল রানা।

নিজের ভুল হয়তো ধরতে পেরেছে ফুয়াদ। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি নতুন একটা প্যাকেট বের করল সে।

ইতোমধ্যে তার দেওয়া সিগারেটের টুকরোটা না ধরিয়ে নেংটির সঙ্গে আটকানো একটা লেদার পাউচে রেখে দিয়েছে পিগমি লোকটা।

'এটা,' বলল ফুয়াদ, প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরল, 'আমাদের লিডারের তরফ থেকে।'

হাত চালিয়ে প্যাকেটটা খুলল লোকটা। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। তারপর প্যাকেটটা রেখে দিয়ে দ্রুত কী যেন সব বলে গেল। মাঝেমধ্যে তাকে থামিয়ে দিয়ে দু'একটা প্রশ্ন করল ফুয়াদ। কথা বলবার সময় বারবার জঙ্গলের দিকে তর্জনী তাক করল লোকটা।

'সার, ও বলছে ওদের গ্রামে একজন শ্বেতাঙ্গ লোক মারা গেছে,' বলল ফুয়াদ। নিজের প্যাকটা তুলল সে, তাতে ফার্স্ট-এইড কিটটা আছে। 'আমাকে এখনই যেতে হবে।'

সিসিলিয়া বলল, 'কিন্তু আমাদের হাতে সময় কোথায়?'

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাল ফুয়াদ।

'বুঝে দেখো, ফুয়াদ,' বলল রানা। 'লোকটা তো মারাই গেছে।'

'না, সার, পুরোপুরি মারা যায়নি,' বলল ফুয়াদ। 'মানে, চিরকালের জন্যে মারা যায়নি।'

পিগমি লোকটা প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাল।

ফুয়াদ ব্যাখ্যা করলঃ মাত্রা অনুসারে অসুস্থতাকে কয়েকটা আলাদা স্তরে ভাগ করে রেখেছে পিগমিরা। প্রথমে একজন লোকের শরীর শুধু 'গরম' হয়। তারপর তার 'জ্বর' হয়। জ্বরের পর 'অসুখ'। তারপর 'মৃত্যু'। মৃত্যুর পর 'সম্পূর্ণ মৃত্যু'। সবশেষে 'মৃত্যু চিরকালের জন্যে'।

ঝোপ থেকে আরও তিনজন পিগমি বেরুল। দেখে মাথা ঝাঁকাল ফুয়াদ। 'জানতাম একা আসেনি,' বলল সে। 'এরা একা কোথাও যায় না। আরও আছে, লক্ষ রাখছে আড়াল থেকে।'

'ভয়ের ব্যাপার?' বিড় বিড় করে জানতে চাইল সিসিলিয়া।

'বোকার মত যদি ভুলভাল কিছু করে বসি, তা হলে,' জবাব দিল

ফুয়াদ। 'কেউ অস্ত্র বের করবেন না। হঠাৎ কেউ দৌড়ও দেবেন না। ওরা চমকালে বা ভয় পেলে তীর ছুঁড়বে খয়েরি ডগা দেখছেন? বিষ।'

তবে পিগমিদের বেশ শান্ত আর স্বাভাবিকই দেখাচ্ছে। অন্তত যতক্ষণ না শৈলী ফিরে এল।

শৈলী ফিরল ঝোপ-ঝাড় ভেঙে তীব্র বেগে। পিগমিরা চেঁচাচ্ছে। চোখের পলকে হাতে তীর-ধনুক তৈরি। ভয় পেয়ে আনন্দকে লক্ষ্য করে ছুটল শৈলী। লাফ দিয়ে পড়ল তার গায়ে, ফলে দুজনেই ছিটকে পড়ল মাটিতে। কাদায় একেবারে লেপটে গেল আনন্দর ট্রাউজার আর শার্ট।

পিগমিরা কোন বিপদ দেখতে না পেয়ে শান্ত হলো; মহা উৎসাহে নিজেদের মধ্যে আলাপ করে সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করছে শৈলীর আগমন কী অর্থ বহন করে। বেশ কিছু প্রশ্ন করা হলো ফুয়াদকে।

শৈলীকে সরিয়ে দিয়ে সিধে হল আনন্দ, তারপর ফুয়াদকে জিজ্ঞেস করল, 'ওদেরকে আপনি কী বললেন?'

'ওরা জানতে চাইল গরিলাটা আপনার কি না। আমি বললাম, হ্যাঁ। জানতে চাইল, গরিলাটা মেয়ে কি না। আমি হ্যাঁ বললাম। তারপর ওরা জিজ্ঞেস করল, ওর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আছে কি না। আমি বললাম, না। ওরা বলল, সেটা ভাল। আরও বলল, একটা গরিলার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে আপনি ব্যথা পাবেন।'

'ব্যথা পাব কেন?'

'ওরা বলছে, গরিলা বড় হওয়ার পর হয় জঙ্গলে পালিয়ে যায়, নয়তো আপনাকে খুন করে।'

পিগমিদের গ্রাম ওদের পথ থেকে যথেষ্ট দূরে, সেই লাইকো নদীর কিনারায়, এ-কথা শুনে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে আরও জোরাল আপত্তি জানাল সিসিলিয়া। 'এমনিতেই টাইমলাইনের পিছনে পড়ে আছি,' বলল সে। 'অন্য কোথাও যেতে হলে আরও পিছিয়ে পড়ব।'

রেগে উঠল ফুয়াদ, তবে সেটা প্রকাশ পেতে দিল না। রানার দিকে তাকাল সে। 'সার, আপনি কী বলেন?'

'আগে তোমার যুক্তিটা শুনি,' বলল রানা।

'এটা কঙ্গোর রেইন ফরেস্ট, সার, আধুনিক কোন শহর নয়,' বলল ফুয়াদ। 'এখানে কেউ আহত হলে তার চিকিৎসা পাওয়ার কোন আশা নেই। লোকটার নেহাতই ভাগ্য যে এখানে আমরা আছি, আর আমাদের কাছে ওষুধও আছে। তার সাহায্য দরকার।'

'তুমি কী বলো?' সিসিলিয়াকে জিজ্ঞেস করল রানা।

সিসিলিয়া এতটুকু উত্তেজিত নয়। তবে তারও যুক্তি আছে। 'গ্রামে যদি যাই, সারাটা দিন নষ্ট হবে,' বলল সে। 'তার মানে আরও নয় বা দশ ঘণ্টা পিছিয়ে পড়ব। এখন যে অবস্থা, কনসর্টিয়ামের আগে পৌঁছানো একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু আরও দেরি হলে কোন সুযোগই থাকবে না।'

'আগে পৌঁছানোর সুযোগ বোধহয় এখনও নেই,' বলল রানা। 'আরেকটা কথা–নষ্ট হওয়া সময় আমরা অন্য কোনভাবে পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারব।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিসিলিয়া কিছু বলতে যাবে, এই সময় পিগমিদের একজন ফুয়াদের উদ্দেশে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল। মাথা ঝাঁকাল ফুয়াদ, বারকয়েক সিসিলিয়ার দিকে তাকাল। তারপর পিগমির দিকে পিছন ফিরল সে। 'ও বলছে, ফর্সা লোকটার শার্টের পকেটে কয়েকটা হরফ দেখেছে। সেই হরফগুলো এখন সে এঁকে দেখাবে।'

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপল সিসিলিয়া।

একটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে নরম মাটিতে বড় করে অক্ষরগুলো আঁকল পিগমি লোকটা: VRMC.

'ওহ্, গড!' অস্ফুটে বলল সিসিলিয়া।

পিগমিরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটল না, ঘোড়ার মত দুলকি চালে ছুটল। গাছ থেকে নেমে আসা ঝুরি এড়িয়ে, পানি ভর্তি খানা-খন্দ আর মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা গাছের শিকড় লাফ দিয়ে পেরিয়ে এল তারা অনায়াসে। মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাচ্ছে, ধারণা সভ্য দুনিয়ার ওরা চারজন ওদের সঙ্গে থাকবার জন্য হাঁপিয়ে সারা হচ্ছে।

তবে না, সেরকম কিছু ঘটছে না। রানা আর ফুয়াদ ওদের প্রায়

সঙ্গেই রয়েছে, দু'জনের কেউই এতটুকু ক্লান্ত নয়। সিসিলিয়া রয়েছে হাত দশেক পিছনে, তবে তাকেও হাঁপাতে দেখা গেল না।

পিগমিরা বিস্মিত হলেও কেউ কিছু বলল না।

হাঁপাচ্ছে, বেশ খানিকটা পিছিয়েও পড়েছে, একা শুধু আনন্দ। সে নিয়মিত ব্যায়াম করে না।

ছুটতে ছুটতে ছোট একটা ঝরণা আর রোদ ঝলমলে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল দলটা। পাথরের পাশে থামল পিগমিরা, বিশ্রামের জন্য সূর্যের দিকে মুখ করে উবু হয়ে বসল।

রানার পিছু নিয়ে একে একে ঝরণার কিনারায় পৌঁছাল ফুয়াদ, সিসিলিয়া, আনন্দ আর শৈলী।

পিগমিরা কঙ্গো রেইন ফরেস্টের সবচেয়ে আদি অধিবাসী। ক্ষুদ্র আকৃতি, স্বতন্ত্র আচরণ, কুশলী তৎপরতার কারণে কয়েক শতাব্দী আগেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে ওরা।

চার হাজার বছরেরও আগে হারকাউফ নামে একজন ঈজিপশিয়ান কমান্ডার কঙ্গোর গভীর বনভূমিতে ঢুকে খুদে মানুষের একটা জাতিকে দেখতে পান, যারা তাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে নাচ আর গান করত। হারকাউফের এই রিপোর্ট সত্য বলে ধরে নেওয়া চলে, কারণ এরপর হেরোডোটাস এবং তারও পরে অ্যারিসটোটল জোর দিয়ে বলেছেন যে এইসব ক্ষুদ্র মানুষের গল্প সত্যি, নিছক রূপকথা নয়।

দশ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো খুদে পিগমিরা। আরও আধঘণ্টা ছোটার পর ধোঁয়ার গন্ধ পেল রানা। সামনে আবার একটা ঝরণা পড়ল, পাশে ফাঁকা জায়গা। গ্রামটা এখানেই।

গোল আকৃতির দশটা কুঁড়ে দেখল রানা। ঘরগুলো লম্বায় চার ফুটের বেশি হবে না, তৈরি করা হয়েছে অর্ধ-বৃত্তাকারে।

গ্রামের লোকজন ঘর থেকে বেরিয়ে বিকেলের আলোয় বসে আছে। সকালের দিকে সংগ্রহ করা ব্যাঙের ছাতা আর জাম ধুচ্ছে মহিলারা, কিংবা আগুনে ফেলে কাছিম বা শুঁয়োপোকা রান্না করছে। ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে খেলছে।

ফুয়াদের সংকেত পেয়ে গ্রামের কিনারায় অপেক্ষা করল সবাই, যতক্ষণ না গ্রামবাসীরা ওদেরকে লক্ষ করল। তারপর পথ দেখিয়ে

ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো চারজনকে।

ওদের আগমন বিরাট হইচই ফেলে দিল গোটা গ্রামে। বাচ্চারা ঘিরে ধরল ওদের, হাসছে। পুরুষরা ফুয়াদ আর আনন্দর কাছ থেকে সিগারেট চাইছে। মেয়েরা সিসিলিয়ার রেশমি চুল ছুঁয়ে দেখছে। রানার পায়ের ফাঁক দিয়ে এক-দেড় বছরের একটা মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিজের মায়ের কাছে চলে গেল।

আনন্দর হাতে দু'প্যাকেট সিগারেট ধরিয়ে দিল ফুয়াদ। বলল, 'বিলি করবেন ঠিকই, কিন্তু দেখবেন কেউ যাতে একটার বেশি না পায়।'

কুশল বিনিময় শেষ হতে গ্রামের শেষ প্রান্তে নতুন তোলা একটা কুঁড়েঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদেরকে। 'মৃত' শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে ওই ঘরেই রাখা হয়েছে।

নোংরা এক লোককে পেল ওরা, কাপড়চোপড় আর গা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। বেশ ক'টা দিন দাড়ি-গোঁফও কামানো হয়নি। বয়স হবে ত্রিশ কী বত্রিশ। ছোট্ট দোরগোড়ায় পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে সে, তাকিয়ে আছে দূরে। এক মুহূর্ত পর রানা বুঝতে পারল লোকটা ক্যাটাটনিক–মানসিক আঘাতজনিত কারণে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে; প্রায় জড় পদার্থ বললেই হয়, নড়ে না।

'হায় ঈশ্বর,' বলল সিসিলিয়া। 'এ তো আমাদের উইলি বেকার!'

'আপনি ওকে চেনেন?' জিজ্ঞেস করল ফুয়াদ।

'আমার কোম্পানির একজন জিয়োলজিস্ট ও, প্রথম কঙ্গো এক্সপিডিশানে ছিল।' বেকারের দিকে ঝুঁকল সিসিলিয়া, তার মুখের সামনে হাত নাড়ল। 'উইলি, আমি সিসিলিয়া। উইলি, কী হয়েছে তোমার?'

বেকার সাড়া দিল না। এমনকী চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলছে না সে।

পিগমিদের একজন কী ঘটেছে ব্যাখ্যা করল ফুয়াদকে।

'চারদিন হলো গ্রামে এসেছে সে,' লোকটা থামতে সিসিলিয়াকে বলল ফুয়াদ। 'খুব ধস্তাধস্তি আর পাগলামি করছিল, ওরা বাধ্য হয়ে তাকে আটকে রাখে। গ্রামের ওঝা সন্দেহ করে তার কালাজ্বর হয়েছে।

কিছু ওষুধ খাওয়ানোর পর ছটফটে ভাবটা চলে যায়।

'ওরা এই নতুন ঘরটা বানিয়ে তাকে থাকতে দিয়েছে। এখন সে খেতে দিলে খায়, কিন্তু কোন কথা বলে না। ওরা ভাবছে জেনারেল পাকুড় মোয়ানার সৈন্যরা তাকে টরচার করেছে, কিংবা সে হয়তো বোবা।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল সিসিলিয়া।

'এখন বলুন একে নিয়ে কী করা যায়,' বলল ফুয়াদ। 'যে অবস্থা দেখছি, আমাদের কিছু করার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। ফিজিক্যালি ঠিক আছে, কিন্তু...' মাথা নেড়ে চুপ করে গেল সে।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে রানার দিকে তাকাল সিসিলিয়া। 'কী করব, রানা?'

রানার কাছে এই সমস্যার সহজ সমাধান আছে। 'ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করি, মিস্টার জিলেটকে এখানকার লোকেশন জানাই। কিনসাসা থেকে সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন তিনি। ওখানে তোমার আরেকটা ফিল্ড পার্টি কাজ করছে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল সিসিলিয়া, তারপর বলল, 'আমি কি উইলির সঙ্গে থেকে যাব? ও আমার চাকরি করে, আমার একটা দায়িত্ব আছে।'

'তুমি থাকতে চাইলেও তো আমি থাকতে দেব না,' বলল রানা। 'এটা একা একটা বিদেশী মেয়ের জন্যে মোটেও নিরাপদ জায়গা নয়। দায়িত্বটা তোমার হয়ে অন্য লোকদের পালন করতে দাও।'

এত কিছুর মধ্যে বেকার একবারও একটু নড়ল না। তার চোখে চোখ রাখবার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকল আনন্দ, অমনি নাক কোঁচকাল বেকার। তার শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠল। গলা থেকে আতঙ্কিত একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে—আ-আ-আ, যেন চিৎকার করতে যাচ্ছে।

বিমূঢ় হয়ে পিছিয়ে এল আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে ঢিল পড়ল বেকারের পেশীতে, গলার আওয়াজটাও থেমে গেল।

'কী ছাই ঘটল কিছুই তো বুঝলাম না!' রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

পিগমিদের একজন ফিসফিস করল ফুয়াদের কানেঃ 'মরা লোকটা বলল, ওর গায়ের গন্ধ গরিলার মত।'

দু'ঘণ্টা পর কয়কয় আর তার ভাইদের সঙ্গে গাবুটু-র দক্ষিণে আবার মিলিত হলো ওরা চারজন, ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল একজন পিগমি গাইড।

পিগমিদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য যদি সত্যি হয়, জেনারেল পাকুড় মোয়ানার সৈন্যরা মাকরান ঢালে একটা সাপ্লাই ক্যাম্প তৈরি করেছে। আর ঠিক ওখানেই ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ফুয়াদ।

সব শুনে রানা বলল, 'সৈন্যদের এড়িয়ে যাব আমরা। কারণ দেখা হয়ে গেলে হয় খুন হতে হবে, নয়তো খুন করতে হবে।'

একমাত্র বিকল্প রাস্তাটা পশ্চিম দিকে চলে গেছে, রাগোরা নদীর দিকে। ফুয়াদ ভুরু কুঁচকে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকল।

রানার ভুরুও কোঁচকানো, তাকিয়ে আছে কমপিউটার কনসোলের দিকে।

'রাগোরা নদীকে নিয়ে সমস্যাটা কী?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'হয়তো কোন সমস্যা নেই,' বলল ফুয়াদ। 'নির্ভর করে সম্প্রতি কী পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে ওদিকটায়, তার ওপর।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বারো ঘণ্টা পিছিয়ে আছি,' বলল ও। 'খুব ভাল হত আমরা যদি রাতেও না থেমে নদীটা পেরিয়ে যেতে পারতাম।' স্রেফ কথার কথা, কেননা রানা জানে যে দলে সিসিলিয়া আর শৈলী থাকায় এরকম ঝুঁকি নেওয়া চলে না।

'আমি অবশ্য সেটাই করব,' বলল ফুয়াদ।

তার দিকে অবাক হয়ে তাকাল রানা। এরকম কথা আগে কখনও কোন এক্সপিডিশান গাইডের মুখে শোনেনি ও। গভীর বনভূমির ভিতর দিয়ে রাতে পথ চলা, কোন গাইড এটা ভাবতেই পারে না। 'তুমি সেটাই করবে? কেন?'

'কারণ,' বলল ফুয়াদ, 'বাধাগুলো ভাটির দিকে রাতে তেমন বিপজ্জনক নয়।'

'কী বাধা?'

'সেটা আমরা ওগুলোর সামনে পৌঁছে আলোচনা করব,' বলল ফুয়াদ।

এগারো

রাগোরা মাইলখানেক দূরে থাকতেই বিপুল পানির গর্জন শুনতে পেল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠল শৈলী, বারবার জানতে চাইল: 'কী পানি?' আনন্দ তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলেও খুব বেশি কিছু বলবার নেই তার। শৈলী যতই ভয় পাক, নদীতে ওকে নামতেই হবে।

কিন্তু রাগোরার কাছে এসে ওরা দেখল গর্জনটা ভেসে আসছে উজানের কোথাও একটা বড়সড় জলপ্রপাত থেকে। ওদের সরাসরি সামনে নদীটা মাত্র পঞ্চাশ ফুট চওড়া, মেটে রঙের পানি একদম শান্ত।

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল আনন্দ। 'দেখে ভীতিকর বলে মনে হচ্ছে না।'

'না,' বলল ফুয়াদ। তবে যে নদী থেকে রাগোরা শাখা হয়ে বেরিয়ে এসেছে, সেই কঙ্গো সম্পর্কে তার ধারণা আছে।

দুনিয়ার বৃহত্তম নদীগুলোর তালিকায় চার নম্বরে রয়েছে ওটা–নীল নদ, অ্যামাজন আর ইয়াংজি-র পরেই। প্রতি সেকেন্ডে পনেরো লাখ কিউবিক ফুট পানি আটলান্টিক মহাসাগরে ঢালছে কঙ্গো, এক অ্যামাজন ছাড়া এই ক্ষমতা দুনিয়ায় আর কোন নদীর নেই।

ওরা আরুটু নামে একটা জায়গায় পৌঁছেছে, রাগোরা গিরিসঙ্কট থেকে এখনও পনেরো মাইল উজানে। নদীর এখানকার চেহারা আর হাবভাব দেখে খাদের নীচে তার ভয়াল মূর্তি সম্পর্কে কিছু আঁচ করা সম্ভব নয়। এ-সব খুব ভাল করে জানে ফুয়াদ, তবে আনন্দকে জানাবার দরকার আছে বলে মনে করছে না, বিশেষ করে আনন্দ যখন শৈলীকে নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে।

কয়কয়ের লোকজন দুটো জোডিয়েক বোটে বাতাস ভরছে দেখে শৈলীর অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। আনন্দর আস্তিনে টান দিয়ে জানতে চাইল, 'কী বেলুন?'

'ওগুলো বোট, শৈলী,' বলল আনন্দ। 'বোট' শব্দটা শিখতে খুব কষ্ট করতে হয়েছে শৈলীকে। পানি অপছন্দ করে, কাজেই পানির উপর চলাচল করে এমন কোন জিনিসে তার এতটুকু আগ্রহ নেই।'

'কেন বোট?' জানতে চাইল ও।

'এখন আমরা বোটে চড়ব,' বলল আনন্দ।

পোর্টাররা বোটগুলোকে নদীর কিনারা থেকে পানিতে নামাচ্ছে। তারপর শুরু হলো মাল-পত্র তোলা আর বাঁধাছাঁদার কাজ।

'কে চড়বে?' জিজ্ঞেস করল শৈলী।

'আমরা সবাই,' বলল আনন্দ।

শৈলী সংকেত দিল, 'না!' পিঠ আড়ষ্ট হয়ে উঠল ওর, কাঁধ শক্ত।

'শৈলী,' আনন্দ বলল, 'আমরা তোমাকে এখানে রেখে যেতে পারি না।'

শৈলীর কাছে এটা কোন সমস্যাই নয়।

'আর সবাই যায় যাক। শৈলীর সঙ্গে আনন্দ থাকুক।'

'দুঃখিত, শৈলী,' বলল আনন্দ। 'আমাকে যেতেই হবে। তোমাকেও যেতে হবে।'

'না,' সংকেত দিল শৈলী। 'শৈলী যাবে না।'

'যাবে, শৈলী।' নিজের প্যাক খুলে সিরিঞ্জ আর থোরালিন-এর শিশি বের করল আনন্দ।

রাগে শরীর আড়ষ্ট, চিবুকের নীচের দিকটা শক্ত করা মুঠো দিয়ে ঠুকছে শৈলী।

'ভাষা ঠিক করো, শৈলী,' নির্দেশ দিল আনন্দ।

শৈলী আর আনন্দর জন্য কমলা রঙের লাইফ ভেস্ট নিয়ে এল রানা। 'তোদের আবার কী হলো?' জানতে চাইল ও।

'গাল দিয়ে ঝাল ঝাড়ছে,' বলল আনন্দ। 'তুই বরং এখন যা।'

উত্তেজিত শৈলীকে একবার দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে কেটে পড়ল রানা।

শৈলী সংকেতের মাধ্যমে আনন্দর নাম নিয়ে আবার চিবুকের নীচে মুঠো দিয়ে হালকা বাড়ি মারল। এর অর্থ হলো: 'আনন্দ জঘন্য।'

'শৈলী...' সিরিঞ্জে ডাবল ডোজ ভরছে আনন্দ।

'আনন্দ জঘন্য বোট জঘন্য মানুষ জঘন্য।'

'শৈলী, তোমার এ-সব থামাও!' শরীরের পেশী শক্ত করে সামনের দিকে ঝুঁকল আনন্দ, একটা গরিলা রেগে গেলে সাধারণত যা করে। আনন্দকে এরকম করতে দেখলে পিছিয়ে যায় শৈলী। কিন্তু আজ এতে কোন কাজ হলো না।

'শৈলীর প্রতি আনন্দর কোন ভালবাসা নেই।' এবার অভিমান হচ্ছে শৈলীর। তার দিকে পিছন ফিরে, সংকেত দিল ও, বিশেষ কাউকে লক্ষ করে নয়।

'বোকার মত আচরণ কোরো না,' বলল আনন্দ, ওষুধ ভরা সিরিঞ্জ নিয়ে এগোল।

ঘুরল শৈলী, পিছু হটছে; আনন্দকে কাছাকাছি আসতে দেবে না। শেষে CO_2 গান লোড করে ওর বুকে খুদে একটা বর্শা গাঁথতে বাধ্য হলো আনন্দ। গত কয়েক বছরে মাত্র তিন কী চারবার এটা ব্যবহার করতে হয়েছে তাকে। চেহারায় বিষণ্ন একটা ভাব নিয়ে বর্শাটা টান দিয়ে বুক থেকে খুলে নিল শৈলী: 'শৈলীকে আনন্দ ভালবাসে না।'

'দুঃখিত,' বলল আনন্দ, শৈলীর চোখের মণি উল্টে যাচ্ছে দেখে ছুটে এল, তার বাড়ানো হাতের ভিতর ঢলে পড়ল ও।

দ্বিতীয় বোটে আনন্দর পায়ের কাছে পড়ে আছে শৈলী, নিঃশ্বাস ফেলছে ছোট ছোট। সামনে, প্রথম বোটে, রানাকে দেখতে পাচ্ছে আনন্দ–দাঁড়িয়ে রয়েছে।

টিমটাকে দু'দলে ভাগ করেছে রানা, প্রথম বোটে আছে সাতজন, দ্বিতীয় বোটে ছ'জন। পিছনের বোটে আনন্দ আর শৈলীর সঙ্গে সিসিলিয়াও আছে, ওদের লিডার করা হয়েছে কয়কয়কে। তাকে রানা বলেছে, 'আমাদের ভুল-ত্রুটি আর বিপদ-আপদ দেখে সাবধান হতে পারবে তোমরা।'

তবে স্রোতের টানে ভাটির দিকে এগোবার সময় প্রথম দু'ঘণ্টা

কোন বিপদ হলো না। নদীর পরিবেশ শান্ত, তবে দু'পাশে গভীর বনভূমির বিরতিহীন পিছু হটা একঘেয়ে লাগল। নিস্তব্ধতা এমন জমাট আর অটুট, প্রকৃতি যেন সম্মোহিত হয়ে আছে এখানে।

রোদ খুব গরম। বাতাস নেই। সিসিলিয়া ঘোলাটে পানিতে হাত ডোবাচ্ছে দেখে নিষেধ করল কয়কয়। 'মনে রাখতে হবে, যেখানে পানি, সেখানেই মামবা। এই সাপ আপনাকে কামড় দিলে আমাদের ঘাড়ে একটা লাশ চাপবে।' হাত তুলে নদীর ঢালু পাড় দেখাল সে-পানি থেকে উঠে রোদ পোহাচ্ছে কুমিরের দল, ভেলার উপস্থিতি এতটুকু গ্রাহ্য করল না।

'ফুয়াদ সাহেব কি এই কুমির নিয়েই উদ্বিগ্ন ছিলেন?' জানতে চাইল আনন্দ।

'না,' জবাব দিল কয়কয়।

'তা হলে রাগোরা গিরিখাদ নিয়ে?'

মাথা নাড়ল কয়কয়।

'তা হলে?'

'খাদ পার হওয়ার পর দেখতে পাবেন।'

সামনে এরপর রাগোরা মোচড় খেয়েছে। একটা বাঁক ঘোরা শেষ করছে ওরা, ধীরে ধীরে জোরাল হয়ে উঠল পানির গর্জন।

আনন্দ অনুভব করল বোটের স্পিড বাড়ছে। ভেলার কিনারায় ছলকাচ্ছে পানি। কয়কয় চেঁচিয়ে উঠল, 'কিছু ধরে শক্ত হয়ে বসুন, ডাক্তার!'

গিরিখাদে ঢুকে পড়ল ওরা।

ঘোলাটে পানি টগবগ করে ফুটছে, সাদা দেখাচ্ছে রোদ লাগায়। সামনের বোটে রানাকে বসে পড়তে দেখল সিসিলিয়া, সেটা কখনও চরকির মত পাক খাচ্ছে, কখনও গলুইয়ের উপর খাড়া হচ্ছে।

বোটের গতি এত বেশি, ক্যানিয়ান-এর অমসৃণ লাল পাঁচিল ঝাপসা লাগছে চোখে। পাঁচিলগুলো নিরেট পাথর, এখানে-সেখানে সবুজ ঘাসের চাপড়া।

উথলানো ঠাণ্ডা পানি হঠাৎ হঠাৎ ভিজিয়ে দিচ্ছে ওদেরকে।

সামনের বোটটাকে প্রায়ই চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যেতে দেখছে সিসিলিয়া। সগর্জনে ছুটে চলা পানিতে বড় বড় ঢেউ উঠছে। পাথুরে পাঁচিলে লেগে সেই গর্জন প্রতিধ্বনি তুলছে।

খাদের গভীরে, পানির সরু ধারায় বিকেলের রোদ পৌঁছাতে পারেনি। নদী সরু হয়ে আসায় পানি এখানে আরও গতি পেয়েছে, বেড়েছে গর্জনও।

বোট পাক খাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে পাথরে লেগে চুরমার হয়ে যাবে আরোহীরা গলা ফাটিয়ে সতর্ক করছে পরস্পরকে, সেই সঙ্গে বৈঠা লম্বা করে পাথর থেকে বোটকে দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

খাদের ভিতর নদীর পানি টগবগ করে ফুটলেও, স্রোতের সঙ্গে বোটগুলো তীরবেগে ছুটলেও, ওদের মাথার উপর শূন্যে কালো মেঘ ঝুলে থাকল সারাক্ষণ–এ হলো হাজার হাজার মশার ঝাঁক, যেখানে-সেখানে সুযোগ পেলেই কামড়াচ্ছে।

তারপর হঠাৎ চওড়া হয়ে গেল নদী ঘোলাটে পানির স্রোত তীব্রতা হারাল। ক্যানিয়ানের পাঁচিল ক্রমশ দূরে সরে গেল। আবার শান্ত হলো নদী। বোটে নেতিয়ে পড়ল আনন্দ, ভীষণ ক্লান্ত। নিস্তেজ রোদ লাগল ওদের গায়ে।

'যাক বাবা।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সিসিলিয়া।

'তবে ভাববেন না পার পেয়ে গেছেন,' সহাস্যে বলল কয়কয়। 'কিকুয়াদের একটা প্রবাদ আছে–জীবন থেকে জীবিত কেউ পালাতে পারে না। ঢিল দেওয়ার কোন সুযোগ নেই, ম্যাডাম।'

শান্ত পানি ধরে ভাটির দিকে আরও এক ঘণ্টা এগোল ওরা। পাথরের পাঁচিলগুলো আরও অনেক দূরে সরে গেল, তারপর এক সময় আবার দেখা গেল সমতল আফ্রিকান রেইন ফরেস্ট। চারদিকের দৃশ্য এতটা বদলে গেল, যেন রাগোরা গিরিখাদের কোন অস্তিত্বই নেই, কোন কালে ছিলও না। দিগন্তে নেমে আসা সূর্যের নীচে চওড়া নদী তরল সোনার মত টলটল করছে।

ভেজা শার্ট বদলে একটা পুলওভার পরল আনন্দ। গোধূলির

বাতাসে হিমহিম ভাব। তার পায়ের সামনে পড়ে নাক ডাকছে শৈলী। ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে একটা তোয়ালে দিয়ে ওর গা ঢেকে দিয়েছে সিসিলিয়া।

প্রথম বোটে ট্র্যান্সমিটিং ইকুইপমেন্টগুলো চেক করছে রানা। কাজটা শেষ করে দেখল সূর্য ডুবে গেছে। বোটের উপর দাঁড়াল ও, পিছন ফিরে বলল, 'কয়কয়, রেডি হও।'

একটা শটগান ভেঙে ভিতরে হলুদ রঙের শেল ভরল কয়কয়।

'এটা কী জন্যে?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'কিবোকো,' বলল কয়কয়। 'এটার ইংরেজি আমি জানি না।' প্রথম বোটের দিকে ফিরে চেঁচাল সে, 'নিনি মাআনা কিবোকো?'

সামনের বোট থেকে ফুয়াদ জবাব দিল: 'জলহস্তী!'

'জলহস্তী কী বিপজ্জনক?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'আমরা আশা করব কোন বিপদ হবে না,' বলল কয়কয়। 'তবে এই আফ্রিকান কিবোকোগুলোকে বিশ্বাস নেই।'

একটা পুরুষ জলহস্তী প্রকাণ্ড প্রাণী–চোদ্দ ফুট লম্বা, প্রায় দশ হাজার পাউন্ড ওজন। হামলার সময় অত বড় শরীর সত্ত্বেও অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছুটতে পারে। চারটে দাঁত, ওগুলোর কিনারায় ক্ষুরের মত ধার। দুই ষাঁড়ে মারামারি লাগলে সহজে থামে না, সাধারণত দুটোর মধ্যে একটাকে মরতে হয়।

মানুষের জন্যও এই অতিকায় প্রাণী একটা দুঃসংবাদ। যে এলাকার নদীতে জলহস্তীর পাল দেখা যায়, সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা পঞ্চাশজন যদি হাতি আর শিকারী বাঘ বা সিংহ জাতীয় প্রাণীর আক্রমণে মারা যায়, জলহস্তীর হামলায় মারা পড়ে আরও পঞ্চাশজন।

জলহস্তী ঘাস আর পাতা খায়, মাছ-মাংস ছোঁয় না। রাতে যখন ঘাস খেতে ডাঙায় ওঠে, তখনই সবচেয়ে বিপজ্জনক ওগুলো। ডাঙা থেকে নদীতে ফিরছে, এরকম একটা জলহস্তীর সামনে কেউ যদি পড়ে যায়, তার বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে।

তবে আফ্রিকার রিভার ইকোলজির জন্য জলহস্তীর কোন বিকল্প নেই। তার বিষ্ঠা, পরিমাণে প্রচুর হওয়ায়, নদীর তলার ঘাস আর অন্যান্য উদ্ভিদের জন্য সার হিসাবে কাজ করে, ওগুলো বাঁচলে মাছ সহ

অন্যান্য জলজ প্রাণীর বাঁচবার সুযোগ হয়। জলহস্তী না থাকলে আফ্রিকার নদী বন্ধ্যা হয়ে যাবে। যেখান থেকেই ওগুলোকে তাড়ানো হয়েছে, সেখানকার মরে গেছে নদী।

প্রথম বোট থেকে রানার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হলো, রাতে কোথাও থামবে না ওরা। দুটো কারণে ওর এই সিদ্ধান্ত। প্রথমত, মূল্যবান সময় বাঁচাতে চাইছে। কমপিউটার এ-পর্যন্ত যতগুলো টাইমলাইনের ছক করেছে, প্রতিটিতে ধরা হয়েছে রাতে বিশ্রাম নেবে টিম। কিন্তু চাঁদের আলোয় নদীতে বোট চলবে অনায়াসে, প্রায় সবাই আরামে ঘুমাতে পারবে, সকালের মধ্যে পাড়ি দেওয়া হবে পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইল দূরত্ব।

দ্বিতীয়ত, ফুয়াদের পরামর্শে রাগোরা জলহস্তীকে এড়াতে চাইছে রানা। ছোট বোট দেখলে গুঁতো মারবার অভ্যাস আছে ওগুলোর। ওদের রাবার বোট আক্রান্ত হলে ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে যাবে।

দিনের বেলা বোট যেতে দেখলে ষাঁড়গুলো ছুটে এসে নির্ঘাত হামলা করবে। তবে রাতে ওগুলো ঘাস খেতে ডাঙায় ছড়িয়ে পড়ে। মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিতে না চাইলে তখনই নদী ধরে এলাকাটা পার হতে হবে।

ভেবে-চিন্তেই প্ল্যানটা করা হয়েছে, কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা কারণে সেটা কোন কাজে এল না। রাগারো ধরে খুব দ্রুত এগিয়েছে ওরা, আর সেটাই হলো কাল।

যে এলাকায় জলহস্তীদের প্রথম পালগুলো থাকে সেখানে ওরা মাত্র রাত ন'টায় পৌঁছাল। এত তাড়াতাড়ি ঘাস খাওয়ার জন্য ডাঙায় ওগুলো ওঠে না।

কখনও দীর্ঘ মোচড় খেয়ে, কখনও তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে এগিয়েছে নদী। প্রতিটি বাঁক ঘুরবার সময় হাত তুলে নদীর পাশের স্থির জলাশয় দেখাল কয়কয়, বলল, এ-ধরনের শান্ত পানিতেই বাস করতে পছন্দ করে জলহস্তী। হাত লম্বা করে পাড়ের ঘাসও দেখাল সে, কেটে এমনভাবে ছোট করা, যেন যন্ত্র দিয়ে ছাঁটা হয়েছে।

'আর বেশি দেরি নেই ' বিড়বিড় করল কয়কয়।

একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনল ওরা: 'হাও-হাহ্‌-হাহ্‌-হাহ্‌!' যেন একজন বুড়ো লোক গলায় আটকে থাকা কফ বের করবার চেষ্টা করছে।

সামনের বোটে উত্তেজনায় টান-টান হয়ে আছে রানা আর ফুয়াদ। দু'জনের হাতেই একটা করে লোডেড শটগান।

আরেকটা বাঁক ঘুরল ওরা। পানির স্রোত সাবলীলভাবে বয়ে নিয়ে এল ওদের। দুটো বোটের দূরত্ব এখন মাত্র দশ গজ।

শব্দটা আবার ভেসে এল, এবার সম্মিলিত কণ্ঠে: 'হাও-হাহ্‌-হাহ্‌-হাহ্‌'।

হাতের বৈঠা খাড়াভাবে পানিতে ডোবাল কয়কয়। নদীর তলায় ডগাটা ঠেকল। বৈঠা তুলে ফেলল সে, মাত্র তিন ফুট ভিজেছে। 'গভীর নয়,' মাথা নেড়ে বলল সে।

'গভীর না হওয়া খারাপ?' জানতে চাইল সিসিলিয়া।

'লোকে তো খারাপই বলে।'

পরবর্তী বাঁকে পৌঁছাল ওরা। তীরের কাছাকাছি ছয় কী সাতটা আধডোবা কালো পাথর দেখল সিসিলিয়া, চাঁদের আলোয় চকচক করছে। হঠাৎ 'পাথরগুলোর' একটা সবেগে উঁচু হলো। প্রকাণ্ড একটা প্রাণীকে অগভীর পানি থেকে পুরোপুরি সিধে হতে দেখছে সে। বেঁটে আর মোটা চারটে পা পানিতে আলোড়ন তুলল, রানার বোট লক্ষ্য করে ছুটছে জলহস্তীটা।

হামলা হতে যাচ্ছে দেখে একটা ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার ছুঁড়ল রানা। চোখ-ধাঁধানো সাদা আলোয় প্রকাণ্ড একটা হাঁ করা মুখ দেখতে পেল সিসিলিয়া, ভিতরে চকচক করছে বিরাট চারটে দাঁত, গর্জে উঠবার সময় মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিয়েছে। পরমুহূর্তে ম্লান হলদেটে গ্যাসের মেঘ ঢেকে ফেলল ওটাকে। বাতাসের সঙ্গে সরে এল গ্যাস, ওদের চোখে লাগায় জ্বালা করছে।

'রানা টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে,' বলল সিসিলিয়া।

ঘন ঘন বৈঠা চালিয়ে সামনের বোট ইতোমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ব্যথা পেয়ে হুংকার ছাড়ল ষাঁড়টা, পানিতে ডুব দিয়ে চোখের

আড়ালে চলে গেল।

দ্বিতীয় বোটের আরোহীরা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে, তারই ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল শান্ত জলাশয়টা এগিয়ে আসছে।

মাথার উপর এখনও জ্বলছে ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার, নেমে আসছে ধীরে ধীরে।

'ওটা বোধহয় ভয় পেয়ে পালিয়েছে,' বলল সিসিলিয়া। কুৎসিত জন্তুটাকে কোথাও ওরা দেখতে পাচ্ছে না। বোট সাবলীল ভঙ্গিতে ভেসে চলেছে।

তারপর অকস্মাৎ বোটের সামনের অংশ উঁচু হলো, সেই সঙ্গে শোনা গেল জলহস্তীর কান-ফাটানো আর রক্ত-হিম-করা গর্জন। পিছন দিকে কাত হলো কয়কয়, শটগানের গুলি আকাশের দিকে ছুটল।

সিসিলিয়ার গলা চিরে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার বেরুচ্ছে।

প্রায় খাড়া বোট আবার নেমে এল পানিতে। কিনারা থেকে লাফিয়ে পানি উঠছে ভিতরে। দু'হাত দিয়ে শৈলীকে জড়িয়ে ধরতে যাবে আনন্দ, এই সময় হাতখানেক দূরে বিশাল একটা গুহার প্রবেশপথের মত জলহস্তীর হাঁ করা মুখ দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে গেল। ওটার গরম নিঃশ্বাস তাকে যেন পুড়িয়ে দেবে।

সিসিলিয়ার চিৎকার থামছে না।

ঝপাৎ করে কে যেন ঝাঁপ দিল পানিতে।

রানা! হাতের শটগান পানির উপর তুলে এগোচ্ছে ও। ট্রিগার টানতে চায় জলহস্তীর আরও কাছাকাছি পৌঁছে, ওর বোটের কেউ যাতে আহত না হয়।

পিছন থেকে জানোয়ারটার নিতম্বে খোঁচা দিল রানা।

ফুয়াদ হায় হায় করে উঠল, 'সার, পিছু হটুন! সার, প্লিজ, সরে আসুন...'

শটগানের মাজল দিয়ে আবার জলহস্তীর গায়ে গুঁতো মারল রানা, এবার পেটে।

বিরাট হাঁ করল ষাঁড়টা, ঘুরল রানার দিকে।

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ট্রিগার টানল রানা। গ্যাস সেল জলহস্তীর মুখের উপর বিস্ফোরিত হলো।

মাংসের পাহাড় থেকে বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। কাত হয়ে পড়ে গেল ওটা, ডুবে গেল আবার।

রাবারের দ্বিতীয় বোট ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। ফলে বাতাস বেরিয়ে চুপসে যাচ্ছে সেটা। সিসিলিয়া আর আনন্দ ছেঁড়া অংশে হাত চাপা দিয়ে বাতাস আটকাবার চেষ্টা করছে।

এই সময় আবার আহত জলহস্তী ওদের পিছনে মাথা তুলল। অগভীর পানির উপর দিয়ে সগর্জনে ছুটে আসছে ওটা।

কারও খেয়াল নেই বোট থেকে কখন পড়ে গেছে কয়কয়। সাঁতার কেটে বোটের কাছে ফিরে আসছে সে, হাতের অস্ত্র কোথায় ফেলে দিয়েছে নিজেও জানে না। তাকে দেখতে পেয়ে উল্টো দিকে সাঁতরাচ্ছে রানা।

কালো পানিতে ওকে চিনতে পেরে সিসিলিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'ওদিকে কী? এই, শোনো, আমরা ডুবে যাচ্ছি!'

কয়কয় পাশ কাটাচ্ছে, রানা তাকে বলল, 'বোটটা ধরো। বাঁক ঘোরার পর দেখেশুনে তীরে ভেড়াও।'

পিছন থেকে বোট ঠেলে সামনের বাঁকটা ঘুরছে কয়কয়।

অগভীর পানিতে দাঁড়িয়ে আবার জলহস্তীকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টানল রানা। গ্যাসের মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

দ্বিতীয় বোটের পিছু নিয়ে বাঁক ঘুরছে রানা। গ্যাস সরে গেল, কিন্তু জলহস্তীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার পানিতে পড়ে নিভে গেল। চারদিক এখন আবার অন্ধকার।

বাঁক ঘুরবার পরই ডুবে গেল দ্বিতীয় বোট। বোট যখন ডুবছে, শৈলীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল আনন্দ। সিসিলিয়াও তাকে সাহায্য করছে। দেখা গেল হাঁটু সমান পানিতে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

জোডিয়্যাক বোটটাকে টেনে অন্ধকার পাড়ে নিয়ে এল রানা। বৈঠা চালিয়ে ফুয়াদও চলে এল। তার প্রশ্নের উত্তরে রানা বলল, নতুন একটা বোট ফুলিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা হবে ওরা। তবে বিশ্রামের জন্য আরও পাঁচ মিনিট বরাদ্দ করল ও।

নদীর পাড়ে, চাঁদের আলোয়, শুয়ে পড়ল ওরা; হাত ঝাপটা দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে।

বারো

বিশ্রামে বাদ সাধল গ্রাউন্ড-টু-এয়ার রকেট ছুটে যাওয়ার তীক্ষ্ণ আওয়াজ, ওদের মাথার উপর আকাশে বিস্ফোরিত হলো। প্রতিটি বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে নদীর তীর উজ্জ্বল লাল হয়ে উঠছে, তৈরি হচ্ছে লম্বা লম্বা ছায়া, তারপর আবার চারদিক ঢাকা পড়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

'কী ব্যাপার, ফুয়াদ?' জানতে চাইল রানা।

'জেনারেল পাকুড় মোয়ানার সৈন্যরা মাটি থেকে রকেট ছুঁড়ছে, সার,' বলল ফুয়াদ, রানার প্যাক খুলে ফিল্ড গ্লাস খুঁজছে সে-ও।

'কিন্তু টার্গেট?' জিজ্ঞেস করল রানা, আকাশের দিকে চোখ।

'কী জানি, সার। ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ইতোমধ্যে ঘুম ভেঙেছে শৈলীর। আনন্দর হাত ছুঁলো ও। তারপর সংকেত দিল: 'পাখি আসে।'

কিন্তু ওরা কেউ কোন হেলিকপ্টার বা প্লেনের আওয়াজ পাচ্ছে না। আকাশে শুধু রকেট বিস্ফোরিত হচ্ছে।

'তোর কী মনে হয়, ও কিছু শুনতে পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওর শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রখর,' বলল আনন্দ।

তারপরই একটা প্লেনের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। দ্রুত জোরাল হচ্ছে। একটু পরই দক্ষিণ দিক থেকে আসতে দেখল ওরা প্লেনটাকে। এখন আরও ঘন ঘন বিস্ফোরিত হচ্ছে রকেটগুলো। লালচে-হলুদ বিস্ফোরণগুলোকে এড়িয়ে, দিক বদলে আর মোচড় খেয়ে পালাবার চেষ্টা করছে পাইলট। উজ্জ্বল রঙিন আলোয় প্লেনের শরীর চকচক করে উঠছে।

'ব্যাটারা সময় বাঁচানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, সার!' সবিস্ময়ে বলল ফুয়াদ, তার চোখেও এখন ফিল্ড গ্লাস দেখা যাচ্ছে।

'তুমি বলতে চাইছ, ওটা ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়ামের প্লেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'লেজের দিকে তাকান, সার,' বলল ফুয়াদ। 'C-130 ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন–জাপানি মার্কিংস পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে।'

'কনসর্টিয়ামের বেস ক্যাম্পের জন্যে সাপ্লাই প্লেন?'

'জী, সার–যদি সারভাইভ করতে পারে আর কি।'

প্লেনটাকে এখনও ওরা ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে দ্রুত কাত হতে দেখছে, আঁকাবাঁকা একটা কোর্স ধরে আগুনের গোলাগুলোকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে পাইলট।

এক মিনিট পর উত্তর আকাশ ধরে অনেক দূরে চলে গেল প্লেনটা, সর্বশেষ মিসাইলটা ওটার পিছু নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। তারপর জঙ্গলের মাথার উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্লেন। খানিক পর মিসাইল বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল।

'বোধহয় পার পেয়ে গেছে,' বলল ফুয়াদ, বোটের উপর সিধে হলো। 'আমাদেরও বিশ্রামের সময় শেষ, এবার রওনা হতে হয়।' সোয়াহিলি ভাষায় কয়কয়কে তাগাদা দিল, সে যেন তার লোকজনকে আবার নদীর পথ ধরতে বলে।

আনন্দ থরথর করে কাঁপছে দেখে তার গায়ের পারকার চেইন গলা পর্যন্ত টেনে দিল রানা। ওরা অপেক্ষা করছে কখন শিলাবৃষ্টি থামবে।

মাউন্ট মুকেনকোর পাইনশোভিত ঢাল এটা, সমতল রেইন ফরেস্ট থেকে প্রায় আট হাজার ফুট উপরে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে এক ঝাঁক গাছের নীচে। সময় সকাল দশটা। এয়ার টেমপারেচার ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

রাগোরা নদীকে ওরা পাঁচ ঘণ্টা হলো পিছনে ফেলে এসেছে। সেই ভোর থেকে কুয়াশা ঢাকা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা, শিলাবৃষ্টি শুরু হওয়ায় থামতে বাধ্য হয়েছে।

রানা আর আনন্দর মাঝখানে রয়েছে শৈলী। গলফবল আকৃতির

বরফের টুকরো ঘাসের উপর পড়ে গড়াচ্ছে দেখে সংকেত দিল: 'নাম কী?'

'শিলা।'

'আনন্দ এ-সব বন্ধ করুক।'

'পারলে খুশি হতাম, শৈলী।'

কয়েক সেকেন্ড পর আবার সংকেত: 'শৈলী বাড়ি ফিরতে চায়।'

'এখনই আমাদের বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়, শৈলী।'

'শৈলী লক্ষ্মী গরিলা। আনন্দ শৈলীকে বাড়ি নিয়ে যাবে।'

আসলে শৈলী একা নয়, অভিযাত্রী দলের সবাই রেইন ফরেস্টের ভ্যাপসা গরম আর মাছির উপদ্রব থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করছিল; কিন্তু ঢাল বেয়ে মুকেনকোয় উঠতে শুরু করবার পর ওদের উৎসাহে ভাটা পড়েছে।

'দেখো কেমন ভাগ্য,' বলল সিসিলিয়া। 'জলহস্তীর খপ্পর থেকে বেঁচে শিলাবৃষ্টির মধ্যে পড়েছি।'

যেন তার কথায় বিব্রত হয়েই শিলাবৃষ্টি থেমে গেল।

'তৈরি হও সবাই,' বলল রানা। 'এখনই রওনা হব।'

নয় হাজার ফুট ছাড়িয়ে এল ওরা। পাইন জঙ্গল পিছিয়ে পড়েছে। পায়ের নীচে কুয়াশা ঢাকা ঘাস, একটা মাঠ পেরুচ্ছে। বাতাসে অক্সিজেনের অভাব, খানিক পরপর বিশ্রাম নিতে হচ্ছে।

দশ হাজার ফুট উঠল দল। ঘাস অদৃশ্য হলো। জমিনে শুকনো শিকড় আর শ্যাওলা ছাড়া কিছু নেই। ওদের সামনে হঠাৎ করে ধূসর কুয়াশার ভিতর থেকে একটা নিঃসঙ্গ লোবিলিয়া গাছ বেরিয়ে এল।

দশ হাজার ফুট আর চূড়ার মাঝখানে আসলে কোন আড়াল বা আশ্রয় নেই। সেজন্যই দলটাকে প্রায় খেদিয়ে উপরে তুলছে রানা–চায় না চূড়ার কাছাকাছি ফাঁকা ঢালে ঝড়ের মধ্যে পড়ুক টিম।

এগারো হাজার ফুট পেরুচ্ছে ওরা, এই সময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সূর্য। সঙ্গে সঙ্গে থামবার নির্দেশ দিল রানা, কারণ ভিআরএমসি-র লেযার-ফিক্স সিস্টেমের দ্বিতীয় ডিরেকশন্যাল লেযারটার পজিশন সেট করতে হবে। এরই মধ্যে, আজ সকালে, কয়েক মাইল দক্ষিণে প্রথমটা সেট করা হয়েছে। তখন সময় লেগেছিল

ত্রিশ মিনিট।

দ্বিতীয় লেযার সেট করতে ঝামেলা একটু বেশি হবে, কেননা প্রথমটার সঙ্গে ওটা খাপ খাওয়া চাই। ইলেকট্রনিক জ্যাম থাকা সত্ত্বেও, ট্র্যান্সমিটিং ইকুইপমেন্ট ওয়াশিংটন হেড অফিসের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে, যাতে করে খুদে লেযার নিখুঁতভাবে লক্ষ্যস্থির করতে পারে। আকারে ঠিক একটা পেনসিল ইরেজার, ওটা ইস্পাতের খুদে তেপায়ার মাথায় বসানো। আগ্নেয়গিরিতে লেযার দুটো এমন পজিশনে সেট করা হচ্ছে, দুটোর বিম যাতে বহু মাইল দূরে পরস্পরকে ভেদ করে যায়–বনভূমির মাথায়। আর, রানার হিসাব যদি নির্ভুল হয়, পরস্পরকে ক্রস করবার বিন্দুটা হবে জিঞ্জ শহরের সরাসরি উপরে।

*

খানিক পরেই গন্ধক-এর ঝাঁঝ মেশানো আগ্নেয় বাষ্পের গন্ধ পেল ওরা, দেড় হাজার ফুট উপরের চূড়া থেকে নেমে আসছে। এতটা উঁচুতে গাছ, ঘাস বা এমনকী শ্যাওলাও জন্মায়নি। চারদিকে শুধু নগ্ন পাথর, তবে এখানে-সেখানে কিছু বরফ দেখা যাচ্ছে, গন্ধকের প্রভাবে হলদেটে।

আকাশ স্বচ্ছ নীল। দৃষ্টি পথে চোখ-জুড়ানো সৌন্দর্য মেলে ধরেছে সাউথ ভিরুঙ্গা রেঞ্জ–গাঢ় সবুজ কঙ্গো বনভূমি থেকে খাড়াভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে মোচাকৃতি নাইরাগেনিগা; তার সামনে মুকেনকোর আরেক চূড়া, কুয়াশার চাদরে মোড়া।

শেষ এক হাজার ফুট সবচেয়ে দুর্গম, বিশেষ করে শৈলীর জন্য। চোখা লাভা পাথরের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে হচ্ছে ওকে। বারো হাজার ফুটের পর জমিন আলগা আগ্নেয়শিলার সমষ্টি।

একটুকরো রাবার কেটে শৈলীর জন্য এক জোড়া স্যান্ডেল তৈরি করল রানা। 'ভাল বন্ধু,' বলে ওর গালে চুমো দিল শৈলী।

ওরা চূড়ায় উঠল বিকেল পাঁচটায়। সামনে আট মাইল চওড়া লাভা লেক আর আগ্নেয়গিরির ধূমায়িত জ্বালামুখ।

কালো পাথর আর ধূসর বাষ্পের মেঘ দেখে সিসিলিয়া একাধারে শঙ্কিত এবং রোমাঞ্চিত। শঙ্কিত এই ভেবে যে হঠাৎ যদি এখন মুকেনকো উদ্গিরণ শুরু করে, নির্ঘাত ওরা মারা যাবে সবাই: আর এই

ভয়টাই রোমাঞ্চিত করছে তাকে, কারণ জানে বিনা নোটিশে সাধারণত বিস্ফোরণ ঘটে না, সভ্য দুনিয়ায় ফিরে গল্পটা শোনাবার একটা সুযোগ বোধহয় পাবে সে।

'রাতটা আমরা এখানে কাটাব,' বলল রানা।

সে-রাতে লেকের বহু জায়গায় টকটকে লাল হয়ে টগবগ করে ফুটতে দেখা গেল লাভাকে। হিসহিসে লাল বাষ্প আকাশের দিকে উঠে যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে রঙ হারাচ্ছে। জ্বালামুখের কিনারায় ওদের ছোট আকৃতির চৌকো তাঁবুগুলো লাভার আভায় লালচে হয়ে রয়েছে।

পশ্চিমে ছড়ানো মেঘগুলোয় জোছনা লাগায় রুপালি দেখাচ্ছে। ওগুলোর নীচে মাইলের পর মাইল কঙ্গো রেইন ফরেস্ট। সরলরেখার মত লেযার বিম দুটো দেখতে পাচ্ছে ওরা, কালো বনভূমির মাথায় পরস্পরকে ভেদ করে গেছে। ভাগ্য বিরূপ না হলে কাল ওরা ওই সংযোগ বিন্দুর নীচে পৌঁছাবে।

জানে ইউরো-জাপানিজ কনসর্টিয়াম জ্যাম করে রেখেছে, তারপরও একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ভিআরএমসি-র হেড অফিস ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছে রানা। আজ রাতেও ট্র্যান্সমিটিং ইকুইপমেন্ট বের করে প্রস্তুতি নিল। ওকে বিস্মিত করে দিয়ে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি সিসিলিয়ার অফিসের সঙ্গে লাইন পাওয়া গেল।

'সর্বনাশ হয়েছে,' বলে নিজের কপালে একটা চাপড় মারল ফুয়াদ, এতক্ষণ মন দিয়ে রানার কাজ দেখছিল সে।

'কেন, কী হলো?' ছুটে এসে জানতে চাইল সিসিলিয়া।

'কনসর্টিয়াম আর জ্যাম করছে না,' ভারী গলায় বলল ফুয়াদ।

'জ্যাম করছে না…এটা তো সুখবর!' বলল আনন্দ।

'না।' মাথা নাড়ছে রানা। 'সুখবর নয়। জ্যাম তুলে নেয়ার মানে হলো নিশ্চয়ই ওরা সাইটে পৌঁছে গেছে।'

'ওহ্, গড্! হীরের খনি সব এখন ওদের দখলে!'

ভিডিও স্ক্রিন অ্যাডজাস্ট করল রানা। বড় আকারের হরফগুলো আরও পরিষ্কারভাবে ফুটল:

'পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক। আর কোন ঝুঁকি নেয়ার মানে হয় না।

আমাদের হিসাবে, কনসর্টিয়াম জিঞ্জ সাইটে পৌঁছে গেছে।'

'এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলল সিসিলিয়া। হতচকিত, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। 'তা হলে সব শেষ হয়ে গেল?'

আনন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমার পা ব্যথা করছে।'

'আমি ক্লান্ত,' বলল ফুয়াদ, কুঁজো দেখাচ্ছে তাকে।

'মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে,' বিড়বিড় করল রানা, মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে।

অবসাদে কাহিল, ভাঙা মন নিয়ে শুতে গেল ওরা।

২০ জুনে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাল সবাই। ধীরে-সুস্থে মুখ-হাত ধুয়ে অলস ভঙ্গিতে ব্রেকফাস্ট সারল। তারপর গায়ে রোদ মেখে শৈলীর সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলাধুলো চলল। সবাই ওর প্রতি অপ্রত্যাশিত মনোযোগ দিচ্ছে দেখে শৈলী ভারী খুশি। মুকেনকোর ঢাল বেয়ে জঙ্গলের দিকে ওরা নামতে শুরু করল সকাল দশটারও পর।

মুকেনকোর পশ্চিম ঢালগুলো খুব বেশি খাড়া আর অগম্য হওয়ায়, ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ টপকে ভিতর দিকে আধ মাইল নামল ওরা। পথ দেখাচ্ছে ফুয়াদ।

শৈলী আতঙ্কিত, আগ্নেয়গিরির ভিতরের খোলসে পথ করে নেওয়ায় মানুষগুলোকে পাগল বলছে। শৈলী ভুল বলছে কী না, নিশ্চিত নয় আনন্দ।

লাভা লেকের দিকে এগোবার সময় উত্তাপ তীব্র হয়ে উঠল। ঝাঁঝাল বাষ্প লাগায় চোখ আর নাক জ্বালা করছে। পুরু, ভারী আর কালো ত্বকের নীচে ফুটছে লাভা, ডুপ-ডাপ শব্দ হচ্ছে।

নারাগেমা নামে আশ্চর্য একটা কাঠামোর কাছে পৌঁছাল ওরা। নারাগেমা মানে শয়তানের চোখ। প্রকৃতির তৈরি একটা খিলান, একশো পঞ্চাশ ফুট উঁচু। ভিতর দিকটা এত বেশি মসৃণ, যেন পালিশ করা হয়েছে। খিলানটার ভিতর দিয়ে তাজা বাতাস বইছে। জায়গাটায় পৌঁছে নীচের বনভূমি দেখতে পেল রানা।

এখানে থামবার নির্দেশ দিল ও। তারপর ফুয়াদকে পাশে নিয়ে খিলানের ভিতর দিকটা পরীক্ষা করল।

এটা আসলে আগের কোন উদ্গিরণের ফলে তৈরি একটা লাভা টিউব, টিউবের মূল শরীর ভেঙে বা গলে গেছে, রয়ে গেছে শুধু সরু খিলানটুকু।

'এটাকে শয়তানের চোখ বলার কারণ আছে,' জানাল ফুয়াদ। 'আগ্নেয়গিরিতে যখন উদ্‌গীরণ হয়, নীচ থেকে লাল একটা চোখের মত জ্বল্‌জ্বলে দেখায় ওটাকে।'

শয়তানের চোখকে পিছনে ফেলে পাইন বনে ঢুকল ওরা। তারপর জমাট বাঁধা লাভা স্রোতের উপর দিয়ে নামতে হলো। ওদের সামনে পোড়া মাটি আর কালো কালো গর্ত পড়ল, গর্তগুলো পাঁচ থেকে সাত ফুট গভীর। ফুয়াদ ধারণা করল, জায়ার সৈন্যরা এই মাঠকে মর্টার প্র্যাকটিসের জন্য ব্যবহার করেছে। কিন্তু রানা তার সঙ্গে একমত হতে পারল না।

কাছ থেকে ভাল করে দেখল ওরা। প্রতিটি গর্ত থেকে শুঁড়ের মত গভীর দাগ বেরিয়েছে বাইরের দিকে। এ-ধরনের কিছু আগে কখনও কেউই দেখেনি ওরা।

অ্যান্টেনা খুলল রানা, কমপিউটারের সঙ্গে সংযোগ দিয়ে ওয়াশিংটনকে ডাকল।

দলের লোকজন প্রায় সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে।

ছোট্ট স্ক্রিনে মেসেজ আসছে, পড়ায় ব্যস্ত রানা।

'ওদেরকে আপনি কী জিজ্ঞেস করছেন, সার?' জানতে চাইল ফুয়াদ।

'মুকেনকো শেষ কবে জাগে, স্থানীয় আবহাওয়া, এইসব।'

'কী বলছে ওরা?'

'শেষবার উদ্গিরণ হয়েছিল মার্চে,' বলল রানা, তারপর গলা একটু চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই আনন্দ, ড্ক্টর মেরিনা কে?'

'আমাদের "প্রজেক্ট শৈলী"-র অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চার। কেন?' হেঁটে এসে রানার পিছনে দাঁড়াল সে।

'তোর জন্যে একটা মেসেজ আছে,' বলল রানা, হাত তুলে স্ক্রিন দেখাল। 'সিসিলিয়ার ওয়াশিংটন অফিসে পাঠিয়েছেন ডক্টর মেরিনা, ওরা সেটা জানাচ্ছে তোকে।'

ইংরেজি হরফে সংক্ষেপ করে লেখা মেসেজ পড়তে সমস্যা হচ্ছে আনন্দর, সময় একটু বেশি লাগল: 'ভিআরএমসি-র অফিস থেকে সংগ্রহ করে মূল টেপটা দেখেছি। শ্রবণযোগ্য সংকেত সম্পর্কে নতুন তথ্য পেয়েছি। কমপিউটারের বিশ্লেষণ করা শেষ। ওটা ভাষা।'

একটা ঢোক গিলে আনন্দ শুধু উচ্চারণ করতে পারল, 'ভাষা?'

'তুই তোর অফিসকে সিসিলিয়াদের মূল কঙ্গো টেপটা রিভিউ করতে বলেছিলি না?'

'হ্যাঁ, তা বলেছিলাম,' রানার প্রশ্নের উত্তরে বলল আনন্দ। 'কিন্তু স্ক্রিনে যে পশুটা দেখা গেছে সেটার ভিজুয়াল আইডেনটিফিকেশন-এর জন্যে বলেছিলাম, মুখের শব্দ বা শ্রবণযোগ্য ভাষা সম্পর্কে আমি কোন তথ্য সংগ্রহ করতে বলিনি।' ব্যাপারটা বোধগম্য না হওয়ায় মাথা নাড়ল সে। 'মেরিনার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত।'

'বল, যদি তাঁর ঘুম ভাঙাতে আপত্তি না থাকে।' ইন্টারলক বাটনে চাপ দিল রানা।

পনেরো মিনিট পর আনন্দ টাইপ করল, 'হাই, মেরিনা, কেমন আছো?'

সিসিলিয়া বলল, 'আমরা সাধারণত স্যাটেলাইট টাইম এভাবে নষ্ট করি না। তবে এটা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বেরিয়ে আসবে বলে মনে হচ্ছে।'

স্ক্রিনে ডক্টর মেরিনার জবাব লেখা হলো: 'ঘুমে ঢুলছি। আপনি কোথায়?'

আনন্দ টাইপ করল, 'ভিরুঙ্গায়। আপনার মেসেজ পেয়েছি। মৌখিক ভাষা সম্পর্কে কী বলতে চাইছেন ব্যাখ্যা করুন।'

'দৈবাৎ আবিষ্কার করেছি। সাংঘাতিক ইন্টারেস্টিং। টেপে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ,–ব্রিদিং সাউন্ডস–পাওয়া গেছে। কমপিউটার অ্যানালিসিসে দেখা যাচ্ছে ওগুলোর বৈশিষ্ট্য মৌখিক ভাষার সঙ্গে অনেকটাই মেলে।'

'কী বৈশিষ্ট্য? ব্যাখ্যা করুন।'

এরপর ডক্টর মেরিনার জবাব টেকনিক্যাল আর কিছুটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। 'রিপিটিং এলিমেন্টস্ স্টাডি করে, এলোমেলো প্যাটার্ন

বিশ্লেষণ করে শব্দগুলোর যে পারস্পরিক সম্পর্ক আর গঠন রীতি পাওয়া গেছে তাকে সম্ভবত ভাষা না বলে উপায় নেই।'

'আপনি অনুবাদ করতে পারছেন?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'এখনও পারিনি।'

'কেন?'

'শ্রবণযোগ্য, দুর্বোধ্য ভাষা সম্পর্কে কমপিউটারের কাছে যথেষ্ট তথ্য নেই। আমি অবশ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছি। দেখি কাল হয়তো আরও কিছু জানাতে পারব।'

'সত্যি আপনার ধারণা আওয়াজগুলো গরিলার ভাষা?'

'হ্যাঁ, আদৌ যদি ওগুলো গরিলা হয়।'

'মাই গড!' বোতাম টিপে স্যাটেলাইট ট্র্যান্সমিশন বন্ধ করে দিল আনন্দ। তবে ডক্টর মেরিনার সর্বশেষ মেসেজটা স্ক্রিনে রয়েই গেল। উজ্জ্বল সবুজ হরফগুলো জ্বলজ্বল করছে:

'হ্যাঁ, আদৌ যদি ওগুলো গরিলা হয়।'

তেরো

এরকম একটা অপ্রত্যাশিত খবর পাওয়ার পর দু'ঘণ্টাও পার হয়নি, গরিলাদের প্রথম দলটার সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল।

ইতোমধ্যে আবার কঙ্গোর রেইন ফরেস্টে নেমে এসেছে টিম। সরাসরি অকুস্থলের দিকে যাচ্ছে ওরা, মাথার উপর ঝুলে থাকা লেযার বিম অনুসরণ করে।

বিমটা ওরা সরাসরি দেখতে পাচ্ছে না। সিসিলিয়া সঙ্গে করে একটা অদ্ভুতদর্শন অপটিক্যাল ট্র্যাক গাইড নিয়ে এসেছে, সেটার সাহায্য নিচ্ছে রানা।

ওটা একটা ক্যাডমিয়াম ফটোসেল, স্পেসিফিক লেযার ওয়েভলেংথ রেকর্ড করতে পারে। দিনের বেলা নির্দিষ্ট সময় পরপর হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে একটা করে বেলুন ফোলায় রানা, ওটার সঙ্গে তার দিয়ে ট্র্যাক গাইডটা আটকায়, তারপর বেলুনের সঙ্গে ওড়ায়।

হিলিয়াম ট্র্যাক গাইডটাকে গাছপালার উপর আকাশে তোলে। ওখানে পাক খায় ওটা, সাইটে ধরা পড়ে লেযার বিমের একটা, সঙ্গে সঙ্গে তার-এর মাধ্যমে কোঅর্ডিনেটগুলো কমপিউটারে পাঠিয়ে দেয়। একটা মাত্র বিম থেকে পাওয়া দুর্বল হয়ে আসা লেযার ইনটেনসিটি অনুসরণ করে ওরা, অপেক্ষায় থাকে 'ব্লিপ রিডিং'-এর। কমপিউটার ব্লিপ রিডিং দেবে লেযার ইনটেনসিটি দ্বিগুণ হলে। লেযার ইনটেনসিটি দ্বিগুণ হবে সেখানেই, যেখানে দুটো লেযার পরস্পরকে ছুঁয়ে গেছে।

কাজটায় সময় লাগে, ফলে ধৈর্য হারালে চলে না। দুপুরের দিকটায় সবার মেজাজই বেশ ভেতো হয়ে আছে, এই সময় গরিলার বিষ্ঠা দেখে চিনতে পারল আনন্দ ওগুলো তিন দফায় ত্যাগ করা বা তিন প্রস্থে ভাগ করা হলেও, পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। তা ছাড়া, মাটি আর গাছে গরিলাদের বাসাও দেখল ওরা–ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা দিয়ে বানানো।

পনেরো মিনিট পর কান ফাটানো গর্জনে বিস্ফোরিত হলো বাতাস। 'গরিলা,' ঘোষণা করল ওদের গাইড। 'একটা পুরুষ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলছে।'

শৈলী সংকেত দিল: 'গরিলা বলছে ভাগো।'

'কিন্তু আমাদের তো আরও সামনে যেতে হবে, শৈলী।'

'গরিলা মানুষজনের এদিকে আসা পছন্দ করছে না।'

'মানুষজন গরিলাদের কোন ক্ষতি করবে না,' আনন্দ তাকে আশ্বস্ত করল। কিন্তু তার কথা শুনে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শৈলী, তারপর মাথা নাড়ল, আনন্দ যেন তার বক্তব্য ধরতে পারেনি।

শৈলীর শব্দ-ভাণ্ডার সীমিত হওয়ায় সে তার বক্তব্য আরও পরিষ্কার করে আনন্দকে জানাতে পারল না।

শৈলী আসলে বলতে চাইছে না যে গরিলারা ভয় পাচ্ছে মানুষ তাদের ক্ষতি করবে। ও বলতে চাইছে, গরিলারা ভয় পাচ্ছে মানুষের

ক্ষতি হবে–জিনিসদের দ্বারা।

জঙ্গলের ভিতর ছোট একটা ফাঁকা জায়গা। মাত্র অর্ধেকটা পেরিয়েছে ওরা, এই সময় একটা পুরুষ গরিলা ঝোপ-ঝাড়ের উপর মাথা তুলে ওদের উদ্দেশে হুংকার ছাড়ল।

পোর্টারদের একজন তার বোঝা নিয়ে সমস্যায় পড়েছে, কয়কয় আর ফুয়াদ তাকে সাহায্য করতে পিছন দিকে গেছে, টিমকে পথ দেখাচ্ছিল রানা। ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় ছয়টা গরিলা দেখল ও–সবুজের মাঝখানে ঘন কালো, ওদের দিকে লাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। মেয়েগুলোর প্রায় সবক'টাই গ্রাহ্য না করবার ভাব ফুটিয়ে তুলবার জন্য মাথা একদিকে কাত করে ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে রেখেছে। কর্তা গরিলা আবার গর্জে উঠল।

বিরাট শরীর তার। প্রকাণ্ড মাথা মাটি থেকে ছ'ফুটেরও বেশি উপরে উঠে এসেছে, আর ড্রাম আকৃতির বুক দেখে আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না ওজন হবে একশো সত্তর কেজির বেশি তো কম নয়। তবে রানা নিশ্চিত যে ভিআরএমসি-র প্রথম ফিল্ড পার্টিকে এই গরিলারা আক্রমণ করেনি, কারণ তাদের পশম ছিল ধূসর, প্রায় সাদা; আর এগুলোর লোম কালো।

রানার কাঁধের পিছন থেকে ফিসফিস করল সিসিলিয়া। 'এখন কী হবে?'

'নোড়ো না,' নির্দেশ দিল রানা।

প্রকাণ্ড পুরুষটা নিচু হয়ে চার হাত-পায়ে ভর দিল। গলা থেকে নরম হো-হো-হো আওয়াজ বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে বাড়ছে সেটা তারপর আবার এক লাফে সিধে হলো, হাতে মুঠো ভর্তি ঘাস।

হাতের ঘাস শূন্যে ছুঁড়ে দিল গরিলা, তারপর চ্যাপ্টা তালু দিয়ে নিজের বুকে আঘাত করল, আওয়াজ উঠল ফাঁপা দুম দুম।

'সর্বনাশ!' সিসিলিয়ার পিছন থেকে গুঙিয়ে উঠল আনন্দ।

বুক চাপড়ানো পাঁচ সেকেন্ড চলল, তারপর পুরুষটা আবার চার হাত-পা মাটিতে নামাল। ঘাসের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে ছুটল সে, হাত দিয়ে ঝোপ-ঝাড় চাপড়াচ্ছে, শব্দ করছে যত বেশি পারা যায়–উদ্দেশ্য ভয় দেখিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের ভাগানো। তারপর

আবার সেই হো-হো-হো শুরু করল।

পুরুষটা রানার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না। আশা করছে তার হুমকি-ধামকিতে ভয় পেয়ে ছুট দেবে ও। সেরকম কিছু যখন ঘটল না, আবার লাফ দিয়ে খাড়া হলো সে, আরও জোরে বাড়ি মারল নিজের বুকে, প্রচণ্ড রাগে বনভূমি কাঁপিয়ে গর্জন ছাড়ল।

এরপর আর সময় দিল না, হামলা করে বসল।

বিকট গর্জন ছেড়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ছুটে এল গরিলা। ছুটে এল সোজা রানাকে লক্ষ্য করে।

রানা শুনতে পেল ওর পিছনে আঁতকে উঠল সিসিলিয়া। ঘুরে খিচে দৌড় দেওয়ার প্রচণ্ড একটা ঝোঁক চাপল ওর মনে। গোটা অস্তিত্ব যেন ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে বলছে—পালাও! পালাও! পালাও! কিন্তু নিজেকে রানা ওই জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল—বাধ্য করল চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে।

গরিলাটাকে রানা দেখতে পাচ্ছে না। তবে তার ঝড়ের মত ছুটে আসার শব্দ আর গর্জন সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করতে পারছে। কল্পনার চোখে দেখতেও পেল—লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে, দু'পাশে দোল খাচ্ছে লম্বা হাত দুটো।

গরিলা এবার নাক ডাকার মত একটা আওয়াজ করল। রানা ওর পায়ের কাছে বিরাট একটা কালো ছায়া পড়তে দেখল। কিন্তু ছায়াটা সরে না যাওয়া পর্যন্ত মুখ তুলে একবারও তাকাল না।

রানা যখন মুখ তুলল, গরিলাটা তখন পিছু হটে প্রায় ফাঁকা জায়গার কিনারায় পৌঁছে গেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা, ঘুরল, এমনভাবে মাথা চুলকাচ্ছে যেন ধাঁধায় পড়ে গেছে—বুঝতে পারছে না কী কারণে তার ভীতিপ্রদ আচরণ অনুপ্রবেশকারীদের পালাতে বাধ্য করেনি।

ঝুঁকল ওটা, দমাদম কয়েকটা চাপড় মারল মাটিতে, তারপর নিজের সঙ্গীদের নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে। ফাঁকা জায়গাটা নীরব হয়ে গেল।

ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে ঘুরল রানা। ঝট করে হাত দুটো বাড়াল ও, টলছে দেখে ধরে ফেলল সিসিলিয়াকে।

'শোকর আলহামদুলিল্লাহ,' বলল ফুয়াদ, হন-হন করে এগিয়ে আসছে। 'অনেক বড় একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছি আমরা। সার, দেখা যাচ্ছে গরিলাদের সম্পর্কে ভালই ধারণা আছে আপনার।' সিসিলিয়ার হাত চাপড়ে দিল সে। 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ম্যাডাম। বিপদ কেটে গেছে।'

'সবাই যা জানে আমিও তাই জানি,' বলল রানা। 'তুমি না দৌড়ালে ওরা কিছু বলবে না। শুনেছি সাধারণত নিতম্বকে টার্গেট করে, কেউ দৌড়ালে ওখানেই কামড় দেয়।'

রানাকে আঁকড়ে ধরে কয়েক সেকেন্ড ফোঁপাল সিসিলিয়া। স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিল সে। রানা আবিষ্কার করল, এতক্ষণ পর ওর নিজের পা-ও একটু একটু কাঁপছে। সিসিলিয়াকে নিয়ে এক জায়গায় বসতে হলো ওকে।

দেখা গেল কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে আনন্দ। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে বলল, 'খেয়াল করেছিস, বই পুস্তকে যেমনটি লেখা থাকে ঠিক সেরকম আচরণ করে গেল গরিলার দলটা?'

'হ্যাঁ।'

'যে-সব শব্দ করল, ওগুলোকে কোনভাবেই ভাষার পর্যায়ে ফেলা যায় না।'

'না,' সায় দিল রানা, 'যায় না।'

এক ঘণ্টা পর C-130 ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনটাকে বিধ্বস্ত অবস্থায় পেল ওরা। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অ্যারোপ্লেন গোটা কাঠামোসহ জঙ্গলের ভিতর অর্ধেক ডুবে আছে। প্রকাণ্ড নাক আরও প্রকাণ্ড গাছে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেছে। বিশাল টেইল সেকশন মুচড়ে আর পাক খেয়ে মাটির দিকে নেমে এসেছে, বিরাট ডানার তোবড়ানো ছায়া পড়েছে জঙ্গলের মেঝেতে।

ককপিটের উইন্ডশিল্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, ভিতরে লাশ দেখা যাচ্ছে পাইলটের, ঝাঁক ঝাঁক কালো মাছি ওটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। সরে এসে ফিউজিলাজের একটা জানালা দিয়ে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু পারা গেল না। ল্যান্ডিং গিয়ার দুমড়েমুচড়ে ছোট হয়ে

গেলেও, জঙ্গলের মেঝে থেকে অনেক উঁচু হয়ে আছে প্লেনের শরীর।

অনেক কষ্টে ধরাশায়ী একটা গাছে চড়ল কয়কয়, সেখান থেকে একটা ডানায় উঠে জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাল। 'কেউ নেই,' রিপোর্ট করল সে।

'সাপ্লাই?'

'আছে। প্রচুর। বাক্স আর কন্টেইনার।'

সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে ফুয়াদকে নিয়ে এগোল রানা। বিধ্বস্ত টেইল সেকশনের তলা দিয়ে হেঁটে এসে প্লেনের অপর পাশটা পরীক্ষা করল ওরা।

পোর্ট উইং ভাঙাচোরা আর কালো দেখাচ্ছে। ইঞ্জিন নেই। প্লেনটা কেন ক্র্যাশ করেছে বোঝা গেল। জায়ার সৈন্যদের সর্বশেষ মিসাইলটা টার্গেটের নাগাল পেয়ে যায়, পোর্ট উইং-এর বেশিরভাগটাই উড়িয়ে দিয়েছে।

তবে C-130 ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের এই ধ্বংসাবশেষ রানার অত্যন্ত রহস্যময় লাগছে। এর মধ্যে কী যেন একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে।

ভাল করে আবার তাকাল রানা। ফিউজিলাজের পুরোটা দৈর্ঘ্যের উপর চোখ বুলাল, বিধ্বস্ত নাক দেখল, সারি সারি জানালা দেখল, উইং-এর গোড়াকে পাশ কাটিয়ে দৃষ্টি চলে গেল রিয়ার এগজিট ডোরের দিকে...

'সর্বনাশ! ফুয়াদ, জলদি!' ছুটছে রানা, ওকে যেন ভূতে তাড়া করেছে।

বাকি সবার কাছে ফিরে এল ও, ওর পিছু নিয়ে ফুয়াদও। ওরা সবাই একটা টায়ারে বসে আছে, স্টারবোর্ড উইং-এর ছায়ায়। টায়ারটা এত বড় যে ওটায় বসে সিসিলিয়া পা ঝুলিয়ে দিলেও, মাটির নাগাল পাচ্ছে না।

'যাক,' বলল সিসিলিয়া, সন্তুষ্টি চেপে রাখবার প্রয়োজন বোধ করছে না, 'কনসর্টিয়াম এখনও তাদের সাপ্লাই নিয়ে যেতে পারেনি। এখন যদি আমরা সব নিয়ে নিই, কারও কিছু বলবার নেই। ওরা আমাদের অনেক ক্ষতি করবার চেষ্টা করেছে। মাসুদ ভাই!' হঠাৎ রানাকে ছুটে আসতে দেখে আঁতকে উঠল সে। 'কী হয়েছে?'

'হিসেব করে দেখেছ প্লেনটা কখন ক্র্যাশ করেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, তবে জবাবের অপেক্ষায় থাকল না। 'এটাকে আমরা পরশু রাতে দেখেছি। তারমানে পড়ে যাওয়ার পর কম করেও ছত্রিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।'

হিসাবটা মিলাবার জন্য সিসিলিয়াকে সময় দিচ্ছে রানা।

'ছত্রিশ ঘণ্টা?'

'হ্যাঁ। ছত্রিশ ঘণ্টা।'

'অথচ লোকগুলো এখনও তাদের সাপ্লাই নিতে আসেনি...'

'সাপ্লাই নেয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি,' বলল রানা। 'মেইন কার্গো ডোরগুলো দেখো–সামনের আর পিছনের–কেউ ওগুলো খোলার চেষ্টা করেনি। আমি ভাবছি ওরা ফিরে আসেনি কেন?'

বনভূমির গভীর একটা এলাকায় ওদের পায়ের নীচ থেকে মুড়মুড় আর মটমট আওয়াজ উঠে এল। পাম গাছের পাতা একপাশে সরিয়ে চারদিকে শুধু সাদা হাড় দেখতে পেল ওরা।

'কানাইয়ামগুফা,' বলল ফুয়াদ। 'শব্দটার অর্থ...হাড় ভাঙার জায়গা।' পোর্টারদের প্রতিক্রিয়া বুঝবার জন্য দ্রুত তাদের উপর চোখ বুলাল সে। হতভম্ব দেখাচ্ছে তাদের, তবে ভয় পায়নি কেউ। এরা পুব আফ্রিকায় কিকুয়া, রেইন ফরেস্টের প্রান্তসীমায় বসবাসরত গোষ্ঠীগুলোর মত কুসংস্কারে ভোগে না।

সংকেতের সাহায্যে শৈলীকে জিজ্ঞেস করল আনন্দ, 'এটা কোন্ জায়গা?'

'আমরা খারাপ জায়গায় এসেছি।'

'কেমন খারাপ জায়গা?'

শৈলী জবাব দিল না।

'এগুলো হাড়,' বলল ফুয়াদ, মাটির দিকে চোখ।

'হ্যাঁ,' বলল আনন্দ। 'তবে মানুষের নয়। তুই কী বলিস, রানা?'

রানাও মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। শুকনো খটখটে আর সাদা, বিভিন্ন প্রাণীর হাড়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটাও চিনতে পারল না ও।

'রানা? মানুষের হাড়?'

'দেখে মানুষের বলে মনে হচ্ছে না,' অবশেষে বলল রানা, চোখ তুলছে না। খেয়াল করল, বেশিরভাগ হাড়ই ছোটখাট প্রাণীর–পাখি, বানর, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী। কিছু ভাঙা হাড় বড় প্রাণীর, তবে কত বড় প্রাণীর বলা কঠিন। হয়তো বড়সড় বানরের। কিন্তু না, রেইন ফরেস্টে বড় আকৃতির বানর নেই।

শিম্পাঞ্জি? কঙ্গোর এই এলাকায় শিম্পাঞ্জিও নেই।

গরিলার হাড় হতে পারে? একমাত্র আনন্দই ভাল বলতে পারবে। 'আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছিস? তুই কী দেখছিস তাই বল।'

বিরাট ফ্রন্টাল সাইনাস সহ ক্রেইনিয়াম-এর টুকরো দেখতে পাচ্ছে আনন্দ। এ গরিলার ভাঙা খুলি ছাড়া আর কী?

'ডক্টর সেন?' তাগাদা দিল গাইড ফুয়াদ। 'নন-হিউম্যান?'

'অবশ্যই নন-হিউম্যান,' বলল আনন্দ, তবে তার চোখে পলক পড়ছে না। সে ভাবছে: কার এত শক্তি যে একটা গরিলার খুলি ভাঙতে পারে? সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, ব্যাপারটা ঘটেছে মৃত্যুর পর। একটা গরিলা মারা গিয়েছিল, বহু বছর পর ওটার চামড়া আর মাংসহীন সাদা কঙ্কাল কোনভাবে ভাঙা হয়েছে। জীবিত অবস্থায় এ-ধরনের কিছু নিশ্চয়ই ঘটেনি।

'আমারও তাই ধারণা, মানুষের নয়,' বলল ফুয়াদ। 'প্রচুর হাড়, তবে একটাও মানুষের দেখছি না।' আনন্দকে পাশ কাটাবার সময় অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল সে, যেন বলতে চাইছে–মুখ খুলবেন না। 'কয়কয় আর তার লোকেরা জানে এ-সব বিষয়ে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ,' আবার বলল সে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

ফুয়াদের আচরণ সতর্ক করে তুলল আনন্দকে। সে কি বিশেষ কিছু দেখতে পেয়েছে?

এই একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে রানার মনেও। ফুয়াদ অভিজ্ঞ গাইড, আফ্রিকার এমন কোন জঙ্গল নেই যেখানে তার পা পড়েনি। অনেক মৃত্যু দেখেছে সে, দেখেছে বহু কঙ্কাল। কাজেই মানুষের হাড় তার চিনতে পারবার কথা।

মাটিতে পড়ে থাকা বাঁকা একটা হাড়ের উপর স্থির হলো রানার দৃষ্টি। দেখে মনে হয় টার্কি-র উইশবোন--ব্রেস্টবোন-এর উপর ভি

আকৃতির এই হাড় প্রায় সব পাখিরই থাকে। তবে এটার আকার আরও অনেক বড আর চওড়া, কালের আঁচড় লেগে ধবধবে সাদা হয়ে গেছে।

ঝুঁকে হাড়টা তুলল রানা। ধীরে ধীরে চেনা গেল। মানুষের খুলির একটা ভাঙা অংশ এটা–চেকবোন, চোখের নীচে থাকে।

টুকরোটা হাতে নিয়ে ঘুরল রানা ফেলে আসা বনভূমির মেঝে দেখছে, দেখছে হাড়ের রাজ্যে বাহু ছড়িয়ে দেওয়া লতানো গাছগুলোকে। আরও বহু ভঙ্গুর হাড় দেখতে পাচ্ছে ও। কিছু কিছু এত পাতলা যে স্বচ্ছ লাগছে। সন্দেহ নেই এ-সব ছোটখাট প্রাণীর হাড়।

এখন রানা অতটা নিশ্চিত নয়।

কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছে ও। সে-সময়কার ক্লাসে ফিরে গেল মন। কোন্ সাতটা হাড় নিয়ে হিউম্যান আই-এর অরবিট তৈরি হয়? স্মরণ করবার চেষ্টা চলছে–ZYGOMA, NASAL, INFERIOR ORBITAL, SPHENOID…হলো মাত্র চারটে–ETHMOID, পাঁচ…PALATINE, ছয়। আরও একটা। কিন্তু শেষ হাড়টার নাম কোনভাবেই মনে পড়ছে না।

'যাক বাবা, মানুষের হাড় যখন নয়, অত ভয় পাওয়ারও কিছু নেই,' বলল সিসিলিয়া।

'না।' সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' আড়চোখে আনন্দর দিকে তাকাল ও।

আনন্দ ভয়ে ভয়ে শৈলীর দিকে তাকাল।

শৈলী সংকেত দিল: 'মানুষ মারা গেছে এখানে।'

'কী বলছে ও?' জিজ্ঞেস করল সিসিলিয়া।

'বলছে এখানকার বাতাস মানুষের জন্যে উপকারী নয়,' বলল আনন্দ। রানার সঙ্গে নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করল সে।

ফুয়াদ ব্যাপারটা লক্ষ করল, তবে কোন প্রশ্ন করল না। 'চলুন, এগোই আমরা,' বলল সে।

ইশারায় আনন্দকে পিছু নিতে বলল ফুয়াদ। সবাইকে পিছনে ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল ওরা।

'ওদেরকে কিছু বুঝতে দেননি, সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল ফুয়াদ।

'কিকুয়াদের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে ওরা যেন আতঙ্কিত না হয়। আপনার বানর কী বলল তখন?'

'শৈলী বানর নয়।'

'দুঃখিত। কী বলল শৈলী?'

'বলল, এখানে মানুষ মারা গেছে।'

'কয়কয় বা তার লোকজন এটা জানে না,' বলল ফুয়াদ। 'তবে তাদের মনেও প্রশ্ন জেগেছে।'

ওদের পিছনে এক লাইনে এগোচ্ছে টিম, সবার শেষে রয়েছে সিসিলিয়া আর রানা। কেউ কোন কথা বলছে না।

'ওখানে আসলে কী ঘটেছে বলুন তো?' জানতে চাইল আনন্দ।

'কী ঘটেছে বলতে পারি না। আমরা শুধু প্রচুর হাড় দেখেছি। চিতা, হাঁস, ইঁদুর, মানুষ...'

'আর গরিলার,' বলল আনন্দ।

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল ফুয়াদ। 'আর গরিলার। কিন্তু, ডক্টর, একটা গরিলাকে কে মারতে পারে, বলুন তো?'

এর উত্তর আনন্দর জানা নেই।

কনসর্টিয়াম ক্যাম্প লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। তাঁবু ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটাচ্ছে। লাশগুলো ঝাঁক ঝাঁক কালো মাছি ঢেকে রেখেছে। ভ্যাপসা গরমে দুর্গন্ধটা অসহ্য। রানা ছাড়া সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে ক্যাম্পের কিনারায়।

'উপায় নেই,' বলল ও। 'আমাদের জানতে হবে কী ঘটেছে এখানে।' মাটিতে শোয়ানো বেড়া টপকে ক্যাম্পের ভিতর ঢুকে পড়ল ও।

'গাইড হিসেবে আমারই আগে যাওয়া দরকার ছিল,' বলে রানার পিছু নিল ফুয়াদ।

যে-ই রানা ভিতরে পা রেখেছে, অমনি পেরিমিটার ডিফেন্স সিস্টেম সচল হলো–হাই-ফ্রিকোয়েন্সি সিগনাল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর কর্কশ হয়ে বাজল কানে। বেড়ার বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাড়াতাড়ি সবাই হাত চাপা দিল কানে। ঘোঁঘোঁৎ করে উঠে অসন্তোষ

প্রকাশ করল শৈলী: 'বিচ্ছিরি শব্দ।'

ভিতরে ঢুকে ওদের দিকে ঘাড় ফিরাল ফুয়াদ 'এখানে আওয়াজটা খুবই কম,' বলল সে 'আপনারা বাইরে আছেন বলে অসহ্য লাগছে।' কয়েক পা এগিয়ে রানার পাশে চলে এল সে, পা দিয়ে ঠেলে লাশটাকে চিত করল রানা।

কয়েক হাজার মাছি ভন ভন করছে, হাত দিয়ে সেগুলোকে তাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে লাশের পাশে হাঁটু গাড়ল ওরা, অত্যন্ত সাবধানে পরীক্ষা করল মাথাটা।

ক্যাম্পের বাইরে, পাশে দাঁড়ানো আনন্দর দিকে তাকাল সিসিলিয়া আনন্দ যেন মানসিক আঘাত পেয়ে একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে, ধ্বংসকাণ্ড আর বীভৎস দৃশ্য দেখে নড়বার শক্তিটুকুও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে। তার পাশে কানে হাত চাপা দিয়ে বসে রয়েছে শৈলী, মাঝেমধ্যে শিউরে উঠছে।

বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে পেরিমিটার পেরুল সিসিলিয়া। 'দেখে আসি কী রকম ডিফেন্স সিস্টেম ইনস্টল করেছিল ওরা।'

'ঠিক আছে,' বলল আনন্দ। মাথার ভিতরটা অসম্ভব হালকা আর ফাঁকা লাগছে তার, ভয় হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে।

কমপাউন্ডের একপাশে মোচাকৃতি লাউডস্পিকার সহ কালো একটা বাক্স দেখতে পেয়ে পরীক্ষা করল রানা, ওটা থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পের মাঝখানে চলে গেছে এক প্রস্থ তার । একটু পরই হাই-ফ্রিকোয়েন্সি সিগনাল থেমে গেল; যন্ত্রটা বন্ধ করে দিয়েছে ও।

শৈলী সংকেত দিল: 'উফ্, বাঁচা গেল।'

ক্যাম্পের মাঝখানে রানার পাশে দাঁড়িয়ে এক হাতে ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্টগুলো নাড়াচাড়া করছে সিসিলিয়া, অপর হাত দিয়ে নাক চেপে ধরেছে।

'ডক্টর,' বলল কয়কয়, 'আমি দেখি বন্দুক-টন্দুক কিছু পাই কি না।' সে-ও ক্যাম্পের দিকে এগোল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বাকি পোর্টাররা পিছু নিল।

ক্যাম্পের বাইরে শৈলী ছাড়া একা হয়ে গেল আনন্দ। চেহারায় থমথমে একটা ভাব, ভাঙাচোরা ক্যাম্পের চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে

শৈলী। তারপর একটু উঁচু হয়ে আনন্দর হাত ছুঁলো।

আনন্দ যেন হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে জানতে চাইল, 'শৈলী, তুমি বলতে পারবে এখানে কি ঘটেছে?'

শৈলী সংকেত দিল, 'জিনিস এসেছিল।'

'কী জিনিস?'

'খারাপ জিনিস।'

'কী খারাপ জিনিস?'

'খারাপ জিনিস খারাপ জিনিস।'

'কেন খারাপ?'

'খারাপ।'

বোঝাই যাচ্ছে এ-ধরনের প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। শৈলীকে জায়গা ছেড়ে নড়তে নিষেধ করে এবার আনন্দও ক্যাম্পের ভিতর ঢুকল। লাশগুলোকে পাশ কাটাবার সময় মাছির মেঘ ঘিরে ধরছে তাকে।

সিসিলিয়া জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কেউ লিডারের লাশ পেয়েছেন?'

ক্যাম্পের আরেক প্রান্ত থেকে ফুয়াদ বলল, 'দানুকে পেয়েছি।'

'দানু··· কিনসাসার দানু?'

মাথা ঝাঁকাল ফুয়াদ। 'হ্যাঁ।'

'দানু···কে?' জানতে চাইল আনন্দ।

'দানু নামকরা একজন গাইড, কঙ্গো সম্পর্কে তার ভাল অভিজ্ঞতা।' আবর্জনার ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে সিসিলিয়া। 'তবে বোঝাই যাচ্ছে, তার অভিজ্ঞতা কোন কাজে লাগেনি।' এক মুহূর্ত পর দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

সিসিলিয়াকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে এল আনন্দ। দেখল, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা একটা লাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সিসিলিয়া।

'ওল্টাবার দরকার নেই,' আনন্দকে বলল সিসিলিয়া। 'ওকে আমি চিনতে পারছি—বার্ট কিচনার।'

আনন্দ বুঝতে পারল না কী ভাবে বুঝছে সিসিলিয়া। কালো

মাছিতে গোটা লাশ ঢাকা পড়ে আছে।

'কয়কয়,' রানার ডাক শোনা গেল। বিশ লিটারের একটা সবুজ প্লাস্টিক ক্যান একটু উঁচু করে দেখাল ও। ভিতরে তরল পদার্থ কলকল করছে। 'এসো, কাজটা সেরে ফেলি।'

নিজের লোকদের নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিল কয়কয়। তাঁবু আর লাশগুলো দ্রুত কেরোসিন দিয়ে ভেজাচ্ছে তারা।

নাইলনের ছেঁড়া একটা সাপ্লাই টেন্ট-এর ভিতর মাথা নিচু করে ঢুকল সিসিলিয়া, গলা চড়িয়ে বলল, 'আমাকে এক মিনিট সময় দাও!'

'ঠিক আছে,' বলল ফুয়াদ। আনন্দর দিকে ফিরল সে।

আনন্দ তাকিয়ে আছে ক্যাম্পের বাইরে, শৈলীর দিকে।

শৈলী নিজের সঙ্গে কথা বলছে, সংকেতের মাধ্যমেই: 'মানুষ বোকা। মানুষ বিশ্বাস করে না খারাপ জিনিস এসেছিল।'

'আপনার শৈলীকে বেশ শান্তই দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল ফুয়াদ।

'দেখে যাই মনে হোক,' বলল আনন্দ, 'আমার ধারণা, ও জানে এখানে কী ঘটেছে।'

'আশা করি বলবেও আমাদের,' বলল ফুয়াদ। 'দেখছেন না, এখানকার সব ক'জন মানুষ একইভাবে মারা গেছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে প্রত্যেকের খুলি।'

চোদ্দ

অভিযাত্রীরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে আবার। কনসর্টিয়াম ক্যাম্পের শিখা ওদের পিছনের আকাশে লকলক করছে।

রানা চুপচাপ, চিন্তামগ্ন দ্রুত হেঁটে ওর পাশে চলে এল সিসিলিয়া, জানতে চাইল, 'ওদের ডিফেন্স সিস্টেম দেখে কী মনে হলো তোমার?'

'সিস্টেমে কোন খুঁত ছিল না। ওটা আমাদের মতই, এড়িপি–অ্যানিমেল ডিফেন্স পেরিমটার। মোচার মত দেখতে জিনিসগুলো অডিওসেন্সিং ইউনিট, নাগালের মধ্যে যে-কোনও জানোয়ার এলে আলট্রাহাই-ফ্রিকোয়েন্সি সিগনাল দিতে শুরু করে।'

'কানের বারোটা বাজিয়ে দেয়?'

'হ্যাঁ। সাপ-টাপের বেলায় কাজ না করলেও, ম্যামেইলিয়ান জনোয়ারদের ওপর খুব কাজ দেয়। নেকড়ে বা চিতা পালাতে দিশা পাবে না।'

'কিন্তু এখানে সেটা কাজ করেনি।'

'না,' বলল রানা। 'সেটাই চিন্তার কথা।'

ঘাড় ফিরিয়ে ফুয়াদের দিকে একবার তাকাল সিসিলিয়া। পা চালিয়ে তার পাশে চলে এল ফুয়াদ। 'এদিকে মানুষ বলতে আমরা ছাড়া আর কেউ আছে কি না বলতে পারেন?'

'পারি,' জবাব দিল ফুয়াদ। 'শুধু আমরাই, আর কেউ নেই।'

ফুয়াদের পিছু নিয়ে আনন্দও ওদের কাছাকাছি চলে এল। 'আমাদের বেড়াটা ওদের চেয়ে মজবুত করা যায় না?' জানতে চাইল সে।

'আমাদের ডিফেন্স পেরিমিটার ওদের চেয়ে অবশ্যই অনেক শক্তিশালী হবে,' বলল রানা। 'হাতি আর গণ্ডার ছাড়া বাকি সবকিছুকে থামিয়ে দেবে ওটা।' জোর দিয়ে বলল বটে, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের অভাব।

শেষ বিকেলের দিকে ভিআরএমসি-র প্রথম কঙ্গো ক্যাম্পের কাছে পৌঁছাল দলটা। দেখতে না পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। দেখতে না পাওয়ার কারণ হলো, মাত্র আটদিনেই লতানো গাছ আর বিভিন্ন গাছের শিকড় জায়গাটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে।

খুব কম জিনিসই দেখতে পেল ওরা। ছেঁড়া কয়েক টুকরো কমলা রঙের নাইলন, অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো একটা কুকিং প্যান, ভাঙা তেপায়া আর ভিডিও ক্যামেরা–ওটার সবুজ সার্কিট বোর্ডগুলো ঘাসের উপর ছড়িয়ে রয়েছে।

কোন লাশ দেখা গেল না। দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে বলে

তাড়াতাড়ি অকুস্থল ত্যাগ করল ওরা।

শৈলী গোলমাল শুরু করল। একই সংকেত বারবার দিচ্ছে: 'যাব না।'

আনন্দ তার কথায় কান দিচ্ছে না।

'খারাপ জায়গা। পুরানো জায়গা। যাব না।'

'যাওয়া যে দরকার, শৈলী,' বলল আনন্দ।

পনেরো মিনিট পর মাথার উপর গাছপালার সবুজ চাঁদোয়ার মাঝখানে একটা ফাঁক দেখা গেল। মুখ তুলে মুকেনকোর শরীর দেখতে পেল ওরা, জঙ্গল থেকে খাড়া হয়ে আকাশ ছুঁয়েছে। সবুজাভ, অস্পষ্ট, লেযার বিম-এর ক্রস চক্চক্ করছে গরম বাতাসে। ক্রস-এর সরাসরি নীচে শ্যাওলা ধরা পাথর দেখা যাচ্ছে, ঝোপ-ঝাড়ে অর্ধেক ঢাকা। এটাই নিখোঁজ শহর জিঞ্জ।

ঘাড় ফিরিয়ে শৈলীর দিকে তাকাল আনন্দ।

শৈলী চলে গেছে।

আনন্দর বিশ্বাস হচ্ছে না। প্রথমে ভাবল, শৈলী তাকে শাস্তি দিচ্ছে, নদীর ধারে ওর গায়ে খুদে বর্শা বিঁধানোর 'অপরাধে'। রানা আর সিসিলিয়াকে ব্যাখ্যা করল সে, অভিমানবশত এ-ধরনের আচরণ করা শৈলীর পক্ষে সম্ভব।

পরবর্তী আধ ঘণ্টা জঙ্গলের ভিতর এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি চলল, শৈলীর নাম ধরে ডাকছে সবাই। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সিদ্ধান্ত হলো, আরও আধ ঘণ্টা খোঁজা হবে। এভাবে কয়েকবার সময় বাড়ানোয় প্রায় দু'ঘণ্টা পার হতে চলেছে।

আনন্দ আতঙ্কিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত।

শৈলী যখন ফিরছেই না, আরেকটা সম্ভাবনা বিবেচনা করতে হলো। 'ও হয়তো গরিলাদের শেষ দলটার সঙ্গে চলে গেছে,' বলল রানা।

আনন্দ মাথা নাড়ল। 'অসম্ভব।'

তবে সে উপলব্ধি করল রানা কী বলতে চাইছে। যারা এইপ

পালে, একটা সময় প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে সে তার প্রিয় প্রাণীটিকে আর ধরে রাখতে পারবে না। পরিণত বয়সে আকারে অত্যধিক বড় হয়ে ওঠে, তেমনি গায়ে চলে আসে প্রচণ্ড শক্তি, নিজ প্রজাতির এতসব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে যে কোন মানুষের পক্ষে ওটাকে তখন আর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বলে মনে হয় না।

'গরিলারা বিধি-নিষেধ কমই মানে,' বলল রানা, মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে। 'নতুন কাউকে পেলে সহজেই গ্রহণ করে ওরা, বিশেষ করে সে যদি মেয়ে হয়।'

'এ কাজ শৈলী করবে না,' জোর দিয়ে বলল আনন্দ। 'করতে পারে না।'

একেবারে শিশুকাল থেকে মানুষের মাঝখানে বড় হয়েছে শৈলী। জঙ্গলের চেয়ে পশ্চিমা দুনিয়া তার কাছে অনেক বেশি পরিচিত। নিউ ইয়র্ক শহরে ওর প্রিয় রাস্তা আছে। গাড়ি চড়তে ভালবাসে ও। আনন্দ অন্য রাস্তা ধরে গাড়ি চালালে দ্রুত তার কাঁধে টোকা দিয়ে ভুলটা ধরিয়ে দেয়। জঙ্গল সম্পর্কে কী জানে ও? শুধু তাই নয়–

'উপায় নেই, এখানেই ক্যাম্প ফেলতে হবে,' অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল রানা, হাতঘড়ির উপর চোখ। 'শৈলী ফিরে আসুক–ফিরতে যদি ইচ্ছে হয়। আমরা শুধু তাকে ফেরার একটা সুযোগ দিতে পারি।'

কয়কয় তার লোকজনকে নিয়ে রুপালি তাঁবুগুলোয় বাতাস ভরল। সবগুলো তাঁবু কাছাকাছি থাকবে, নির্দেশ দিল রানা। টেলিস্কোপিক তেপায়ায় ইনফ্রারেড নাইট লাইট ফিট করবার পর ফুয়াদকে দেখিয়ে দিল ক্যাম্পের চারদিকে কোন্ কোন্ পয়েন্টে বসানো হবে ওগুলো।

এরপর পেরিমিটার ডিফেন্স ফেন্স বা সীমানায় প্রতিরোধ বেড়া দেওয়ার কাজ। হালকা ধাতব জাল ব্যবহার করলেও, দেখে মনে হচ্ছে তার নয়, বরং কাপড় দিয়ে তৈরি। ধাতব খুঁটিতে আটকে গোটা ক্যাম্পসাইট ঘিরে ফেলা হয়েছে।

সবশেষে সংযোগ দেওয়া হলো ট্র্যান্সফর্মারের সঙ্গে। জালে এখন দশ হাজার ভোল্ট ইলেকট্রিক কারেন্ট বইছে। ফুয়েল সেল-এর ক্ষয় কমাবার জন্য প্রতি চার সাইকল্-এ এক সেকেন্ডের একটা বিরতির

ব্যবস্থা করা আছে, ফলে মৃদু একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে ওরা।

২০ জুন রাতে ডিনারে পরিবেশিত হলো ভাত, বাগদা চিংড়ির কোপ্তা, আনারস আর নারকেল দিয়ে রান্না করা বনমোরগ।

রাত বাড়তে ফুয়াদ আর কয়কয়কে ডেকে ক্যাম্পের চারধারে পাহারা বসাবার নির্দেশ দিল রানা। প্রতি চারঘণ্টা অন্তর পালা বদল। ঠিক হলো, প্রথম দলে ও, কয়কয় আর আনন্দ থাকবে।

২১ জুন সকালে নিখোঁজ জিঞ্জ শহরে পা রাখল ওরা উনিশ শতকে এ-ধরনের একটা অভিযানে যে রহস্য আর রোমান্স পাওয়া গেছে, সত্যি কথা বলতে কী, তার ছিটেফোঁটাও ওদের কপালে জুটল না। কারণটাও স্পষ্ট। বিংশ শতাব্দীর এই অভিযাত্রীদের টেকনিকাল ইকুইপমেন্টের বিরাট বোঝা বইতে হওয়ায় গলদঘর্ম হতে হচ্ছে, পথ চলতে ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে সবাই। অপটিকাল রেঞ্জ ফাইন্ডার, ডাটা-লক কমপাস, সংযুক্ত ট্র্যান্সমিটার সহ আরএফ ডিরেকশনালস্, মাইক্রোওয়েভ ট্র্যান্সপন্ডার–কোনটার ওজনই কম নয়। যে-কোন আর্কিওলজিকাল সাইট দ্রুত যাচাই করতে হলে এ-সব আধুনিক যন্ত্রপাতি সঙ্গে থাকাটা আজকাল প্রায় বাধ্যতামূলকই বলা যায়।

নিজ কোম্পানির স্টাফ আর বিজ্ঞানীরা কীভাবে মারা গেছে সেটা জানতে চায় সিসিলিয়া, তবে মারাত্মক সব বিপদ মাথায় করে এখানে আসবার পিছনে আরও বড় কারণ হীরের খনি খুঁজে বের করা। ট্রয় খনন করবার সময় শেলেইম্যান-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল সোনা উদ্ধার; কাজটার পিছনে তিন বছর ব্যয় করেন তিনি। রানার নেতৃত্বে সিসিলিয়া আশা করছে হীরের খনিগুলো তিন দিনের মধ্যে পেয়ে যাবে ওরা।

ভিআরএমসি-র কমপিউটার সিমিউলেশন অনুসারে কাজটা করবার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো প্রথমে শহরটার একটা গ্রাউন্ড প্ল্যান আঁকা। হাতে একটা নকশা থাকলে, শহরের অবকাঠামো এড়িয়ে খনিগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

কাজ চালাবার মত একটা নকশা তৈরি করতে রানার হিসাবে ছয় ঘণ্টার মত সময় লাগবে। ওরা আরএফ ট্র্যান্সপন্ডার ব্যবহার করবে, ফলে ওদেরকে শুধু একটা বিল্ডিঙের প্রতিটি কোণে দাঁড়িয়ে রেডিও

বিপার-এ চাপ দিতে হবে। ওদিকে, ক্যাম্পে, যথেষ্ট ব্যবধান রেখে সেট করা দুটো রিসিভার ওদের সিগনাল রেকর্ড করবে, কমপিউটার যাতে ওগুলোর সাহায্যে দ্বিমাত্রিক ছক তৈরি করতে পারে।

কিন্তু প্রাচীন শহরটার ধ্বংসাবশেষ বিরাট জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, তিন বর্গকিলোমিটারের বেশি তো কম নয়। রেডিওর সাহায্যে সার্ভে করতে চাইলে গভীর জঙ্গলের ভিতর পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে ওদেরকে। কিন্তু প্রথম ফিল্ড পার্টির ভাগ্যে কী ঘটেছে মনে রেখে সেটা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

বিকল্প উপায় হলো, ভিআরএমসি-র ভাষায়, নন-সিসটেমেটিক সার্ভে। চকচকে সাপ আর বিশাল আকৃতির মাকড়সা এড়িয়ে বিধ্বস্ত ভবনগুলোর ভিতর দিয়ে এগোল ওরা। একেকটা মাকড়সা মানুষের হাতের মত বড়, ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ করছে দেখে সিসিলিয়া আশ্চর্য হয়ে গেল।

রানা খেয়াল করল, দালানগুলোয় পাথরের কাজ খুবই সুন্দর। তবে লাইমস্টোনের অনেক জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে, কোথাও কোথাও ধসেও পড়েছে। যেদিকেই তাকাচ্ছে ওরা, অর্ধ-চন্দ্রাকার জানালা-দরজা আছেই। ওই বিশেষ নকশা যেন জিঞ্জবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা অংশ বা প্রতীক ছিল।

তবে অর্ধবৃত্তাকার ওই নকশা ছাড়া কামরাগুলোর আর কোন বৈশিষ্ট্য ওদের চোখে ধরা পড়ল না। প্রায় প্রতিটি ঘরই চৌকো, মোটামুটি একই আকারের; দেয়াল ফাঁকা, কোন রকম অলঙ্করণ নেই। মাঝখানে বহু শতাব্দীর ব্যবধান তৈরি হওয়ায় কোন আর্টিফ্যাক্ট পেল না ওরা। ফুয়াদ শুধু দাঁড় আকৃতির একজোড়া পাথর পেল, মাথার দিকটা চওড়া, প্রায় থালার মত। পরীক্ষা করে সবাই একমত হলো, এটা জাঁতার একটা অংশবিশেষ, মশলা বা শস্য পেষার কাজ চলত।

যতই ভাঙাচোরা হোক, প্রতিটি ভবন বা দালানের নামকরণ করছে ওরা। একটা ঘরের দেয়ালে অনেকগুলো খোপ দেখে সিসিলিয়ার ধারণা হলো এটা ডাকঘর ছিল, ফলে সেটার নাম রাখা হলো পোস্টাপিস।

এক সারিতে কয়েকটা ছোট কামরা দেখতে পেল ওরা। দরজার

জায়গায় কাঠের থাম বসানো। ফুয়াদ বলল, এটা জেলখানার অংশ হতে পারে। কিন্তু সেলগুলো অস্বাভাবিক ছোট। রানা মন্তব্য করল, এখানকার মানুষগুলোই হয়তো ছোট ছিল, কিংবা শাস্তির মাত্রা বাড়ানোর জন্য ইচ্ছে করেই এরকম ছোট সেল তৈরি করা হত।

আনন্দ ওদের কারও সঙ্গে একমত হতে পারল না। তার ধারণা, এগুলো খাঁচা, চিড়িয়াখানার অংশ। প্রশ্ন উঠল, সেক্ষেত্রে প্রতিটি খাঁচা একই আকারের হবে কেন? তা ছাড়া, রানা যুক্তি দিল, চিড়িয়াখানার পশুগুলোকে দেখবার কোন সুযোগ নেই–ঘরগুলোর সামনে পাঁচিল রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঘরগুলোর নামকরণ জেলখানাই করা হলো।

জেলখানার কাছাকাছি খোলা উঠানটা 'জিমনেশিয়াম'। পাথরের আসন, পিলার ইত্যাদি দেখে বোঝা যায় জায়গাটা অ্যাথলেটিক ফিল্ড কিংবা ট্রেনিং গ্রাউন্ড ছিল। উঠানের এক কোণে পাথরের একটা ওভারহেড বার রয়েছে, দুটো পিলারের উপর ঝুলন্ত অবস্থায়–মাটি থেকে ওটা মাত্র পাঁচ ফুট উঁচু দেখে আনন্দর ধারণা হলো জায়গাটায় বাচ্চারা খেলাধুলো করত। রানা ওর ধারণায় এখনও অটল–লোকগুলো ছোটখাট ছিল।

তবে সব মিলিয়ে হতাশই হতে হলো ওদেরকে। খুঁজে পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু জিঞ্জ ওদেরকে গুরুত্বপুর্ণ কোন তথ্যই দিচ্ছে না।

কারা বাস করত এই শহরে? কারাই বা বানিয়েছিল? আজ তারা কোথায়?

একটা প্রশ্নেরও উত্তর নেই।

জিনিসটা প্রথম থেকেই দেখেছে ওরা, কিন্তু তাৎপর্যটা বুঝতে দেরি করে ফেলে। অনেকগুলো কামরায়, কোন না কোন দেয়ালে, কালচে-সবুজ ছাতা ধরেছে। রানা খেয়াল করল, এই ছাতা জানালা দিয়ে ঢোকা আলো, বাতাসের প্রবাহ বা ওদের চোখে ধরা পড়ে এমন কিছুর প্রভাবে তৈরি হয়নি। কয়েকটা কামরায় ছাতা ধরেছে বেশ পুরু হয়ে, সিলিং থেকে নেমে দেয়ালের প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে ফেলেছে, থেমেছে সরু একটা আড়াআড়ি রেখা তৈরি করে–যেন ছুরির ফলা দিয়ে কাটা হয়েছে ওই ছাতা।

'অদ্ভুত তো,' বলল রানা, খুব কাছ থেকে জিনিসটা পরীক্ষা করছে। ছাতায় আঙুল ঠেকিয়ে একটু ঘষল ও। দেখল আঙুলের ডগায় নীল রঙ লেগে রয়েছে।

এভাবেই জটিল ব্যাস-রিলিফ আবিষ্কার করল ওরা-খোদাই করা সব মূর্তি বা আকৃতি, তার উপর রঙ চড়ানো হয়েছে। বহু শতাব্দী আগে আঁকা এই শিল্পকর্ম গোটা শহরেই পাওয়া গেল। তবে লাইমস্টোন দেয়ালের এবড়োখেবড়ো আর ফাটল ধরা গায়ে ছাতা পড়ায় মূর্তি আর আকৃতিগুলোর অর্থ উদ্ধার করা অসম্ভব।

চিন্তা করে একটা সিস্টেম বের করতেই এক ঘণ্টা পার করে দিল ওরা। শেষে দেয়ালে ইনফ্রারেড লাইট ফেলা হলো, ইমেজগুলো ধারণ করছে ভিডিও ক্যামেরা। তারপর সেই ইমেজ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চলে গেল ওয়াশিংটনের ডিজিটাইজিং কমপিউটার প্রোগ্রামে, সেখান থেকে নতুন চেহারা নিয়ে ওদের পোর্টেবল ডিসপ্লে ইউনিটে ফিরে আসবার পর দেয়ালের খোদাই আর অঙ্কনগুলোর অর্থ বের করা সহজ হয়ে গেল। দৃশ্যগুলো ওদেরকে জিঞ্জ শহর আর শহরের বাসিন্দা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাইয়ে দিচ্ছে।

জিঞ্জ-এর বাসিন্দারা কালো, তবে বেঁটে নয়। মাথা প্রায় গোল, শরীর পেশল। দু'হাজার বছর আগে উত্তরের উঁচু মালভূমি থেকে যারা কঙ্গোয় এসেছিল, সেই বান্টু-ভাষী লোকজনের সঙ্গে তাদের চেহারা যথেষ্ট মেলে। ভাস্কর্য আর ছবিতে নিজেদেরকে তারা প্রাণচঞ্চল আর কর্মঠ হিসাবে তুলে ধরেছে। সব মরশুমেই সূক্ষ্ম নকশা করা আর বহুরঙা ঢোলা চাদর পরত, অনেকটা আলখেল্লার মত দেখতে।

প্রথম পাওয়া ছবিগুলোয় বাজারের দৃশ্য দেখা গেল: বিক্রেতারা মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে, সামনে বেত দিয়ে বোনা সুদৃশ্য ঝুড়ি, ঝুড়িতে কী সব গোলাকার জিনিস। ক্রেতারা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে দরদাম করছে।

প্রথমে ওরা ধারণা করল, গোল জিনিসগুলো ফল হবে। পরে সিসিলিয়ার সঙ্গে একমত হয়ে রানা বলল, রত্ন হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। 'আনকাট ডায়মন্ড,' বলল ও. স্ক্রিনের উপর চোখ। 'ওর'

হীরে বেচছে।'

ছবিগুলো দেখবার পর একটা প্রশ্ন খুব বড় হয়ে উঠল। পরিষ্কার বোঝা যায়, বাসিন্দারা শহর ছেড়ে চলে গেছে। শহরটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এরকম ভাববার কোন কারণ নেই। যুদ্ধেরও কোন লক্ষণ নেই, লক্ষণ নেই প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের। তা হলে তারা চলে গেল কেন?

সিসিলিয়ার কাছে এর সহজ ব্যাখ্যা আছে। তার সন্দেহ, হীরের খনিগুলো খালি হয়ে যাওয়ায় জিঞ্জ স্বভাবতই হয়ে উঠেছিল ভৌতিক শহর–ইতিহাসে খনি শহরগুলোর এই পরিণতিই হতে দেখা যায়।

আনন্দর ধারণা, মহামারী বা কোন মারাত্মক রোগ আতঙ্কিত করে তুলেছিল শহরবাসীকে। ফুয়াদ তাকে সমর্থন করল।

এরপর সবাই চেপে ধরল রানাকে। ও কেন কিছু বলছে না?

রানা জানাল, এর জন্য গরিলারা দায়ী হতে পারে। 'হেসো না,' বলল ও। 'এটা ভলক্যানিক এরিয়া। উদ্‌গিরণ, ভূমিকম্প, খরা, দাবানল–একটা না একটা লেগেই আছে; এ-সব কারণে পশুরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে হিংস্রতার মাত্রা বেড়ে যায়।'

মাথা নেড়ে আনন্দ বলল, 'এখানে কয়েক বছর পর পর আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি শহরটা কয়েকশো বছর ধরে টিকে ছিল।'

'হয়তো কোন সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল।'

'সামরিক অভ্যুত্থান হলে গরিলাদের কী?' হেসে উঠল আনন্দ।

'শোনো, কী ঘটে বলি,' বলল রানা। 'বিশেষ করে আফ্রিকায় দেখা গেছে যুদ্ধ লাগলে বনের পশুরা অদ্ভুত আচরণ করে।' এরপর একটা গল্প শোনাল–গেরিলা যুদ্ধের সময় বেবুনরা দক্ষিণ আফ্রিকার ফার্মহাউসে কীভাবে হামলা চালিয়েছিল।

আনন্দ তারপরও মানতে চায় না। মানুষের আচরণের ছায়া পড়ে প্রকৃতিতে, এ খুব প্রাচীন ধারণা–অন্তত ঈশপের মত পুরানো, এবং তাই এর বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তিও নেই। 'প্রকৃতি মানুষের ব্যাপারে নির্লিপ্ত,' বলল সে।

'ঠিক, এ নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই,' বলল রানা, 'কিন্তু বিশুদ্ধ প্রকৃতি

খুব একটা অবশিষ্টও নেই আর।'

ডিনার খাচ্ছে আনন্দ, ডাক দিল রানা। 'তোর মেসেজ,' বলল ও, হাত তুলে অ্যান্টেনার পাশে বসানো কমপিউটারটা দেখাল। 'আবার তোর সেই রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

এক গাল হাসল ফুয়াদ। 'জঙ্গলেও ফোন আসার বিরাম নেই।'

এগিয়ে এসে স্ক্রিনে চোখ বুলাল আনন্দ। ডক্টর মেরিনা জানতে চাইছেন: 'কমপিউটারের সাহায্যে ভাষা বিশ্লেষণ করে নেগেটিভ ফলাফল পেয়েছি। আরও ইনপুট দরকার। আপনি সাপ্লাই দিতে পারবেন?'

আনন্দ টাইপ করল, 'কী ইনপুট?'

'আরও শাব্দিক ইনপুট–ট্র্যান্সমিট রেকর্ডিংস।'

আনন্দ টাইপ করে জানাল, 'ঠিক আছে, ওরকম আওয়াজ রেকর্ড করতে পারলে জানাব।'

এরপর ডক্টর মেরিনা জিজ্ঞেস করলেন, 'শৈলী কেমন আছে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে আনন্দ জবাব দিল, 'ভাল।'

'সবাই শুভেচ্ছা জানিয়েছে,' স্ক্রিনে পড়ল আনন্দ। তারপরই ট্র্যান্সমিশন বন্ধ হয়ে গেল।

২১ জুন রাতটা এত শান্ত আর নিরুপদ্রব লাগল যে পাওয়ার বাঁচাবার জন্য দশটার দিকে ইনফ্রারেড নাইট লাইট-এর সুইচ অফ করে দিল ওরা। খানিক পরই কমপাউন্ডের বাইরের ঝোপ-ঝাড়ে নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

রানা আর ফুয়াদ হাতের অস্ত্র ঘোরাচ্ছে চারদিকে। খসখস আওয়াজ বাড়ল আরও। সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেল ওরা–যেন কেউ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে, ফোঁস-ফোঁস করছে।

শব্দটা শোনামাত্র রানার শিরদাঁড়ায় সচল একটা ঠাণ্ডা হিম অনুভূতি হলো। এই ফোঁস-ফোঁস শব্দ আগেও শুনেছে ও–সিসিলিয়ার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হেড অফিসে প্রথম কঙ্গো এক্সপিডিশান থেকে আসা শব্দ রেকর্ড করা হয়েছিল টেপে।

টেপ রেকর্ডারটা অন করল রানা, তারপর মাইক্রোফোনটা চারদিকে ঘোরাল।

সবাই ওরা আঁড়ষ্ট আর সভর্ক। অপেক্ষা করছে।

কিন্তু পরবর্তী এক ঘণ্টা কিছুই ঘটল না। ওদের চারপাশের জঙ্গল নড়াচড়া করছে, তবে কিছুই ওরা দেখতে পাচ্ছে না।

তারপর মাঝরাতের খানিক আগে ইলেকট্রিফাইড পেরিমিটার ফেন্সে একরাশ আগুনের ফুলকি বিস্ফোরিত হলো। ঝট করে অস্ত্র ঘুরিয়েই গুলি করল রানা।

নাইট লাইটের সুইচটা অন করল ফুয়াদ। গাঢ় লাল রঙে ডুবে গেল ক্যাম্প।

'দেখেছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'চিনতে পেরেছ কী ওটা?'

মাথা নাড়ল সবাই। কেউ কিছু দেখতে পায়নি। নিজের টেপ চেক করল রানা। রেকর্ড হয়েছে শুধু রাইফেলের আওয়াজ আর আগুনের ফুলকি বিস্ফোরণের শব্দ। কোন দীর্ঘশ্বাস বা শ্বাস-প্রশ্বাস রেকর্ড হয়নি।

ভোর পর্যন্ত আর কিছু ঘটল না।

পনেরো

২২ জুন কুয়াশা ঢাকা সকাল ছ'টায় ঘুম ভাঙল আনন্দর। ক্যাম্পের বাকি সবাই এরইমধ্যে জেগে উঠে যে-যার কাজে লেগে গেছে।

ক্যাম্প পেরিমিটারের চারদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছে রানা, গাছে আর ঝোপের ডাল-পালা ঘষা খাওয়ায় ওর পরনের কাপড়চোপড় বুক পর্যন্ত ভিজে গেছে। চোখে-মুখে বিজয়ীর উল্লাস নিয়ে আনন্দকে স্বাগত জানাল ও। 'আয়!' বলে আঙুল তাক করল মাটির দিকে।

মাটিতে তাজা পায়ের ছাপ। দাগগুলো গভীর, ছোট আকারের,

প্রায় তেকোনাই বলা যায়–সবচেয়ে বড় আঙুল আর বাকি চারটে আঙুলের মাঝখানে বড় বেশি চওড়া ব্যবধান দেখা যাচ্ছে, মানুষের হাতের বুড়ো আঙুল আর অন্যান্য আঙুলের মাঝখানে যেমনটি দেখা যায়।

'মানুষের তো অবশ্যই নয়,' বলল আনন্দ, ভাল করে দেখবার জন্য ঝুঁকল।

রানা কিছু বলছে না।

'কী দেখছ তোমরা?' ফুয়াদের পিছু নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল সিসিলিয়াকে। কাছে এসে জমিনের ছাপগুলো তারাও দেখল।

'মানুষের নয়,' আবার বলল আনন্দ। 'সম্ভবত কোন ধরনের প্রাইমেটের পায়ের ছাপ।'

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে,' সায় দিল সিসিলিয়া।

'গরিলা নয় তো?' জিজ্ঞেস করল ওদের গাইড।

'নাহ্!' জোর দিয়ে বলল আনন্দ, শিরদাঁড়া খাড়া করল। ভিডিও কমিউনিকেশন থেকে তথ্য পাওয়ার পর তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে–এখানকার ঘটনায় গরিলারা জড়িত নয়। ওরা কখনও নিজেদের কাউকে হত্যা করে না। 'এ ছাপ গরিলার হতেই পারে না।'

'আমার ধারণা পারে,' বলল রানা। 'আয়, এদিকটা দেখ।' সরে খানিকটা নরম মাটির পাশে দাঁড়াল ও, আঙুল তাক করে আরও কিছু ছাপ দেখাল। এক সারিতে চারটে দাগ পড়েছে। 'এগুলো আঙুলের গাঁট, চার হাত-পায়ে হাঁটার সময় এই ছাপ পড়েছে মাটিতে।'

'কিন্তু গরিলারা,' যুক্তি দেখাল আনন্দ, 'লাজুক প্রাণী। ওরা রাতে ঘুমায়। আর, সবাই জানে মানুষকে এড়িয়ে চলাই ওদের স্বভাব।'

'যে এই ছাপ তৈরি করেছে, এ-সব কথা তোর তাকে শোনানো উচিত।'

'গরিলার তুলনায় ছাপগুলো ছোট,' বলল আনন্দ। কাছাকাছি বেড়াটা পরীক্ষা করল সে, যেখানে কাল রাতে ইলেকট্রিক্যাল ফুলকির বিস্ফোরণ ঘটেছিল। বেড়ার গায়ে ধূসর রঙের পশম আটকে রয়েছে। 'তা ছাড়া, গরিলার গায়ে এই রঙের চুল থাকে না।'

'কিছু পুরুষের থাকে,' বলল ফুয়াদ। 'ওদেরকে সিলভারব্যাক বলা হয়।'

'হ্যাঁ, জানি, কিন্তু সিলভারব্যাকের চুল সাদা হয়। এই চুল পাঁশুটে-ধূসর।' আনন্দকে ইতস্তত করতে দেখল ওরা। 'কে জানে, এটা হয়তো একটা কাকুনডাকারি।'

ফুয়াদকে বিরক্ত দেখাল।

কাকুনডাকারিকে নিয়ে কঙ্গোয় বিতর্ক আর গুজবের কোন শেষ নেই। হিমালয়ের ইয়েতি বা উত্তর আমেরিকার বিগফুট-এর মত, দাবি করা হয় দেখা গেছে, কিন্তু কখনও ধরা পড়েনি। স্থানীয় লোকজন গল্প করে কাকুনডাকারি ছ'ফুট লম্বা একটা লোমশ এইপ্, পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে, এবং মানুষের সঙ্গে তার প্রচুর মিল।

অনেক শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন কাকুনডাকারির অস্তিত্ব আছে, তাঁরা সম্ভবত ভোলেননি যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এক সময় গরিলার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন।

'এই ছাপ অবশ্যই একটা গরিলার,' বলল ফুয়াদ। 'কাকুনডাকারি বলে কিছু আছে এ আমি বিশ্বাস করি না।'

মাথা নাড়ল রানা। 'একটা না, বলো অনেকগুলো গরিলার। তারা পেরিমিটার ফেন্সের চারদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমাদের ক্যাম্প দেখতে এসেছিল।'

'বললেই হলো, ক্যাম্প দেখতে এসেছিল,' আনন্দর কণ্ঠস্বরে খানিকটা অবিশ্বাস, খানিকটা রাগ। 'তুই এমনভাবে কথা বলছিস, এই গরিলারা যেন আমাদের মত বুদ্ধিমান।'

ঠিক এই সময় গাছপালার উপর থেকে চেঁচামেচি শুরু করে দিল এক দল বানর। ডাল-পালা ধরে ঝাঁকাচ্ছে।

পোর্টার বাদাউই-এর লাশটা কমপাউন্ডের ঠিক বাইরেই পেল ওরা। ঝরণা থেকে পানি আনতে যাওয়ার সময় খুন করা হয়েছে তাকে। লাশের কাছেই পড়ে রয়েছে খালি বালতিটা। তার খুলির হাড় ভেঙে প্রায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নাক-চোখ ক্ষত-বিক্ষত। মুখ খোলা।

এরকম একটা বীভৎস দৃশ্য দেখে পিছন ফিরল আনন্দ, হড় হড়

করে বমি করে ফেলল।

পোর্টাররা কয়কয়কে ঘিরে জড়ো হয়েছে; কয়কয় তাদেরকে আশ্বস্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

অসুস্থ বোধ করছে সিসিলিয়াও, রানা তাকে একপাশে সরিয়ে আনল। তারপর আবার লাশটার কাছে ফিরে গেল ও।

লাশের কাছ থেকে নড়েনি ফুয়াদ। তার পাশে হাঁটু গাড়ল রানা। লোকটার মাথার জখম খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও। 'মাথার দু'পাশের হাড় ভাঙেনি। ডেবে গেছে। যেন দু'পাশ থেকে চাপ দেয়া হয়েছে।'

'জী, সার।' সিধে হলো ফুয়াদ, একজন পোর্টারকে ডেকে বলল, 'আমি যে পাথরের দাঁড় দুটো পেয়েছি, ওগুলো নিয়ে এসো–আমার তাঁবুতে আছে।'

পোর্টার তাঁবুর দিকে চলে গেলেও, তাদের লিডার কয়কয় ফুয়াদের সামনে এসে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

'কিছু বলবে, কয়কয়?' জিজ্ঞেস করল ফুয়াদ।

'এবার আমরা বাড়ির পথ ধরব, বস্,' বলল কয়কয়।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এ অসম্ভব!'

'আমাদেরকে ফিরতেই হবে, বস্। আমাদের এক ভাই মারা গেছে। গ্রামে ফিরে তার বউ-বাচ্চাদের জন্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে।'

'কয়কয়...'

'বস্, আমাদের সত্যি কোন উপায় নেই।'

'কয়কয়, এসো, আমরা আলাপ করি।' কয়কয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে হাঁটতে শুরু করল ফুয়াদ। সবার কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে গিয়ে নিচু গলায় কয়েক মিনিট কথা বলল তারা।

'আশ্চর্য! আরে, এ কি!' হঠাৎ আঁতকে উঠল সিসিলিয়া। 'মিস্টার সেন, আপনি কাঁদছেন কেন?'

সত্যি তাই, দু'হাতে মুখ ঢেকে ছেলে মানুষের মত ফোঁপাচ্ছে আনন্দ।

লাশের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি উঠে এল রানা। প্রশ্ন করে কোন জবাব পাওয়া গেল না। তবে ওরা ধারণা করল, ভয়ে নয়, অভিমানে

কাঁদছে আনন্দ। শৈলী তাকে ফেলে চলে গেছে, সেই দুঃখে। সিসিলিয়া আর রানা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে তার প্রতিক্রিয়া হলো উল্টো।

সিসিলিয়া বলল, 'পোষা গরিলা শেষ পর্যন্ত পালিয়েই যায়। তাই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার...'

রানা বলল, 'তুই কাঁদলে কি ফিরে আসবে শৈলী? ফিরে আসবার জন্যে গেছে?'

কান্না ভুলে ওদের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল আনন্দ। 'কী বলতে চাস তোরা? ভেবেছিস শৈলী আমাকে ছেড়ে সত্যি থাকতে পারবে?'

সিসিলিয়া আর রানা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

তারপর রানা জিজ্ঞেস করল, 'যদি জানিসই যে ফিরে আসবে, তা হলে কাঁদছিলি কেন?'

'কাঁদছিলাম ওর অমঙ্গল আশঙ্কা করে,' বলল আনন্দ। 'কারা বা কী সব যেন মানুষকে মেরে ফেলছে, আমার শৈলী কি ওগুলোকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে?'

ওদিকে, ফুয়াদের সঙ্গে কয়েক মিনিটের আলাপ সেরে পোর্টারদের কাছে ফিরে গেল কয়কয়। শার্টের আস্তিন দিয়ে তাকে চোখ মুছতে দেখল সবাই। অবশিষ্ট ভাইদের সঙ্গে দ্রুত কিছু কথা বলল সে। তারা মাথা ঝাঁকাল।

ফুয়াদ আবার লাশের কাছে ফিরে এসেছে। কয়কয় তার পাশে এসে দাঁড়াল। 'আমরা থাকছি, বস্,' বলল সে।

'খুশি হলাম,' বলল ফুয়াদ। 'এই, ওগুলো দাও!' পোর্টারের বাড়ানো হাত থেকে চ্যাপ্টা পাথর দুটো নিল সে।

ওগুলো বাদাউই-এর মাথার দু'পাশে ঠেকাল ফুয়াদ। ডেবে থাকা খুলির অর্ধবৃত্তাকার জায়গার সঙ্গে খাপে খাপে মিলে গেল পাথর দুটো।

এরপর সোয়াহিলি ভাষায় কয়কয়কে দ্রুত কী যেন বলল ফুয়াদ। তার কথা শেষ হতে কয়কয় শুরু করল, তবে পোর্টারদের উদ্দেশে। সবাই তারা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল।

এরপরই রোমহর্ষক কাজটা করল ফুয়াদ। হাত দুটোর মাঝখানে প্রচুর ব্যবধান রেখে উপরে তুলল, তারপর এরইমধ্যে বিধ্বস্ত খুলিতে

গায়েব সর্বশক্তি দিয়ে নামিয়ে আনল পাথরের দাঁড় দুটো।

ভোঁতা আওয়াজটা অসুস্থকর। রক্তের ছিটা লাগল তার শার্টে। কিন্তু খুলিটার নতুন কোন ক্ষতি সে করতে পারেনি।

'দেখলেন তো, মিস্টার সেন?' আনন্দর দিকে ফিরে বলল ফুয়াদ। 'এরকম একটা কাজ করার মত শক্তি মানুষের নেই। বিশ্বাস না হলে নিজে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

দ্রুত মাথা নাড়ল আনন্দ।

সিধে হলো ফুয়াদ। 'বাদাউই-এর পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে হামলাটা যখন হয় তখন সে দাঁড়িয়ে ছিল। পায়ের ছাপ দেখে মনে হচ্ছে প্রাণীটা হয়তো মানুষের চেয়ে বড় নয়। তবে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। জাত হয়তো আলাদা, তবে গরিলাই।'

আনন্দ কোন জবাব দিতে পারল না।

জবাব দিতে না পারলেও, ব্যাপারটা আনন্দ মেনে নিতে পারছে না। গরিলারা পাথরের হাতিয়ার তৈরি করছে, সেই হাতিয়ার ব্যবহার করছে মানুষের খুলি ফাটাবার জন্য, এ স্রেফ অসম্ভব। এ যদি সম্ভব হয়, তা হলে বলতে হবে গরিলা সম্পর্কে এতদিন সে যা ভেবে এসেছে তার সবই ভুল ছিল।

মন এমনিতেই খারাপ, শৈলীর খোঁজে কাউকে কিছু না বলে ঝরণার কাছে চলে এল সে। কিনারার একটা পাথরে বসে মুখ-হাত ধুচ্ছে আর চিন্তা করছে। এই সময় স্রোতের উল্টোদিকের ঝোপ-ঝাড় নড়ে উঠল।

ঝট করে মুখ তুলল আনন্দ। বুক সমান উঁচু ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর থেকে একটা কালো পুরুষ গরিলা মাথা তুলল। আনন্দ প্রথমে ভয় পেলেও, একটু পরই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল। তার মনে পড়ে গেছে গরিলারা কখনোই খোলা জলাশয় পার হয় না। নাকি ওদের সম্পর্কে এটাও একটা ভুল ধারণা?

পানির ওপার থেকে তাকে দেখছে গরিলা। তাকানোর ভঙ্গির মধ্যে কোন হুমকি নেই, থাকলে শুধু সতর্ক কৌতূহল আছে। গরিলার গা থেকে বাসী একটা গন্ধ এসে লাগল নাকে। থ্যাবড়া নাক থেকে

হিসহিস করে নিঃশ্বাস পড়বার আওয়াজ ভেসে এল। কী করা যায় ভাবছে আনন্দ, এই সময় গরিলাটা ঝোপ-ঝাড় ঝাঁকিয়ে ঘুরেই ছুটল।

গরিলা চলে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে দাঁড়াল আনন্দ, এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটা ঠিকমত যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছছে, এই সময় ঝরণার ওপারে সেই একই জায়গার ঝোপ-ঝাড় আবার নড়ে উঠতে দেখল সে।

আরও পাঁচ-সাত সেকেন্ড পর আরেকটা গরিলা ঝোপের ভিতর থেকে মাথা তুলল। এটা ছোটখাট। সম্ভবত মেয়ে, তবে আনন্দ নিশ্চিত নয়। দ্বিতীয় গরিলাটাও খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। তারপর সে তার হাত নাড়ল।

'আনন্দ, এসো, আদর দাও।'

'শৈলী!' চেঁচিয়ে উঠল আনন্দ। এক মুহূর্ত পর অগভীর ঝরণার পানি চারদিকে ছিটিয়ে ছুটল সে। অপর পাড়ে পৌঁছাতেই শৈলী আলিঙ্গন করল ওকে।

ঝরণার এপার থেকে, একটা ঝোপের আড়ালে বসে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দৃশ্যটা দেখল রানা। ওর হাতে একটা অটোমেটিক রাইফেল রয়েছে। আনন্দ টের পায়নি, বন্ধুর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই পিছু নিয়ে এসেছে ও। ওর সঙ্গে এখন সিসিলিয়াও যোগ দিল।

শৈলী ফিরে এসেছে, সেই আনন্দে হাসছে ওরা।

শৈলীর অপ্রত্যাশিত ফিরে আসা মারাত্মক একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে যাচ্ছিল। পোর্টাররা অত্যন্ত সতর্ক আর উত্তেজিত হয়ে আছে, ফলে ওকে দেখেই বাদাউই-এর খুনী ভেবে গুলি করতে যাচ্ছিল তারা। ঝট করে সামনে এগিয়ে নিজের শরীর দিয়ে ওকে আড়াল করল আনন্দ, ফলে একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে রাইফেল নামিয়ে নিল পোর্টাররা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শৈলীর উপস্থিতি আবার সবাই মেনে নিল। আর সুযোগ পাওয়া মাত্র এটা-সেটা দাবি করতে লাগল শৈলী।

তার অনুপস্থিতিতে ওরা দুধ আর কুকি সংগ্রহ করেনি শুনে যারপরনাই বেজার হলো ও। তারপর ফয়াদের হাতে শ্যাম্পেনের

একটা বোতল দেখে জানাল, সাধা হলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে রাজি আছে।

ওকে ঘিরে গোল হয়ে বসল সবাই, অনেকের হাতেই টিনের কাপ ভর্তি শ্যাম্পেন। ইতোমধ্যে আনন্দর সঙ্গে কথা বলেছে রানা। জরুরি কয়েকটা বিষয়ে শৈলীকে প্রশ্ন করা দরকার। আনন্দ রাজি হয়েছে।

'শৈলী চলে গিয়েছিল কেন?' প্রথম প্রশ্নটা রানাই করল।

কাপে নাক ডুবিয়ে শৈলী সংকেত দিল: 'শ্যাম্পেন নাকে সুড়সুড়ি দেয়। শ্যাম্পেন জিনিসটা ভাল।'

'শৈলী, রানা তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছে,' বলল আনন্দ। 'জবাব দাও। তুমি চলে গিয়েছিলে কেন?'

রানার দিকে তাকাল শৈলী: 'আনন্দ শৈলীকে পছন্দ করে না।'

আনন্দ বলল, 'কথাটা ঠিক নয়। আনন্দ শৈলীকে ভালবাসে।'

'আনন্দ শৈলীকে ব্যথা দেয়। গায়ে পিন গাঁথে। আনন্দ শৈলীকে পছন্দ করে না। শৈলীর মন খারাপ–মন খারাপ।'

'শৈলীও জানে আনন্দ শৈলীকে ভালবাসে,' বলল রানা। 'শৈলী এখন বলবে কেন সে চলে গিয়েছিল।'

'আনন্দ আদর করে না। আনন্দ ভাল না। আনন্দ মানুষ ভাল না। শৈলীকে পছন্দ করে না। শৈলী দুঃখিত দুঃখিত দুঃখিত।'

'শৈলী কোথায় গিয়েছিল?'

'শৈলী গরিলাদের কাছে গিয়েছিল। ভাল গরিলা। শৈলীকে পছন্দ করে।'

আনন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠল। শৈলী কি এই ক'দিন বুনো একদল গরিলাদের সঙ্গে ছিল? তা যদি থেকে থাকে, ঘটনা হিসাবে এটার বিরাট গুরুত্ব আছে। ভাষায় দক্ষ একটা প্রাইমেট বুনো একটা গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, পরে আবার ফিরে এসেছে! আনন্দকে আরও অনেক কিছু জানতে হবে। 'গরিলারা শৈলীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে?'

শৈলীর চেহারায় আত্মতৃপ্তির একটা ভাব ফুটল: 'হ্যাঁ।'

'শৈলী আনন্দকে সব কথা খুলে বলুক।'

দূরে তাকিয়ে থাকল শৈলী, জবাব দিচ্ছে না।

ওর মনোযোগ ফেরাবার জন্য আঙুল মটকাল আনন্দ। তার দিকে ধীরে ধীরে ফিরল শৈলী, চেহারায় বিরক্তি।

'শৈলী আনন্দকে বলুক। শৈলী গরিলাদের সঙ্গে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'শৈলী খুলে বলুক গরিলাদের সঙ্গে কেমন ছিল সে।'

'ভাল গরিলা। শৈলীকে পছন্দ করে। ভাল গরিলা।'

আসলে ওদেরকে শৈলী কোন তথ্যই দিচ্ছে না। একই কথা বারবার বলবার মানে ওদেরকে অগ্রাহ্য করছে ও।

'শৈলী।'

আনন্দর দিকে তাকাল শৈলী।

'শৈলী আনন্দকে বলুক। শৈলী গরিলাদের কাছে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'গরিলারা কী করল?'

'গরিলারা শৈলীর গন্ধ শুঁকল।'

'সব গরিলা?'

'বড় গরিলা। কালো গরিলা শৈলীকে শুঁকল। বাচ্চা গরিলা। শৈলীকে শুঁকল। শৈলীকে পছন্দ করল।'

'তারপর শৈলীর কী হলো?'

'গরিলারা শৈলীকে খাবার দিল।'

'কী খাবার?'

'নাম নেই। শৈলীকে খাবার দিল।'

খাবার দিল, এর মানে সম্ভবত খাবার দেখিয়েছে। নাকি সত্যি খাইয়েছে ওকে? জঙ্গলে এ-ধরনের কিছু কখনোই ঘটেনি, তবে এ-ও সত্যি যে নতুন একটা পশুর দলে যোগ দেওয়ার ঘটনা এখন পর্যন্ত কেউ চাক্ষুষও করেনি। শৈলী একটা মেয়ে, গর্ভধারণ করবার বয়সও প্রায় হয়ে এসেছে।

'শৈলী গরিলাদের সঙ্গে থাকল?'

'শৈলীকে গরিলারা পছন্দ করল।'

'ঠিক আছে। শৈলী কী করল?'

'শৈলী ঘুমাল। শৈলী খেল।'

তারমানে শৈলী গরিলাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দিন ক'টা পার করে দিয়েছে। 'গরিলাদের পছন্দ করল শৈলী?'

'গরিলারা বোকা।'

'কেন বোকা?'

'গরিলারা কথা বলতে জানে না।'

'ইঙ্গিতেও কথা বলতে পারে না?'

'গরিলারা কথা বলতে পারে না।'

'শৈলী ফিরে এল কেন?'

'শৈলী দুধ আর কুকি চায়।'

'শৈলী,' বলল আনন্দ, 'তুমি খুব ভাল করেই জানো যে আমাদের কাছে দুধ বা কুকি নেই!' কথাটা শুনে শৈলীর চারপাশে বসা সবাই বিস্মিত হলো। শৈলীর দিকে তাকাল তারা, চোখে প্রশ্ন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল শৈলী। তারপর জানাল: 'শৈলী আনন্দকে ভালবাসে। শৈলী কষ্ট পেল, আনন্দকে ফিরে চাইল।'

আনন্দ বুঝতে পারছে, আবার কেঁদে ফেলবে সে।

'আনন্দ মানুষ ভাল।'

চোখ মিটমিট করে আনন্দ সংকেত দিল, 'আনন্দ শৈলীকে আদর করবে।'

আনন্দর দু'বাহুর ভিতর ঢুকে পড়ল শৈলী।

'উত্তর দিতে বড় বেশি সময় নিচ্ছে শৈলী,' অভিযোগের সুরে বলল রানা। একটু রেগে গেছে ও, সেটা চেপেও রাখছে না। 'আর তুইও ঠিক বুঝতে পারছিস না ওকে আসলে কী ধরনের প্রশ্ন করতে হবে।'

আনন্দ মুখ কালো করে বলল, 'সেক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো তুই নিজে কেন করছিস না?' তার কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জের সুর। 'ওর উত্তরগুলো আমি অনুবাদ করে দিই।'

'ঠিক আছে, ওকে তুই বলে দে যে বিষয়টা সিরিয়াস, উত্তরগুলো যেন ঠিকমত দেয়।'

পাঁচ মিনিট পর শৈলীকে চকলেট খেতে দিয়ে শুরু করল রানা। 'শৈলী, রাতে কী ঘটল? গরিলাদের সঙ্গে?'

শৈলী এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন এই প্রশ্নের উত্তর তো সবারই জানা। জবাব দিল: 'শৈলী ঘুমিয়েছে।'

ওর সাংকেতিক উত্তর দ্রুত অনুবাদ করছে আনন্দ।

'আর বাকি সব গরিলা?'

'গরিলারা রাতে ঘুমায়।'

'সব গরিলা?'

এটার উত্তর দিতে চাইছে না শৈলী। চেহারায় অনিচ্ছুক ভাব।

'শৈলী,' বলল রানা, 'রাতের বেলা আমাদের ক্যাম্পে গরিলা এসেছিল।'

'এসেছিল? এই জায়গায়?' এই প্রথম প্রশ্ন করল শৈলী।

'হ্যাঁ, এই জায়গায়। রাতে এসেছিল গরিলারা।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে জবাব দিল শৈলী: 'না।'

'না নয়। হ্যাঁ। ওরা এসেছিল।'

এবারও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকবার পর জবাব দিল শৈলী: 'জিনিস এসেছিল।'

রানা জানতে চাইল, 'কী জিনিস, শৈলী?'

'খারাপ জিনিস।'

রানা বলল, 'তারা কি গরিলা, শৈলী?'

'গরিলা নয়। খারাপ জিনিস। অনেক খারাপ জিনিস জঙ্গলে আসে। দম ফেলে। বাতাসের ভাষায় কথা বলে। রাতে আসে।'

রানা জানতে চাইল, 'এখন তারা কোথায়, শৈলী?'

জঙ্গলের চারদিকে চোখ বুলাল শৈলী: 'এখানে। এই খারাপ জায়গায়...পুরানো জিনিস আসে।'

'কী জিনিস, শৈলী? তারা কি পশু?' জানতে চাইল রানা।

এখানে নাক গলাল আনন্দ। সে বলল, শৈলী পশু বলতে মানুষকেও বোঝে। সে জিজ্ঞেস করল, 'শৈলী, খারাপ জিনিস মানুষ কি না? হিউম্যান পারসন?'

'না।'

আবার রানা প্রশ্ন করল, 'বানর?'

'না! খারাপ জিনিস। রাতে ঘুমায় না।'

আনন্দর দিকে তাকাল রানা। 'ওর ওপর কি আস্থা রাখা যায়?'

'কী বলা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' রানাকে বলল আনন্দ। 'পুরোপুরি।'

'ও জানে, কাদেরকে গরিলা বলে?'

আনন্দ রানার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় পেল না, তার আগে শৈলী সংকেত দিল: 'শৈলী ভাল গরিলা।'

'হ্যাঁ, তুমি ভাল,' বলল আনন্দ, রানার দিকে তাকাল। 'শৈলী বলছে, সে ভাল গরিলা।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তারমানে গরিলাদের চেনে ও, অথচ বলছে জিনিসগুলো গরিলা নয়?'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছে।'

'তার মানে বোধহয় কালোগুলোকে গরিলা বলছে শৈলী, আর ধূসরগুলোকে বলছে জিনিস।' রানা চিন্তিত। 'তা হলে এই জঙ্গলের দুই ধারে দু'জাতের গরিলা বাস করছে।'

ফুয়াদ আর আনন্দর সাহায্য নিয়ে শহরতলীতে ভিডিও ক্যামেরা ফিট করল রানা, ক্যাম্পের দিকে মুখ করে। ভিডিও টেপ চালু করে দিয়ে শৈলীকে নিয়ে ক্যাম্পের কিনারায় চলে এল ও, বিধ্বস্ত দালানগুলো দেখাবে। ও চাইছে নিখোঁজ শহরটার মুখোমুখি হোক শৈলী। চাইছে সেই বিশেষ মুহূর্তের রেকর্ড রাখতে। শৈলীর প্রতিক্রিয়া আনন্দর গবেষণায় কাজে লাগতে পারে, ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে ওর দুঃস্বপ্নগুলোর। কিন্তু ফল হলো অপ্রত্যাশিত।

শৈলীর কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না।

সম্পূর্ণ শান্ত থাকল ও, পেশীতে এতটুকু টান নেই। কিছুই করল না, শুধু শান্ত মেজাজে শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'শৈলী এই জায়গা চেনে?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'শৈলী চেনে।'

'আনন্দকে শৈলী বলুক এটা কী জায়গা।'

'খারাপ জায়গা...পুরানো জায়গা।'

'কেন খারাপ, শৈলী?'

'খারাপ, খারাপ। পুরানো খারাপ।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন, শৈলী?'

'শৈলী ভয় পাচ্ছে।' মুখে যাই বলুক, শৈলীর আচরণে কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র নেই।

'শৈলী কেন ভয় পাচ্ছে?'

'শৈলী খেতে চায়।'

'শৈলী ভয় পাচ্ছে কেন?'

ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল শৈলী, আপাতত আর কোন প্রশ্নের উত্তর সে দেবে না।

আনন্দ, ফুয়াদ আর সিসিলিয়াকে নিয়ে সকালের বাকি সময়টা ঘন বাঁশঝাড় আর বিভিন্ন গাছের ঝুরি কাটতে ব্যয় করল রানা। জিঞ্জ শহরের মাঝখানে যে-সব দালান-কোঠা আছে, ওগুলোর কাছে পৌঁছানোর এটাই একমাত্র উপায়।

বেলা যত বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভ্যাপসা গরম। দুপুরের দিকে ওদের পরিশ্রম সার্থক হলো। সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের কাঠামো আবিষ্কার করল ওরা, শহরের আর কোথাও নেই। দেখেই বোঝা যায়, কাঠামোগুলো তৈরি করতে ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান কাজে লাগানো হয়েছে। বিশাল গুহার মত জায়গাকে একই ছাদের তলায় এবং চার দেয়ালের ভিতর আনা হয়েছে, মাটির তলায় নেমে গেছে তিন বা চারতলা পর্যন্ত।

মাটির তলার নির্মাণ শৈলী দেখে সিসিলিয়া উৎফুল্ল, কারণ এতে প্রমাণ হয় যে শহরের লোকেদের মাটি খোঁড়ার কারিগরি বিদ্যা জানা ছিল–আর হীরের খনি পেতে হলে এই বিদ্যা না জানলে চলবেই না।

সবাই খুব উৎসাহ বোধ করলেও, শহরের গভীরে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ওরা পেল না। নীচেটা দেখা শেষ করে দালানগুলোর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফিরে এল ওরা। এদিকের দেয়ালে আরও ব্যাস-রিলিফ পাওয়া গেল। পাশাপাশি কয়েকটা কামরায় প্রচুর ছবি দেখে ওরা নামকরণ করল, গ্যালারি। স্যাটেলাইটের সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরার সংযোগ দিয়ে ছবিগুলো পরীক্ষা করা হলো।

দেয়ালগুলোয় সাধারণ শহুরে জীবন চিত্রিত করা হয়েছে। আগুনের ধারে বসে রান্নাবান্না করছে মেয়েরা, লাঠি আর বল নিয়ে খেলছে ছেলেমেয়েরা, মাটিতে উবু হয়ে বসে মাটির বড়ি বা ট্যাবলেটের সাহায্যে হিসাব মিলাচ্ছে কেরানি।

একটা দেয়ালে শুধুই শিকারের দৃশ্য। পুরুষরা সবাই শুধু নেঙটি পরে আছে, প্রত্যেকের হাতে বল্লম।

সবশেষে মাইনিং-এর দৃশ্য–মাটির ভিতর থেকে সুড়ঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসছে লোকজন, সবাই বাস্কেট বা ঝুড়ি বইছে।

একটা জিনিসের অভাব খুব সহজেই ওদের চোখে ধরা পড়ল। জিঞ্জবাসীরা শিকারের জন্য কুকুর পালত, শখ করে পালত বিড়ালও, কিন্তু কোন ছবিতে এমন পশুর দেখা মিলল না যেগুলো ভার বহন করতে পারে। সমস্ত কায়িক পরিশ্রম ক্রীতদাসরাই করছে। চাকার ব্যবহারও তারা জানত না। সবই ঝুড়িতে ভরে হাতে করে বহন করা হত।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ রানা বলল, 'আরও একটা জিনিস নেই!'

ডায়মন্ড মাইন-এর দৃশ্য দেখছিল ওরা। গভীর গর্ত থেকে ঝুড়ি নিয়ে উঠে আসছে লোকজন, প্রতিটি ঝুড়ি দামী পাথরে ভর্তি।

'কী?' জানতে চাইল সিসিলিয়া। 'আর কী নেই?'

'পেয়েছি!' আবিষ্কারের আনন্দে রানা উৎফুল্ল। 'পুলিশ নেই!'

সিসিলিয়া হেসে ফেলল। তবে সে উপলব্ধি করছে, পুলিশের অভাব রানার চোখেই সবার আগে ধরা পড়বার কথা, কারণ এক অর্থে ও নিজেই যেহেতু একজন পুলিশ।

সিসিলিয়ার দেখাদেখি আনন্দও হাসছে।

তবে রানা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করল, ওর এই অবজারভেশন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'শোনো। শুধু হীরের খনি থাকায় শহরটা এখানে গড়ে ওঠে, তা না হলে এরকম দুর্গম জঙ্গলে ওরা বাস করতে আসত না। জিঞ্জ ছিল খনি সভ্যতা–তার সম্পদ, ব্যবসা, দৈনন্দিন জীবন, সমস্ত কিছু নির্ভর করত মাইনিং-এর ওপর। বেঁচে থাকার ছিল এই একটাই মাত্র অবলম্বন, অথচ এটাকে তারা পাহারা

দিয়ে রাখার কথা ভাবল না, একটা নিয়ম-শৃংখলার ভেতর আনল না?'

সিসিলিয়া যুক্তি দিল, 'ওদের হয়তো পাহারার দরকার হয়নি। জিঞ্জ সমাজ হয়তো সুশৃংখল আর শান্তিময় ছিল।'

মাথা নাড়ল রানা। 'মানুষের স্বভাব চিরকালই এক।'

গ্যালারি থেকে খোলা একটা উঠানে নেমে এল ওরা, চারদিকে লতানো গাছ আর শিকড় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। উঠানের এক ধারে অনেকগুলো পিলারের মাথায় মন্দিরের মত একটা কাঠামো দেখল ওরা। তারপর ওদের দৃষ্টি কেড়ে নিল উঠানের মেঝেতে লতা আর শিকড়ের ভিতর আধ চাপা অবস্থায় পড়ে থাকা পাথরের তৈরি অনেকগুলো দাঁড়। ঠিক এরকম এক জোড়াই পেয়েছিল ফুয়াদ।

'আমার কাছে এর কোন ব্যাখ্যা নেই,' বিড় বিড় করে বলল আনন্দ, উঠান ভর্তি দাঁড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে মন্দিরের দিকে এগোচ্ছে সে।

যেটাকে ওরা মন্দির বলছে, বড়সড় একটা চৌকো ঘর সেটা। সিলিং কয়েক জায়গায় ভেঙে পড়েছে, রোদ ঢুকছে ভিতরে। শিকড় আর ঝোপ দিয়ে তৈরি দশ ফুট উঁচু একটা স্তম্ভ দেখল ওরা, পিরামিড আকৃতির। তারপর ওটাকে একটা মূর্তি বলে চেনা গেল।

স্ট্যাচুর উপর উঠে ডাল-পালা আর শিকড় কাটতে দেখা গেল ফুয়াদকে। কাজটা খুব কঠিন। পাথরের ফাটল আর ভাঁজের ভিতর সেঁধিয়ে গেছে শিকড়গুলো। উপর থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নীচে, রানার দিকে তাকাল সে। 'আরও পরিষ্কার করব, সার?'

'নেমে এসে দেখো,' বলল রানা, চেহারায় অদ্ভুত একটা ভাব।

স্ট্যাচু থেকে নেমে এল ফুয়াদ। রানার পাশে পৌঁছাল। তারপর ঘুরে তাকাল।

স্ট্যাচুটায় ফাটল ধরেছে, রঙও বদলে গেছে, তবে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রকাণ্ড একটা গরিলাকে চিনতে ফুয়াদের কোন অসুবিধে হলো না। গরিলার চোখ দুটো টকটকে লাল, চেহারায় ক্রোধ। হাত দুটো দু'দিকে প্রসারিত; প্রতিটি হাতে একটা করে পাথুরে দাঁড়–প্রতীক চিহ্নের মত–দুটোকে এক করবার জন্য তৈরি।

'ও খোদা!' বিড়বিড় করল ফুয়াদ।

রানার আরেক পাশ থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে আনন্দ উচ্চারণ করল, 'হে ভগবান!'

'গরিলা,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল রানা।

'গোটা ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার,' বলল সিসিলিয়া। 'এখানকার লোকজন গরিলাদের পুজো করত। এটা ছিল তাদের ধর্ম।'

'কিন্তু শৈলী তা হলে কেন বলছে ওরা গরিলা নয়?'

'ধূসর গরিলারা ভাল নয়, বোধহয় তাই ওগুলোকে গরিলা না বলে জিনিস বলছে ও,' বলল রানা, হাতঘড়ির উপর চোখ। 'ফুয়াদ, এসো, আজ রাতের জন্যে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে বলে দিই তোমাকে।'

ষোলো

রানার নির্দেশে পেরিমিটার ফেন্স-এর বাইরে একটা পরিখা খনন করল ওরা। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধরে কাজ করতে হলো ওদেরকে। কাছাকাছি ঝরণার গতিপথ বদলে পরিখায় পানি ভরবার সময় লাল নাইট লাইট অন করতে হল।

সিসিলিয়া আর আনন্দর ধারণা, পরিখাটা অতি নগণ্য একটা বাধা–মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীর ওটা, দেড় ফুট চওড়া। যে-কোন মানুষ এক লাফে পেরিয়ে আসতে পারবে।

পরিখার ওপারে দাঁড়িয়ে রানা ডাকল, 'শৈলী, এদিকে এসো, তোমাকে আমি আদর করি।'

খুশিতে হুপ-হুপ করে উঠল শৈলী। লাফিয়ে ছুটল রানার দিকে, কিন্তু পানির কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াল।

'এসো, আদর দিই,' আবার বলল রানা, হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে। 'এসো, লক্ষ্মীটি।'

তারপরও শৈলী পানি পার হচ্ছে না।

লাফ দিয়ে এপারে এসে শৈলীর একটা হাত ধরল রানা। 'চলো, আমি থাকতে কোনও ভয় নেই তোমার।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে পানিটুকু পার হয়ে এল শৈলী।

খানিক পর ডিনার পরিবেশিত হলো। সবাই খুব নার্ভাস হয়ে আছে, বসেছে আগুনের যতটা কাছাকাছি সম্ভব।

অন্যান্য দিনের চেয়ে ডিনারটা আজ তাড়াতাড়ি শেষ হলো। ফুয়াদের নির্দেশ পেয়ে অস্ত্র আর গোলাবারুদ পরীক্ষা করতে চলে গেল কয়কয়।

আনন্দকে একপাশে ডেকে রানা বলল, 'তোর তাঁবুতে চেইন দিয়ে আটকে রাখ শৈলীকে। আজ রাতে যদি গোলাগুলি হয়, আমি চাই না অন্ধকারে ছুটোছুটি করুক ও।'

আনন্দকে অসন্তুষ্ট দেখাল। 'ব্যাপারটাকে খুব খারাপভাবে নেবে ও।'

'নিলেও কিছু করার নেই। পোর্টাররা অন্য একটা গরিলা বলে মনে করতে পারে শৈলীকে। ওকে ভাল করে বোঝা যে গোলাগুলি শুরু হলে প্রচুর শব্দ হবে, ও যেন তখন ভয় না পায়।'

'অনেক গোলাগুলি হবে?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'হতে পারে।'

তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে শৈলীকে আনন্দ বেঁধে রাখল বটে, ওর কাছ থেকে কথাও আদায় করল যে তাঁবু ছেড়ে বাইরে যাবে না ও, কিন্তু গোটা ব্যাপারটা আসলে একটা প্রতীকী আয়োজন। শৈলী চাইলে চেইনটা যখন খুশি খুলে ফেলতে পারবে।

আনন্দ যেন নতুন একটা জগতে বেরিয়ে এল।

লাল নাইট লাইট নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, তবে ক্যাম্পফায়ারের কাঁপা কাঁপা আলোয় সে দেখল অদ্ভুতদর্শন গগলস্ পরা সেন্ট্রিরা ক্যাম্পের চারদিকে পজিশন নিয়ে স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে। ইলেকট্রিফাইড ফেন্স থেকে বেরিয়ে আসা মৃদু গুঞ্জন যোগ হওয়ায় পরিবেশটাকে কেমন যেন অলৌকিক লাগছে। হঠাৎ করে নিজেদের

অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে পারল আনন্দ–কঙ্গোর বিপজ্জনক রেইন ফরেস্টে আটকা পড়েছে অল্প কয়েকজন আতঙ্কিত লোক, কাছাকাছি লোক বসতি থেকে দুশো মাইলেরও বেশি দূরে।

অপেক্ষা করছে।

মাটিতে পড়ে থাকা একটা কেবল্-এ হোঁচট খেল আনন্দ। চোখ নামিয়ে তাকাল সে। কেবল্-এর গোটা একটা নেটওঅর্ক দেখতে পেল, সাপের মত আঁকাবাঁকা হয়ে পড়ে রয়েছে কমপাউন্ডের চারদিকে, একটা করে প্রতিটি সেন্ট্রির কাছে পৌঁছেছে।

অস্ত্রগুলোর আকৃতিও অচেনা লাগল আনন্দর–খুব বেশি সরু, পার্টস খুব কম। কালো কেবল্গুলো অস্ত্র থেকে বেরিয়ে হোঁতকা চেহারার একটা মেকানিজমে ঢুকেছে, সেটা ছোট একটা তেপায়ায় ফিট করা, এরকম অনেক তেপায়া খানিক পর পর ক্যাম্পের চারদিকে বসানো রয়েছে।

রানাকে আগুনের কাছে দেখতে পেল আনন্দ, হাতে টেপ রেকর্ডার।

'এ-সব কী বল তো?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে, ইঙ্গিতে কেবল্গুলো দেখাল।

'ওগুলো LATRAP, লেযার-ট্র্যাকিং প্রোজেক্টাইল-এর জন্যে,' ফিসফিস করল রানা।

গোটা আয়োজনটা জটিল, ব্যাখ্যা করাটা বিরাট ঝামেলার কাজ। রানা যতটা পারে সংক্ষেপে সারল।

সেন্ট্রিদের হাতের অস্ত্রগুলো আসলে লেযার-গাইডেড সাইট ডিভাইস, তেপায়ায় বসানো র‍্যাপিড-ফায়ারিং সেনসর ডিভাইসের সঙ্গে সংযুক্ত। ডিভাইস বা যন্ত্রগুলো টার্গেটে লক হবে, টার্গেট সনাক্ত হওয়ার পর গুলিও করবে। র‍্যাপিড ফায়ারিং-সেনসর ডিভাইস-এ সাইলেন্সার লাগানো আছে, ফলে শত্রুরা জানতে পারবে না কোত্থেকে ফায়ারিং হচ্ছে।

সবশেষে রানা বলল, 'শুধু খেয়াল রাখতে হবে ওগুলোর সামনে যেন না পড়িস, কারণ শারীরিক তাপ পেলে আপনাআপনি লক হয়ে যায়!'

টেপ রেকর্ডারটা আনন্দর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফুয়েল সেল পরীক্ষা করতে চলে গেল রানা। এই ফুয়েল সেল পেরিমিটার ফেন্সে পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে।

আলোর বাইরে, অন্ধকারে চোখ ঘুরিয়ে সেন্ট্রিদের দেখছে আনন্দ। একজন তার উদ্দেশে হাত নাড়ল। কাঠামোটা ফুয়াদের বলে চিনতে পারল সে।

সিসিলিয়াকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সে বোধহয় নিজের তাঁবুতে ঘুমাচ্ছে।

বাইরে ওরা সবাই কিছু ঘটবার আশঙ্কায় অপেক্ষা করছে।

এক ঘণ্টা পেরুল, তারপর দু'ঘণ্টা। পরিখায় প্রবাহিত পানির আওয়াজ ছাড়া কমপাউন্ডের আশপাশে অন্য কোন শব্দ নেই।

মাঝে মধ্যে পোর্টাররা নিজেদের ভাষায় পরস্পরকে ডাকছে, হাসি-ঠাট্টা করছে, তবে চারদিকে হিট-সেন্সিং মেশিনারি থাকায় ভুলেও কেউ ধূমপান করছে না।

মধ্যরাত পার হলো। তারপর একটা বাজল।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে খুঁজল সিসিলিয়া। ফিসফিস করে কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। খানিক পর আগুনের ধারে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল সে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল, একটা আঙুল নাইট লাইটের সুইচে আটকে আছে।

সেদিকে একবার তাকিয়ে হাই তুলল আনন্দ। দেখল সিসিলিয়ার পাশে এসে রানাও বসল। মোটামুটি সবাই ধরে নিয়েছে, আজ রাতে কিছু ঘটবে না।

আনন্দ ভাবল, রানার ধারণা আসলে ভুল। কান পাতল সে। ইলেকট্রিফাইড ফেন্সের গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠছে আরেকটা আওয়াজ। তার তাঁবুতে নাক ডাকছে শৈলী।

হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল আনন্দ। রানা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, মাথাটা একদিকে কাত করা।

আবার কান পাতল আনন্দ।

এবার বাকি দুটো শব্দ ছাড়াও অন্য একটা আওয়াজ শুনতে পেল সে। ফোঁস-ফোঁস। শ্বাস ফেলবার শব্দ। বড় বড় শ্বাস। যেন কেউ ভয়

দেখাবার জন্য ওভাবে নিঃশ্বাস ফেলছে। না কি কিছু বলতে চায়?

সেন্ট্রিরাও শুনেছে, অন্ধকারে নিজেদের অস্ত্র ঘোরাচ্ছে তারা।

আনন্দর হাত থেকে নিয়ে রেকর্ডার মাইক্রোফোনটা শব্দগুলোর দিকে তাক করতে চাইছে রানা, কিন্তু উৎস সঠিক চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দ এবার গোটা জঙ্গলের চারদিক থেকে ভেসে আসছে কুয়াশায় ভর করে।

কাঁটাগুলোকে রেকর্ডিং গজে কাঁপতে দেখল রানা। তারপর একটা কাঁটা লাল ঘরে ঢুকল। সেই মুহূর্তের ভোঁতা একটা আওয়াজ শুনল রানা। পানি ছলকে ওঠায় বোঝা গেল পরিখায় ভারী কিছু একটা পড়েছে।

আওয়াজটা সবাই শুনেছে। সেন্ট্রিরা সেফটি অফ করল।

ধীর পায়ে, অত্যন্ত সাবধানে টেপ রেকর্ডার নিয়ে পেরিমিটার ফেন্সের দিকে এগোল রানা। ইতোমধ্যে ঘুম ভেঙেছে সিসিলিয়ার, কী ঘটছে বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত নিল রানাকে একা কোথাও যেতে দেবে না। সিধে হলো সে, হন-হন করে রানার দিকে এগোল।

পেরিমিটার ফেন্সের কাছে পৌঁছে পরিখার দিকে তাকাল রানা। বেড়ার সামনে গাছের ডাল-পালা আর ঝোপ-ঝাড় নড়ছে। পানির কলকল আওয়াজ শুনে সেদিকে তাকাল ও। দেখল একটা মরা গাছের বিরাট কাণ্ড আড়াআড়িভাবে পরিখার উপর পড়ে রয়েছে।

ভারী আর ভোঁতা আওয়াজটা কী জন্য হয়েছে বোঝা গেল। পরিখার উপর একটা সেতু তৈরি করেছে প্রতিপক্ষ।

'সর্বনাশ!' রানার পিছন থেকে ফিসফিস করল সিসিলিয়া। 'গরিলাদের এত বুদ্ধি হয় কী করে?'

প্রতিপক্ষ আসলে কারা, এখনও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই কারও। তবে সেতুটা দেখামাত্র রানা উপলব্ধি করল, যাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাদেরকে খুব ছোট করে দেখেছে ওরা।

হঠাৎ চোখের কোণে একটা নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। ঘাড় ফেরাতে দেখল ফুয়াদ হাত নেড়ে পেরিমিটারের কাছ থেকে পিছু হটবার অনুরোধ করছে ওদেরকে। শুধু তাই নয়, ইঙ্গিতে নিজের পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে থাকা তেপায়াটাও দেখাচ্ছে।

সিসিলিয়াকে নিয়ে রানা সরে আসবার আগেই মাথার উপর গাছের ডাল থেকে চেঁচামেচি আর লাফালাফি শুরু করে দিল বানরের দল। আর তারপরই হামলা করল গরিলারা।

মাঝারি আকারের একটা গরিলাকে এক পলকের জন্য দেখতে পেল রানা, গায়ে ধূসর লোম, সরাসরি ওদেরকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। শৈলীর ভাষায় এরাই হল জিনিস।

পিছু হটল রানা, সিসিলিয়াকে আড়াল করল, তারপর দু'জনেই নিচু হলো। এক সেকেন্ড পর ইলেকট্রিফাইড ফেন্সের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খেল গরিলাটা। শাওয়ারের মত খসে পড়তে দেখা গেল রাশি রাশি আগুনের ফুলকি। বাতাস ভারী হয়ে উঠল মাংস পোড়া গন্ধে।

এমারেল্ড লেযার বিম ছুটোছুটি করছে শূন্যে, তেপায়ার উপর বসানো মেশিনগান নরম টে-টে-টে আওয়াজ করে বুলেট উদ্‌গিরণ করছে, যান্ত্রিক গুঞ্জন বেরুচ্ছে এইমিং মেকানিজম থেকে। প্রতি নয়টা বুলেটের পর একটা করে ফসফরাস ট্রেসার বেরুচ্ছে; ওদের মাথার উপর সবুজ আর সাদা আলো মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

ধূসর জিনিসরা হামলা চালাল চারদিক থেকে। ছ'টা জিনিস একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়ার উপর, বৈদ্যুতিক ধাক্কা আর নীল আগুনের ঝলক প্রতিহত করল ওগুলোকে। অন্য দিক থেকে আরও জিনিস ছুটে এল, একের পর এক পাতলা পেরিমিটার জাল-এর উপর ধাক্কা খাচ্ছে। অথচ গাছের বানরদের চেঁচামেচি আর আগুনের ফুলকি বিস্ফোরিত হওয়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই।

তারপর ওরা দেখল জিনিসরা গাছে চড়েছে। ক্যাম্পসাইট পর্যন্ত প্রসারিত ডালগুলোয় পৌঁছে ঝুলছে।

ফুয়াদ আর কয়কয় উপর দিকে গুলি করছে। নিঃশব্দ লেযার বিম নীচের ঝোপ-ঝাড়ে আঁকাবাঁকা রেখা তৈরি করছে।

আবার নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। কয়েকটা জিনিস বেড়া ভাঙবার চেষ্টা করছে। বুকটা ওর ছ্যাঁৎ করে উঠল, কারণ বেড়াটায় নিশ্চয়ই এখন আর বিদ্যুৎ নেই–জিনিসরা টানা-হ্যাঁচড়া করলেও আগুনের কোন ফুলকি দেখা যাচ্ছে না।

রানা উপলব্ধি করল, সূক্ষ্ম, সফিসটিকেটেড ইকুইপমেন্ট দিয়ে জিনিসদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ওদের এখন শব্দ ব্যবহার করা দরকার।

রানার মত ফুয়াদও একই কথা ভাবছে। সোয়াহিলি ভাষায় নিজের লোকদের গোলাগুলি বন্ধ করবার নির্দেশ দিল সে, তারপর রানাকে বলল, 'সার, সাইলেন্সার খুলে নিন! সাইলেন্সার, সার, সাইলেন্সার!'

কাছাকাছি তেপায়ার উপর বসানো মেকানিজমের কালো ব্যারেলটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে নিল রানা। প্রচণ্ড গরম ওটা, হাত পুড়ে যাওয়ায় গুঙিয়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে গুলির শব্দ ছাড়াও মড়মড় আওয়াজ হলো, ডাল ভেঙে গাছ থেকে নীচে খসে পড়ল দুটো জিনিস, একটা এখনও বেঁচে।

দ্বিতীয় তেপায়া থেকে সাইলেন্সার খুলে নিচ্ছে রানা, জিনিসটা ধেয়ে এল ওর দিকে। হোঁতকা চেহারার ব্যারেল ঘুরে গেল, খুব কাছাকাছি রেঞ্জ থেকে উড়িয়ে দিল হিংস্র জানোয়ারটাকে। ছিটকে এসে রানার চোখে-মুখে লাগল উষ্ণ তরল পদার্থ।

কান ঝালাপালা করা মেশিনগান ফায়ার আর বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধ ব্যতিব্যস্ত করে তুলল জিনিসদের, এলোমেলো বিশৃংখল ভঙ্গিতে পিছু হটল তারা।

ক্যাম্পের ভিতর নীরবতা নেমে এসেছে। তবে সেন্ট্রিরা এখনও লেযার শট ছুঁড়ছে, ফলে তেপায়ার মেশিনগুলো জঙ্গলের চারদিক দ্রুত স্ক্যান করছে টার্গেটের খোঁজে।

ওদের চারপাশের জঙ্গল স্থির হয়ে গেছে।

জিনিসরা চলে গেছে আপাতত।

জিনিসদের হাত-পা ছড়ানো লাশ মাটিতে পড়ে আছে, সকালের রোদে দ্রুত শক্ত হয়ে উঠছে ওগুলো।

দু'ঘণ্টা ধরে লাশ দুটো পরীক্ষা করল আনন্দ, দুটোই পরিণত বয়স্ক পুরুষ।

ধূসর রঙের পরিচ্ছদ বা লোমই সবচেয়ে বিস্ময়কর। ভিরুঙ্গার পাহাড়ী গরিলা আর উপকূলের কাছাকাছি নিচু এলাকার গরিলা, কঙ্গোর

পরিচিত এই দুই গোষ্ঠীর লোমই কালো। শিশুরা মাঝেমধ্যে খয়েরি রঙ নিয়ে জন্মায় বটে, কারও কারও নিতম্বে কিছু সাদাটে লোমও থাকে, তবে প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যেই গাঢ় হয়ে ওঠে সব। তারপর যখন বারো বছর বয়স হয়, নারী-পুরুষ দু'জনেরই পিঠ আর নিতম্বে কিছু সাদা ভাব দেখা যায়–ওগুলো আসলে শরীরে যৌবন আসবার লক্ষণ।

বয়স বাড়লে মানুষের মতই গরিলাদের চুলও পাকে। বেশিরভাগ পুরুষ গরিলার কানের লোম আগে পাকে, অর্থাৎ সাদা হয়ে ওঠে। বয়স আরও বাড়লে শরীরের অন্যান্য অংশেও এটা ঘটে। পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়সের কিছু গরিলার শরীর প্রায় পুরোটাই সাদা হয়ে যায়, কালো থাকে শুধু হাত-পা।

কিন্তু দাঁত পরীক্ষা করে আনন্দ দেখল জিনিস দুটোর বয়স দশ বছরের বেশি নয়। এদের শুধু লোম নয়, চোখ আর চামড়ার রঙও আলাদা। গরিলাদের চামড়া কালো হয়। চোখ হয় গাঢ় খয়েরি বা লাল। কিন্তু এদের চোখ হলদেটে ব্রাউন, চামড়া ফর্সা। এগুলো আকারেও পরিচিত গরিলাদের চেয়ে ছোট। পাহাড়ী পুরুষ গরিলারা ১৪৭ থেকে ২০৫ সেন্টিমিটার লম্বা হয়, অর্থাৎ গড়পরতায় ১৭৫ সেন্টিমিটার–পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। কিন্তু এ-দুটো মাত্র চার ফুট ছয় ইঞ্চি।

ওজনও কম, ২৫৫ আর ৩৪৭ পাউন্ড। আর বেশিরভাগ পাহাড়ী গরিলার ওজন ২৮০ থেকে ৪৫০ পাউন্ডের মধ্যে।

ছুরি দিয়ে চামড়া তুলে খুলিও পরীক্ষা করল আনন্দ। এমন কী মগজও বাদ দিল না।

দুপুরের দিকে উপসংহারে পৌঁছাল আনন্দ। এটা সম্ভবত সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির একটা প্রাণী। গরিলা যদি হয়ও, এর জাত অবশ্যই আলাদা।

সেদিন অভিযাত্রী দলের কেউই ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করতে পারছিল না। আনন্দকে রানা বলল, সে যেন গরিলাদের রেকর্ড করা ফোঁস-ফোঁস শব্দ ওয়াশিংটন বা নিউ ইয়র্কে পাঠিয়ে বিশ্লেষণ করিয়ে নেয়। উত্তরে আনন্দ বলল, তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ লাশ দুটো

পরীক্ষা করা। রানা তাকে বাধ্য করল না বা নিজেও কাজটায় হাত দিল না। সেজন্য দু'জনকেই পরে পস্তাতে হবে।

তারপর দূরে থেকে ভেসে আসা বুম বুম আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, শুনে মনে হলো কামান দাগা হচ্ছে। সিসিলিয়া আর ফুয়াদ এই বলে আশ্বস্ত করল–জেনারেল পাকুড় মোয়ানার সৈন্যরা কিগানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ফুয়াদ আরও বলল, যুদ্ধটা কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল দূরে কোথাও হচ্ছে, কাজেই তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কথাটা ধরল রানা। 'পঞ্চাশ মাইল দূরে? অত দূর থেকে কামান দাগার আওয়াজ তো এখানে পৌঁছাবে না।'

ফুয়াদ বলল, 'তা হলে হয়তো আরও কাছে চলে এসেছে যুদ্ধটা।'

এরপরই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ওরা।

রানা বলল, 'লেযার সিস্টেম খুবই কাজের, কিন্তু এমনভাবে বুলেট খরচ হয় যেন আগামীকাল বলে কিছু নেই। কাল রাতে আমাদের অর্ধেক অ্যামিউনিশন শেষ হয়ে গেছে।'

'সর্বনাশ! বলিস কী!' আঁতকে উঠল আনন্দ। 'এখন তা হলে কী হবে?'

'আমার ধারণা তোর কাছে এর উত্তর আছে,' বলল রানা। 'কারণ শরীর দুটো তুই পরীক্ষা করেছিস।'

আনন্দ জানাল, তার বিশ্বাস, এখানে ওরা একটা নতুন প্রজাতির প্রাইমেটের দেখা পেয়েছে। অ্যানাটমিক্যাল কী কী আবিষ্কার করেছে তার বর্ণনা দিল সে।

'বেশ, বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু আমি ওদের চেহারা নয়, আচরণ সম্পর্কে জানতে চাই। তুই নিজেই বলেছিস গরিলারা নিশাচর নয়, কিন্তু এগুলো নিশাচর। গরিলা সাধারণত লাজুক হয়, মানুষকে এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত। অথচ এগুলো ভয় কাকে বলে জানে না, কোন প্ররোচনা ছাড়াই মানুষের ওপর চড়াও হচ্ছে। কেন?'

আনন্দকে স্বীকার করতে হলো, সে জানে না। 'অ্যামিউনিশন-এর যে অবস্থা, সবচেয়ে আগে এটাই আমাদের জানতে হবে,' বলল রানা।

*

ওরা গবেষণা শুরু করল মন্দির থেকে, যেহেতু ওখানে বিরাট আকৃতির

ভীতিকর একটা গরিলার মূর্তি রয়েছে।

বিকেলে ঢুকল ওরা। একটু পরই মূর্তিটার পিছনে খোপ আকৃতির কয়েকটা ঘর দেখতে পেল। রানা বলল, একদল পুরোহিত গরিলাদের পুজো করবার নিয়ম বা রীতি চালু করে, এই ঘরগুলোয় তারাই থাকত।

ওরা সবাই আগ্রহ দেখাতে রানা কল্পনার সাহায্য নিয়ে একটা ব্যাখ্যাও দিল: 'জঙ্গলের গরিলারা জিঞ্জবাসীদের জন্যে বিপদ হয়ে দেখা দেয়। ওগুলোকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করার জন্যে লোকজন পুজো আর বলি দিতে শুরু করে।

'পুরোহিতরা ছিল আলাদা একটা শ্রেণী, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। এদিকে তাকাও, খোপগুলোয় ঢোকার মুখে–ছোট্ট একটা অন্য রকম ঘর। আমার ধারণা এই ঘরটায় একজন গার্ড থাকত, পুরোহিতের কাছ থেকে সাধারণ লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে। আসলে একটা বিশ্বাসের ওপর ভর করে সিস্টেমটা চালু হয়ে যায়...'

যুক্তিগুলো মানতে পারছে না আনন্দ। সিসিলিয়াও একমত হতে পারল না।

'এমনকী ধর্মও আসলে প্র্যাকটিক্যাল,' বলল আনন্দ। 'ধর্মের কাজ তোমাকে সুবিধে করে দেয়া।'

'মানুষ যাকে ভয় পায় তাকেই পুজো করে,' বলল রানা, 'এই আশায় যে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে।'

'কিন্তু গরিলাদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাববে তারা?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ। 'কী-ই বা তাদের করার ছিল?'

এই প্রশ্নের চমকপ্রদ জবাব একটু পরই পাওয়া গেল।

খোপগুলোকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। সামনে কয়েক প্রস্থ করিডর, প্রতিটি উন্নতমানের ব্যাস-রিলিফ সমৃদ্ধ। ইনফ্রারেড কমপিউটার সিস্টেমের সুবিধে থাকায় ছবিগুলো দেখতে পাওয়ার ব্যবস্থা করা গেল। দৃশ্যগুলো যত্ন আর সতর্কতার সঙ্গে সাজানো হয়েছে, ঠিক যেমনটা সাজানো থাকে একটা পিকচার টেক্সটবুকে।

প্রথম দৃশ্যে খাঁচায় ভরা একদল ধূসর গরিলাকে দেখা গেল। খাঁচাগুলোর কাছে হাতে ছড়ি নিয়ে কালো এক লোক দাঁড়িয়ে ।

দ্বিতীয় ছবিতেও একজন আফ্রিকানকে দেখা যাচ্ছে, গলায় রশি

বাঁধা দুটো গরিলাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তৃতীয় ছবিতে কালো এক লোক একদল গরিলাকে ট্রেনিং দিচ্ছে। উঠানে খাড়া করা একটা খুঁটির সঙ্গে ওগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে. প্রতিটি খুঁটির মাথায় একটা করে রিঙ।

সর্বশেষ দৃশ্যে একদল গরিলা খড়ের তৈরি এক সারি ডামিকে আক্রমণ করছে–ওগুলো ঝুলে আছে পাথরের তৈরি উঁচু একটা কাঠামো থেকে। এখন ওরা বুঝতে পারছে উঠান, জিমনেশিয়াম আর জেলখানায় যা পেয়েছে সেগুলোর আসলে কী অর্থ।

'হে ভগবান!' বলল আনন্দ। 'ওগুলোকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ট্রেনিং দেয়া হয়েছে–কেন? মাইন পাহারা দেয়ার জন্যে। বুদ্ধিমান একদল জন্তু, নিষ্ঠুর আর দুর্নীতিমুক্ত। চিন্তা করে দেখো, আইডিয়াটা কিন্তু সত্যি মন্দ নয়।'

নিজের চারদিকে আরও একবার চোখ বুলাল রানা। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল, জায়গাটা আসলে মন্দির নয়, স্কুল।

হঠাৎ একটা বিপরীত চিন্তা খেলল ওর মাথায়ঃ ছবিগুলো কয়েকশো বছরের পুরানো, ট্রেইনাররা সেই কবে মরে গেছে। তারপরও গরিলারা এলাকায় রয়ে গেছে। 'এখন ওদেরকে কে ট্রেনিং দেয়?'

'ওরা নিজেরা,' বলল আনন্দ। 'নিজেরাই নিজেদেরকে ট্রেনিং দেয়।'

'তা কি সম্ভব?'

'খুবই সম্ভব। চোখে পড়বার মত শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রাইমেটদের মধ্যে লক্ষ করা গেছে।'

'কিন্তু শৈলী তা হলে বলছে কেন ওগুলো গরিলা নয়?'

'নয় বলেই বলছে,' জবাব দিল আনন্দ। 'এই জীব বা জিনিসগুলো গরিলাদের মত দেখতেও নয়, গরিলাদের মত আচরণও করছে না।' সে সংশয় প্রকাশ করল, এই নতুন প্রজাতির জীবগুলো শুধু ট্রেনিং পায়নি, ওগুলো হয়তো শিম্পাঞ্জি, কিংবা এমনকী মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্তানও জন্মদান করেছে।

সিসিলিয়া আর ফুয়াদ ভাবল আনন্দ ঠাট্টা করছে।

তবে রানা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিল। সাধারণ জ্ঞানের প্রতি

ঝোঁক থাকায় ওর জানা আছে ১৯৬০ সালে প্রথমবার ব্লাড প্রোটিন স্টাডি থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষ এইপ্-এর নিকটতম জ্ঞাতি।

বায়োকেমিক্যালি, মানুষের সবচেয়ে কাছের আত্মীয় শিম্পাঞ্জি, গরিলার চেয়ে অনেক বেশি কাছের। ১৯৬৪ সালে শিম্পাঞ্জির কিডনি সাফল্যের সঙ্গে মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়।

তবে ১৯৭৫-এর আগে পুরোপুরি জানা যায়নি মিল আসলে ঠিক কতটুকু। তখনই প্রথম বায়োকেমিস্টরা মানুষ আর শিম্পাঞ্জির DNA তুলনা করলেন। আবিষ্কার হলো যে DNA STRAND-এর হিসাবে মানুষের চেয়ে শিম্পাঞ্জির পার্থক্য মাত্র এক পার্সেন্ট। তবে প্রায় কেউই একটা সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহ দেখায়নি যে আধুনিক হাইব্রিডাইজেশান টেকনিক আর এমব্রিয়োনিক ইমপ্ল্যান্টেশন-এর সাহায্যে এইপ্-এইপ্ ক্রস নিশ্চিতভাবে সম্ভব, আর ম্যান-এইপ্ ক্রসও অসম্ভব নয়।

'আমাদেরকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে,' বলল আনন্দ। 'হিউম্যান আইকিউ টেস্টে শৈলী পেয়েছে বিরানব্বুই। সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল দিক থেকে মানুষের মতই বুদ্ধিমান ও–কোন কোন দিক থেকে বরং বেশি। আমরা যেভাবে ওকে চালাই, ও আমাদেরকে অন্তত সেই একই নৈপুণ্যের সঙ্গে চালায়।

'এই ধূসর গরিলাদেরও একই মানের ইন্টেলিজেন্স রয়েছে, তবে তাদেরকে যে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে সেটা ডোবারম্যান পিনশার-এর সমমানের–পশুকে পাহারা দাও, জীব-জন্তুকে আক্রমণ করো, হিংস্র হও, চালাকি শেখো।

'তবে কুকুরের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে, দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে ওস্তাদ। হামলাও ওরা চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না আমাদের সব ক'টাকে মেরে সাফ করতে পারে। এর আগেও তাই করেছে, নতুন কেউ এলেই স্রেফ মেরে ফেলেছে।'

সন্ধ্যার দিকে কথাটা আবার মনে করিয়ে দিল রানা। এবার আনন্দ কোন অজুহাত না দেখিয়ে ডক্টর মেরিনার সঙ্গে যোগাযোগ করে গরিলাদের রেকর্ড করা ফোঁস-ফোঁস আওয়াজের টেপ নিউ ইয়র্কে

পাঠিয়ে দিল।

রাতে সিসিলিয়ার ওয়াশিংটন অফিস থেকে দুটো তথ্য পাওয়া গেল। ওখানকার তথ্যভাণ্ডারের সাহায্য নিয়ে একটা কমপিউটার সিমিউলেশন তৈরি করল রানা, তাতে জানা গেল খুব বেশি হলে তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যে হীরের খনি খুঁজে পাবে ওরা।

তারমানে জিঞ্জ-এ আরও পাঁচদিন থাকবার প্রস্তুতি নিতে হবে ওদেরকে। খাবারদাবার নিয়ে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা অ্যামিউনিশন নিয়ে।

রানা সিদ্ধান্ত নিল টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করবে।

ওরা আগেই ধারণা করেছিল জিনিসদের দ্বিতীয় হামলাটা প্রথমটার মত হবে না। হলোও না; সন্ধ্যার একটু পর রাত গাঢ় হতেই শুরু করল তারা। ২৩ জুন রাতের যুদ্ধে ঘন ঘন ক্যানিস্টার-এর বিস্ফোরণ আর গ্যাসের হিসহিস শব্দই শুধু শোনা গেল। এই রণকৌশলে কাজ হলো, চোখের জল ফেলতে ফেলতে পালিয়ে বাঁচল ধূসর গরিলারা। রাতে তারা আর ফিরে এল না।

রানা খুশি। জানাল, ওদের কাছে যে পরিমাণ টিয়ার গ্যাস আছে তা দিয়ে অন্তত এক হপ্তা জিনিসদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে।

আপাতত ওদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলেই মনে হলো।

সতেরো

ভোর হওয়ার খানিক আগে পোর্টার বাউরি আর কায়ানা-র লাশ পেল ওরা। বোঝা গেল সন্ধ্যা রাতের হামলাটা ছিল আসলে ডাইভারশান; একটা জিনিসকে কমপাউন্ডে ঢুকবার সুযোগ করে দেওয়া হয়। পোর্টারদের খুন করে দ্রুত ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সে।

আতঙ্কিত হওয়ার আরও বড় কারণ, কোন সূত্র পাওয়া গেল না কীভাবে ইলেকট্রিফাইড ফেন্সের ভিতর দিয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেল জিনিসটা।

সার্চ পার্টি বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বেড়ার নীচের দিকে একটা অংশ ছেঁড়া অবস্থায় পেল। কাছাকাছি একটা লম্বা লাঠি পড়ে রয়েছে।

জিনিসরা ওই লাঠির সাহায্যে বেড়ার নীচের দিকটাকে মাটি থেকে উপরে তুলে ফেলে, ফলে তাদের একজন বেড়ার সংস্পর্শে না এসেই ক্রল করে কমপাউন্ডে ঢুকতে পারে–কাজ সেরে বেরিয়েও গেছে একইভাবে। শুধু তাই নয়, বেরিয়ে যাওয়ার পর বেড়ার ছেঁড়া অংশটুকু যতটুকু সম্ভব ঠিকঠাক করে রেখে গেছে।

শৈলী জানে জিনিসরা কোথায় বাস করে। প্রস্তাবটা দিতেই ওখানে ওদেরকে নিয়ে যেতে রাজি হলো ও।

সেদিন সকাল দশটার দিকে রওনা হলো ওরা। শহরের উত্তরে, পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উঠতে হচ্ছে। চারদিকে কড়া নজর রেখে এগোচ্ছে ওরা, সঙ্গে মেশিনগান নিয়ে বেরিয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গরিলাদের চিহ্নগুলো দেখতে পাওয়া গেল–প্রচুর বিষ্ঠা, মাটি আর গাছে বানানো বাসা। একটা জিনিস দেখে প্রায় ঘাবড়ে গেল রানা: কোন কোন গাছে বিশ থেকে ত্রিশটা বাসা। হিসাব পাওয়া মুশকিল…এদিকে আসলে কত গরিলা বাস করে।

পনেরো মিনিট পর দশটা জিনিস, অর্থাৎ ধূসর গরিলার একটা গ্রুপকে দেখতে পেল ওরা, রসালো শিকড় আর লতা চিবাচ্ছে। চারটে পুরুষ, তিনটে তরুণী, একটা কিশোর, দুটো চঞ্চল শিশু।

বড়রা অলস ভঙ্গিতে রোদ পোহাচ্ছে, ইচ্ছে হলে খাচ্ছে না হলে না-ই। একটু দূরে আরও একটা দলকে দেখা গেল, মাটিতে পিঠ দিয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। কোথাও কোন রকম প্রহরার ব্যবস্থা চোখে পড়ল না।

হাত নেড়ে একটা সংকেত দিল রানা; সঙ্গে সঙ্গে সব ক'টা মেশিনগানের সেফটি অফ হয়ে গেল। প্রথম গ্রুপটাকে লক্ষ্য করে গুলি

করবার নির্দেশ দিতে যাচ্ছে ও, এই সময় ওর ট্রাউজারের পায়া ধরে টান দিল শৈলী।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল রানা। আক্ষরিক অর্থেই ওর পিলে চমকে উঠল। ঢালের আরেকটু উপরে তৃতীয় গ্রুপটাকে দেখতে পেল ও, সব মিলিয়ে দশ-বারোটা হবে। তারপর আরেকটা গ্রুপ। ঢালের যত উপরে উঠছে চোখ, ততই দেখা যাচ্ছে ওগুলোকে। গোটা পাহাড়ী ঢালেই রয়েছে ওগুলো। গুণতে শুরু করল রানা। দুশো পর্যন্ত গুণল। তবে তিনশো তো হবেই।

আবার সংকেত দিল রানা। ট্রেইল ধরে পিছু হটতে শুরু করল সঙ্গীরা। ধীরে ধীরে, সাবধানে, ক্যাম্পে ফিরে এল সবাই।

ক্যাম্পে বাউরি আর কারানার জন্য কবর খুঁড়ছে পোর্টাররা।

কী কী বিকল্প আছে আলোচনা করতে বসল ওরা, মাটি খোঁড়ার আওয়াজ ওদেরকে নিজেদের ব্যর্থতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

আনন্দকে রানা বলল, 'দিনের বেলা কিন্তু ওগুলোকে হিংস্র বলে মনে হলো না।'

'সেটাই তো ভাবছি। খুবই আশ্চর্যজনক। সাধারণ গরিলাদের চেয়েও শান্ত মনে হলো। পুরুষরা বোধহয় বেশিরভাগই ঘুমাচ্ছিল।'

'ঢালে পুরুষের সংখ্যা কত হবে, আন্দাজ করতে পারিস?' জিজ্ঞেস করল রানা। ওরা এরইমধ্যে ধরে নিয়েছে হামলায় শুধু পুরুষগুলো অংশ নিয়েছিল।

আনন্দ জবাব দিল, 'বেশিরভাগ স্টাডিতে দেখা গেছে, গরিলাদের গ্রুপে পুরুষের উপস্থিতি শতকরা পনেরো ভাগ। গ্রুপের আকার নির্ধারণেও গবেষকরা সাধারণত ভুল করেন। দূর থেকে যতগুলো দেখা যায়, দলে তার চেয়ে বেশি থাকে ওরা।'

ঢালে ওরা কমবেশি তিনশোর মত গরিলা গুণেছে। এখন তা হলে চারশো ধরতে হয়। শতকরা পনেরোজন পুরুষ হলে কমপক্ষে ষাটজন আক্রমণ করবে ওদেরকে। ওদের দশজনকে।

ফুয়াদ মন্তব্য করল, 'এটা অসম যুদ্ধ।'

শৈলী একটা সমাধান দিল: 'চলো ফিরে যাই।'

অনুবাদটা শুনে রেগে গেল সিসিলিয়া। 'ফিরে যাওয়ার তো প্রশ্নই

ওঠে না। এখনও ডায়মন্ড পাইনি আমরা।'

'এখনই ফেরো,' আবার সংকেত দিল শৈলী।

সবাই ওরা রানার দিকে তাকাল। এক মুহূর্ত পর মুখ খুলল রানা। 'সবার মত আমিও জায়গামত পৌঁছে খালি হাতে ফিরে যেতে চাই না। তবে কী কাজে লাগবে হীরে, আমরা যদি বেঁচে না থাকি? এর কোন বিকল্প নেই, যদি সম্ভব হয় ফিরে যাব আমরা।'

'তারমানে তুমি, মাসুদ রানা, একদল বন্যপ্রাণীর কাছে হার মানছ?' রাগে নয়, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সিসিলিয়া।

'ওদেরকে আমি বন্যপ্রাণী হিসেবে দেখছি না, সিসিলিয়া,' বলল রানা। 'দেখছি একটা শক্তি হিসেবে। এখানে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ওরা।'

আনন্দ কী যেন বলবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। রানা থামতেই সে কোমরে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, 'তুই বললি, যদি সম্ভব হয় ফিরে যাব। যদি সম্ভব হয় মানে?'

'আমি বলতে চেয়েছি, ওরা আমাদেরকে ফিরতে না-ও দিতে চাইতে পারে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

রানার নির্দেশে নামমাত্র খাবার আর অ্যামিউনিশন নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। বাকি সব কিছু ফেলে যাওয়া হচ্ছে–তাঁবু, পেরিমিটার ডিফেন্স, কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি।

ফিরবার পথে সবার সামনে থাকছে রানা।

ক্যাম্পে ওরা অসহায় হয়ে পড়েছিল–শত্রু গরিলাদের দৃষ্টিতে, ডালে বসা অসহায় পাখির মত সহজ শিকার।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের লম্বা লাইনটার দিকে একবার তাকাল রানা। ক্যাম্পের বাইরে, এখানেও, সম্পূর্ণ অরক্ষিত ওরা। সবাই সতর্ক, হাতের অস্ত্র রেডি, তারপরও কখন কী ঘটে যায় কিছুই বলা যায় না।

খেয়াল করল, ঝোপ-ঝাড় দু'দিক থেকে সরে আসায় চলবার পথ ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। শহরে ঢুকবার সময় এই পথটা এত সরু ছিল কি না মনে করতে পারল না ও। ধূসর গরিলারা হয়তো ওদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে আছে, অথচ কিছুই ওরা টের পাচ্ছে

না।

হাঁটবার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। এই সরু পথটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিছনে ফেলতে হবে।

রানা ভাবছে, মুকেনকোর পুব ঢালে পৌঁছাতে পারলে বিপদটা সম্ভবত এড়ানো সম্ভব। ধূসর গরিলারা শহরটার কাছাকাছি বসবাস করে, পিছু নিয়ে অত দূরে যাবে বলে মনে হয় না। এক কী দু'ঘণ্টা হাঁটলেই বিপদ কেটে যাবে ওদের।

হাতঘড়ি দেখল রানা। ওরা ক্যাম্প ছেড়েছে মাত্র দশ মিনিট হলো।

হঠাৎ ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলবার আওয়াজ। ওর সামনের ঝোপ নড়ছে। এমনভাবে কাত হচ্ছে, যেন জোরাল বাতাস লাগছে গায়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে চারদিকে কোথাও এতটুকু বাতাস বইছে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলবার শব্দ ক্রমশ আরও জোরাল হচ্ছে।

দলটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাশেই একটা নালার কিনারা। নালার তলাটা ঢালু, দু'পাশে জঙ্গলের পাঁচিলও তাই। অ্যামবুশের জন্য একটা আদর্শ জায়গা এটা।

পিছনের লাইন থেকে সেফটি ক্লিক করবার আওয়াজ পেল রানা। ফুয়াদ ওর পাশে চলে এল। 'সার, কী করব আমরা?'

এখনও সামনের ঝোপগুলোর নড়াচড়া দেখছে রানা, ফোঁস ফোঁস আওয়াজও শুনছে। কাছাকাছি জঙ্গলে কটা ধূসর গরিলা লুকিয়ে আছে আন্দাজ করবার চেষ্টা করছে ও। বিশটা? ত্রিশটা?

নালার উপর দিকে, একটা পথ দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে। সেদিকে একটা হাত তুলল ফুয়াদ। 'আমরা কি, সার, ওদিকে যাব?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'না, ওদিকে নয়।'

'তা হলে কোন দিকে, সার?' চোখ-মুখ আর কণ্ঠস্বর থেকে ব্যাকুলতা চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো ফুয়াদ।

'পিছন দিকে,' বলল রানা। 'আমরা পিছন দিকে যাব।'

ওরা নালার দিকে পিছন ফিরতে আওয়াজটা অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে

গেল, থেমে গেল ঝোপ-ঝাড়ের নড়াচড়াও। শেষ একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, দেখল জঙ্গলের ভিতর সাধারণ একটা প্যাসেজের মতই লাগছে নালাটাকে, আশপাশে কোন রকম বিপদ বা হুমকির চিহ্নমাত্র নেই। তবে মনে মনে চরম সত্যটা জানে ও। ওরা ফিরে যেতে পারবে না।

দু'ঘণ্টা পর, ক্যাম্পের মাঝখানে, বিদ্যুৎচমকের মত রানার মাথায় আইডিয়াটা ঢুকল।

তাঁবু থেকে বেরিয়েছে ও, দেখল ইঙ্গিতে কয়কয়কে কী যেন বলছে শৈলী। শৈলীর বেশ কিছু সংকেত শিখে নিয়েছে ও, বুঝতে পারল কী বলছে। পানি খেতে চাইছে শৈলী।

কিন্তু কয়কয় তো ওর ইঙ্গিত-ইশারার অর্থ করতে পারে না, ফলে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে সে। হঠাৎ রানা উপলব্ধি করল, ভাষার দক্ষতা নিঃসন্দেহে ধূসর গরিলাদের বিরাট একটা শক্তি, তেমনি এটা তাদের খুব বড় একটা দুর্বলতাও বটে।

সবাইকে ডেকে একটা ধূসর গরিলা ধরবার প্রস্তাব দিল রানা। ধরে ওদের ভাষাটা শিখতে হবে। তারপর সেই ভাষার সাহায্যে বাকি গরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

আনন্দর কাছ থেকেই প্রতিবাদ আশা করছিল রানা, কিন্তু দেখা গেল সে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে জানাল, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একটা নতুন এইপ্-এর ভাষা শিখতে কয়েক মাস সময় লাগে, তবে এখানকার পরিস্থিতিতে চেষ্টা করলে কয়েক ঘণ্টার বেশি লাগবে না তার।

ধূসর গরিলাদের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের রেকর্ড করা টেপ আগেই নিউ ইয়র্কে, ডক্টর মেরিনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে; তাঁর শুধু দরকার আরও কিছু ইনপুট। তাঁকে অবশ্য এ-খবরটাও জানাতে হবে যে ধূসর গরিলারা শুধু মুখের বাতাসকেই ভাষা হিসাবে ব্যবহার করে না, সাইন ল্যাঙগুইজকেও ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কাজে লাগায়—শেষটা অবশ্য আনন্দর ধারণা মাত্র।

ঠিক হলো, কঙ্গো থেকে ওরা যদি নিউ ইয়র্কের সঙ্গে

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে, তা হলে বন্দি গরিলার কাছ থেকে সংগ্রহ করা ভিডিও ডাটা সরাসরি ডক্টর মেরিনার এপিই প্রোগ্রামে ঢুকিয়ে দিতে পারবে।

এপিই–অ্যানিমেল প্যাটার্ন এক্সপ্লানেশন হলো–ডক্টর মেরিনার তৈরি একটা কমপিউটার প্রোগ্রামের নাম। এই প্রোগ্রামের সাহায্যে শৈলী ছাড়াও অন্যান্য প্রাইমেটদের সাইন ল্যাঙগুইজ নিয়ে গবেষণা করা হয়। এপিই প্রোগ্রামে দুর্বোধ্য কোড ভাঙবার ব্যবস্থা আছে, কাজেই আশা করা যায় ফোঁস-ফোঁস আওয়াজের একটা ব্যাখ্যা অন্তত পাওয়া যাবে।

রানা আর সিসিলিয়ার ধারণা, এতে কাজ হবে; ধূসর গরিলাদের আওয়াজ অনুবাদ করা সম্ভব। ফুয়াদ ওদের সঙ্গে একমত হতে পারল না।

'একটা গরিলা ধরা কি এতই সহজ?' আনন্দকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ধরবে রানা, কাজেই সহজ কি কঠিন সেটা ও বুঝবে। আমার কাজ সেটাকে কথা বলানো।'

'আপনার উদ্দেশ্যটা কী?' জিজ্ঞেস করল ফুয়াদ। 'ইন্টারোগেটের নামে প্রাণীটিকে টরচার করবেন?'

'আমরা তাকে স্রেফ উত্তেজিত করব,' জবাব দিল আনন্দ। 'সে যাতে নিজের ভাষায় প্রচুর কথা বলে। প্রয়োজন হলে শালীকে দু'একটা খোঁচাও মারা হবে বৈকি।'

ওদিকে গরিলা ধরবার আয়োজন শুরু করে দিয়েছে রানা। মাটিতে কিছু উপকরণ সাজাচ্ছে–একটা কলা, এক বাটি পানি, একটুকরো ক্যান্ডি, একটা লাঠি, রসালো কিছু শিকড়, একজোড়া পাথুরে দাঁড়।

'শালীকে?' জিজ্ঞেস করল ফুয়াদ।

'অবশ্যই।' বর্শা আকৃতির সিরিঞ্জে থোরালিন ভরছে আনন্দ। 'আমরা একটা মাদী জিনিস ধরব।'

শুধু একটা মাদী ধূসর গরিলা চায় ওরা। সঙ্গে বাচ্চা থাকা চলবে না। বাচ্চা থাকলে নানা রকম ঝামেলা হবে।

কোমর সমান ঝোপ-ঝাড় ঠেলে একটা তীক্ষ্ণ রিজ-এর কিনারায় পৌঁছাল রানা, নীচে তাকিয়ে নয়টা গরিলার একটা গ্রুপ দেখতে পেল। পরিণত বয়স্ক দুটো পুরুষ আর পাঁচটা নারী, দুটো কিশোর।

বিশ ফুট নীচে জঙ্গলের ভিতর এটা-সেটা চিবাচ্ছে ওগুলো। আড়াল থেকে অনেকক্ষণ ধরে নজর রেখে নিশ্চিত হলো রানা, পাঁচটা মেয়েই ভাষার ব্যবহার জানে, ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর ওদের কোন শিশুও লুকিয়ে নেই। এরপর সুযোগের অপেক্ষায় থাকা।

সময় বয়ে চলেছে। গরিলারা অলস ভঙ্গিতে ফার্নগুলোর ভিতর এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়িয়ে নরম কুঁড়ি বা লতা চিবাচ্ছে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর একটা মেয়ে ঢাল বেয়ে খানিকটা উঠল, ওরা যেখানটায় আড়াল নিয়ে বসে আছে। নিজের গ্রুপ থেকে দশ গজ দূরে এসে থামল ওটা।

দু'হাতে ধরা পিস্তলটা তুলল রানা, সাইটে চোখ রেখে লক্ষ্যস্থির করল। ট্রিগারটায় চাপ দিল ধীরে ধীরে। আগে টের পায়নি, একটা আলগা পাথরে বসে আছে ও। পিস্তল ঝাঁকি খেতে পাথরটা নড়ে উঠল, তারপর ওকে নিয়েই পিছলাতে শুরু করল। এরকম আরও কিছু আলগা পাথর সহ ঢাল বেয়ে নেমে এল রানা, সরাসরি জিনিসগুলোর মাঝখানে।

অকস্মাৎ বেকায়দামত পড়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে রানা, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। পঁচিশ ফুট উপর থেকে ওর বুক উঁচু-নিচু হতে দেখল ওরা, একটা হাত দু'একবার মৃদু ঝাঁকি খেল।

আনন্দর হাত থেকে ছোঁ দিয়ে মেশিনগানটা নিয়ে সেফটি ক্যাচ অফ করল সিসিলিয়া। লক্ষ্যস্থির করছে, হাত তুলে তাকে বাধা দিল ফুয়াদ।

চিৎ হয়ে পড়ে থাকা রানাকে দেখে ফুয়াদের ধারণা হয়েছে, ওর আঘাত গুরুতর নয়, দু'এক মিনিটের মধ্যে জ্ঞান ফিরে পাবে ও। তার ভয় জিনিসগুলো এখন কী করবে।

ধূসর গরিলারা রানাকে পড়তে দেখেছে। ওর দিকে এগিয়ে আসছে তারা। আট কি ন'টা জানোয়ার ওকে ঘিরে ফেলল। সব ক'টার

চেহারা থমথম করছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলছে সশব্দে।

'ফোঁস। ফোঁ-ও-ওঁ-স। ফোঁস।'

'ফোঁস-ফোঁস-ফোঁস।'

'ফোঁস-ফোঁস ফোঁস-ফোঁস।'

'হুস-হু-উস। হুস-হুস।'

এবার ফুয়াদও তার মেশিনগানের সেফটি ক্যাচ অফ করল।

গুঙিয়ে উঠল রানা, হাত দিল মাথায়, তারপর চোখ মেলল। চারপাশে গরিলা দেখে মৃদু ঝাঁকি খেল শরীরটা। তারপর আর নড়তে পারল না।

তিনটে গরিলা ওর খুব কাছাকাছি বসেছে। এক চুল না নড়ে পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করছে রানা। এক মিনিট কাটল। গরিলারা শব্দ করছে, নিজেদের মধ্যে সংকেতও বিনিময় করছে, কিন্তু আরও কাছে আসছে না।

ধীরে ধীরে একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে সামান্য একটু উঁচু হলো রানা।

হঠাৎ দ্রুত হলো সংকেত বিনিময়, তবে আচরণে কোন রকম হুমকি নেই।

উপরে, রিজের কিনারায়, আনন্দর আস্তিন ধরে টান দিল শৈলী।

কিন্তু টানটা আনন্দ অনুভবই করল না। সে প্রায় সম্মোহিতের মত নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিসিলিয়ার দিকে।

ফুয়াদ নিষেধ করায় মেশিনগান নামিয়ে নিয়েছিল সিসিলিয়া। এখন আবার সেটা তুলে লক্ষ্যস্থির করছে সে।

আনন্দর কাছ থেকে সাড়া বা সাহায্য না পেয়ে বিকল্প পথটাই বেছে নিল শৈলী। একটু এগিয়ে এসে সিসিলিয়ার ফর্সা পায়ে কামড় বসিয়ে দিল।

ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল সিসিলিয়া, তবে সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে চেপে ধরল নিজের মুখ। অপ্রত্যাশিত আওয়াজ শুনে নীচের গরিলারা খেপে উঠতে পারে।

নীচের জমিনে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে এখনও শুয়ে রয়েছে রানা।

জিনিসগুলো খুব কাছে, ইচ্ছে করলে ছুঁতে পারবে ও। মিষ্টি, বাসী একটা গন্ধ পাচ্ছে। শৈলীর গা থেকেও এরকম গন্ধ বেরোয়।

ধূসর গরিলাগুলো কিছুটা বিমূঢ়, কিছুটা বিরক্ত। পুরুষগুলো গলা থেকে বিচিত্র সব আওয়াজ বের করছে। তারপর ছন্দময় উচ্চারণ শুরু হলোঃ হো-হো-হো।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, দাঁড়াবে। যেভাবেই হোক, দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে; ও সরে গেলে ওকে ওরা হুমকি বলে গণ্য করবে না।

কিন্তু নড়াচড়া শুরু করতেই পুরুষগুলো আরও জোরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শুরু করল। একটা পুরুষ কাঁকড়ার মত আড়াআড়ি ভঙ্গিতে সরে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে; চ্যাপ্টা তালু দিয়ে মাটিতে চাপড় মারছে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার শুয়ে পড়ল রানা। জিনিসগুলোর পেশীতে ঢিল পড়ল।

প্রয়োজন হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে শুয়ে থাকতে হবে, ভাবল রানা। যতক্ষণ না আগ্রহ হারিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে যায় ওগুলো।

সময় বয়ে চলেছে। স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ফেলছে রানা। জিনিস-গুলো বিরতিহীন সংকেত বিনিময় করে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা চলছে—ওকে নিয়ে কী করা হবে।

তারপর অন্য একটা পুরুষ আবার কাঁকড়ার মত আড়াআড়িভাবে নড়াচড়া শুরু করল, হাত দিয়ে মাটিতে চাপড় মারছে। রানা এক চুল নড়ছে না, এমনকী চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলছে না।

বইয়ে তো পড়েছেই, আনন্দর মুখেও শুনেছে আক্রমণের আগে কীসের পর কী হয়; সেগুলোই কল্পনা করছে রানা: ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে, আড়াআড়ি নড়ে, মাটি চাপড়ায়, ঘাস ছেঁড়ে, বুক চাপড়ায়।

তারপর সরাসরি হামলা।

পুরুষ জিনিসটা টেনে ঘাস ছিঁড়তে শুরু করল। রানা অনুভব করল ওর হার্ট অসম্ভব লাফাচ্ছে। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে শরীরটাকে খাড়া করল ওটা, চ্যাপ্টা তালু দিয়ে চাপড় মারল নিজের বুকে। ফাঁপা শব্দ উঠল।

রানা ভাবছে উপরে ওরা কী করছে কে জানে। পরমুহূর্তে পাথর

ধসের শব্দ শুনতে পেল। মুখ তুলল ও। এক রাশ আলগা পাথরের সঙ্গে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে শৈলী। কয়েকটা শিকড় আর ফার্ন ধরে মাঝে মধ্যে নিজের পতন মুহূর্তের জন্য ঠেকাচ্ছে ও। অরপর সরাসরি রানার পায়ের কাছে এসে থামল।

আঠারো

চমকে উঠল ধূসর-গরিলারা। পুরুষটা বুক চাপড়ানো বন্ধ করল। ধীরে ধীরে নিচু হলো, চোখে আগুন নিয়ে শৈলীকে দেখছে।

শৈলী ঘোঁঘোঁৎ করল।

ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে রানার দিকে এগোল পুরুষটা, তবে শৈলীর উপর থেকে ভুলেও চোখ সরাচ্ছে না। শৈলী তার দিকে নির্ভয়ে তাকিয়ে আছে।

এটা পরিষ্কার কর্তৃত্ব ফলাবার প্রতিযোগিতা। পুরুষটা একটু একটু করে কাছে চলে আসছে, নির্দ্বিধায়।

অকস্মাৎ একটা ডাক ছাড়ল শৈলী। বিস্ময়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল রানা। উপরে, রিজের কিনারায়, আনন্দও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। শৈলীকে এর আগে মাত্র এক কি দু'বার এভাবে হুংকার ছাড়তে শুনেছে সে, তাও প্রচণ্ড রাগের মাথায়।

রানার বিস্ময় আরও বেশি। ওর জানামতে মেয়ে গরিলাদের গর্জন করাটা বিরল ঘটনা। এটা অন্যান্য গরিলারাও নিশ্চয় জানে। বোধহয় সেজন্যই ঘাবড়ে গেছে জিনিসগুলো।

শৈলীর সামনের বাহু শক্ত হয়ে উঠছে, পিঠ আড়ষ্ট, মুখের পেশী টান টান। ওর চোখে আক্রমণাত্মক দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, তাকিয়ে আছে পুরুষটার দিকে। তারপর সবার পিলে চমকে দিয়ে আরও একটা

হুংকার ছাড়ল।

স্থির হলো পুরুষটা. মাথাটা কাত করল এক দিকে। ভাবটা যেন, বিষয়টা চিন্তা করে দেখছে। অবশেষে পিছু হটল সে, বাকি গরিলাদের কাছে ফিরে গেল; ওগুলো রানার মাথার দিকে অর্ধবৃত্তাকারে বসে আছে।

শৈলী যেন ওগুলোকে দেখিয়ে রানার পায়ে একটা হাত রাখল, মালিকানা প্রমাণের ভঙ্গিতে। একটা কিশোর, চার কি পাঁচ বছর বয়স হবে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ছুটে এল হঠাৎ। তার গালে কষে একটা চড় মারল শৈলী, কুঁই-কুঁই করে উঠে পালিয়ে গেল সে।

বাকি জিনিসদের দিকে অপলক চোখে তাকাল শৈলী। তারপর সংকেত দিল: 'যাও যাও। শৈলীকে ছেড়ে চলে যাও। যাও যাও।'

জিনিসগুলো কোন সাড়া দিল না।

'মাসুদ রানা ভাল। আমার বন্ধু। ভাল একজন মানুষ।' সংকেত দিলেও, শৈলী যেন বুঝতে পারছে জিনিসগুলো এ-সব সংকেতের অর্থ করতে পারছে না। কারণ, এরপরই আশ্চর্য একটা কাণ্ড করল ও: দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, ঠিক যেভাবে ধূসর গরিলারা ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে।

জিনিসগুলো চমকে উঠল। পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করছে।

কিন্তু শৈলী যদি ওদের ভাষা বলেও থাকে, তাতে কোন লাভ হলো না। যেখানে ছিল সেখানেই বসে থাকল ওগুলো। আরও কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল শৈলী, কিন্তু ওগুলোর মধ্যে কোন আগ্রহ দেখা গেল না। এক সময় আর কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না। ওর দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকল তারা।

শৈলী ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না।

এবার রানার মাথার কাছে সরে এল ও। আদর করছে ওকে—হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কপালে আর মাথায়।

ওর এই কাণ্ড দেখে নিজেদের মধ্যে দ্রুত সংকেত বিনিময় করল জিনিসগুলো। তারপর সেই পুরুষটা একই ছন্দে হো-হো-হো করতে লাগল।

এটা দেখে রানার দিকে ফিরল শৈলী: 'শৈলী জড়িয়ে ধরবে

রানাকে।'

শৈলী বারবার একই সংকেত দিচ্ছে। রানা বিমূঢ় এবং বিব্রত। শৈলী কী বলতে চাইছে জানে না ও।

এই সময় রিজের মাথার দিক থেকে নুড়ি পাথর গড়াবার শব্দ ভেসে এল। মুখ তুলল রানা। ঢাল বেয়ে কয়েক ফুট নেমে এসেছে আনন্দ। তবে এখনও যতটা পারা যায় আড়ালেই থাকবার চেষ্টা করছে সে। রানার সঙ্গে আরও লোকজন আছে জানলে গরিলাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

আনন্দ অনুকরণ করে দেখাচ্ছে পরস্পরকে মানুষ কীভাবে আলিঙ্গন করে। যোগসূত্রটা কোথায় বুঝতে পেরে বিস্মিত হলো রানা, কারণ আনন্দর মুখে শুনেছে-শৈলী কখনোই আনন্দকে জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছে প্রকাশ করে না-ও সাধারণত চায় আনন্দ ওকে আলিঙ্গন করুক এবং আদর করুক।

উঠে বসল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিজের বুকে টেনে নিল শৈলী, ওর মুখ আর মাথা নিজের লোমে চেপে ধরল। প্রায় একই সময়ে পুরুষটার গলা থেকে আওয়াজ বেরুনো বন্ধ হয়ে গেল। ধূসর গরিলারা পিছু হটতে শুরু করেছে, ভাবটা যেন কোথাও একটা ভুল করে ফেলেছে তারা।

সেই মুহূর্তে রানা উপলব্ধি করল: শৈলী ওকে আপন সন্তান হিসাবে দেখাচ্ছে ওদের।

ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল ধূসর গরিলারা কঠিন আলিঙ্গন থেকে রানাকে মুক্তি দিল শৈলী। ওর চোখে চোখ রেখে সংকেত দিল: 'বোকা জিনিস।'

অর্থটা বুঝতে না পারলেও কৃতজ্ঞচিত্তে রানা বলল, 'ধন্যবাদ, শৈলী।' তারপর ওকে একটা চুমো খেল।

'রানা, আদর করো শৈলীকে। শৈলী ভাল গরিলা।'

ঢাল বেয়ে হুড়মুড় করে নেমে এসে আনন্দ বলল, 'ওরে ভাগ্যবান গর্দভ, আদর কর্ ওকে!'

গরিলা বন্দি করবার প্ল্যান বাতিল করে দিয়ে দুপুর দুটোর দিকে

ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা।

ক্যাম্পে ফিরেই কমপিউটার নিয়ে বসল সিসিলিয়া, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রথমে ওয়াশিংটন, তারপর নিউ ইয়র্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে। প্রায় ত্রিশ মিনিট ব্যর্থ চেষ্টার পর বলল, 'গরিলা পেলেও কোন লাভ হত না, কারণ স্যাটেলাইট লিঙ্ক পাচ্ছি না।'

ভুরু কোঁচকাল ফুয়াদ। 'আবার ইলেকট্রনিক জ্যামিং? এবার কারা দায়ী?'

'ইলেকট্রনিক জ্যামিং নয়,' বলল সিসিলিয়া। 'তারচেয়েও খারাপ।' স্যাটেলাইট লিঙ্ক না পাওয়ায় ইকুইপমেন্টগুলো প্রথমে চেক করে দেখেছে সে। কোথাও কোন ত্রুটি পায়নি। তারপর মনে পড়েছে তার: 'আজ জুন মাসের ২৪ তারিখ। প্রথম কঙ্গো ফিল্ড পার্টির সঙ্গে কমিউনিকেশন সংকট দেখা দিয়েছিল মে মাসের ২৮ তারিখে। সাতাশ দিন আগে।'

আনন্দ কিছুই বুঝছে না। ফুয়াদ বলল, 'ব্যাপারটা সম্ভবত সোলার সিস্টেমকে নিয়ে।'

'হ্যাঁ,' বলল সিসিলিয়া। 'সানস্পট-এর কারণে পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে একটা বিপর্যয় ঘটে। সূর্য যেহেতু প্রতি সাতাশ দিনে একবার ঘোরে, এই বিপর্যয়ও ওই প্রায় এক মাস পর পর ঘটে।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম যে সূর্যও আমাদের বিরোধিতা করছে। কিন্তু এই অবস্থা কতক্ষণ চলবে?'

মাথা নাড়ল সিসিলিয়া। 'সাধারণত কয়েক ঘণ্টা চলে, খুব বেশি হলে একদিন। তবে এবারের বিপর্যয়টা খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে, দেখাও দিয়েছে একেবারে হঠাৎ করে। পাঁচ ঘণ্টা আগে সব ঠিক ছিল, এখন কোন রকম যোগাযোগই করা যাচ্ছে না। সূর্যে বোধহয় খুব বড় বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই অবস্থা এক হপ্তাও চলতে পারে।'

'এক হপ্তা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না?' আনন্দ ঘাবড়ে গেল।

'না,' বলল সিসিলিয়া। 'বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি আমরা।'

ফুয়াদ চাইছে দিনের আলো থাকতে থাকতে ক্যাম্প তুলে নিয়ে আবার

ফিরতি পথ ধরে ওরা, পথে গরিলারা বাধা দিলে লড়াই করে এগোবে। তার ধারণা, ক্যাম্পে বসে আরও এক রাত গরিলাদের হামলা ঠেকানো ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সিসিলিয়া কোন মতামত দিতে পারছে না। তার আশা, টিমের পুরুষ সদস্যরা, বিশেষ করে রানা, ক্যাম্পে থেকে যাওয়ার নিরাপদ কোন ব্যবস্থা ঠিকই বের করে ফেলবে। মোট কথা, হীরে ছাড়া সভ্য দুনিয়ায় ফেরবার কোন ইচ্ছে তার নেই।

রানা ইতস্তত করছে, কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

আনন্দ কিছুটা সময় চাইল রানার কাছে, 'দাঁড়া, শৈলী কি বলে দেখি।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' রাজি হল রানা।

শৈলীর চোখে চোখ রাখল আনন্দ। 'শৈলী কথা বলল? জিনিস কথা বলল?'

'কথা নয়।'

'জিনিসদের কথা শৈলী বুঝতে পারল?'

শৈলী জবাব দিল না। অন্যমনস্ক, কচি পাতা চিবাচ্ছে।

'শৈলী, আনন্দ কী বলে শোনো।'

আনন্দর দিকে ফিরল শৈলী।

'শৈলী জিনিসদের কথা বুঝতে পারল?'

'শৈলী জিনিসদের কথা বুঝতে পারল।'

প্রবল উত্তেজনায় আনন্দর শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। 'শৈলী জিনিসদের কথা বলতে দেখল। শৈলী জিনিসদের কথা বুঝতে পারল?'

'পারল। শৈলী বুঝতে পারল।'

'শৈলী নিশ্চিত?'

'শৈলী নিশ্চিত।'

'বাজি মার দিয়া!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আনন্দ।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে দেখা গেল ফুয়াদকে। 'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা দিনের আলো পাব আমরা,' বলল সে। 'তা ছাড়া, আপনি যদি ওগুলোর ভাষা শিখতেও পারেন, ওদের সঙ্গে কথা বলবেন কীভাবে?'

'ওদের ভাষা অনুবাদ করা সম্ভব হলে, কথা বলার কোন না কোন উপায় ঠিকই আমরা বের করে ফেলব,' তাকে আশ্বস্ত করল রানা। 'আনন্দ, একজন পোর্টারকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের ঢালে চলে যা তোরা। মাইক্রোফোন আর ভিডিও টেপ রেকর্ডার নিয়ে যাবি। দেখ ধূসর গরিলাদের সংকেত আর আওয়াজ কতটুকু কী রেকর্ড করতে পারিস।'

ফুয়াদকে সঙ্গে নিয়ে একটা প্ল্যান তৈরি করল রানা। প্রথমে পোর্টারদের দিয়ে ক্যাম্পের বাইরে বড় আকারের কয়েকটা গর্ত খোঁড়া হলো, এরকম গর্ত সাধারণত হাতি ধরবার জন্য প্রয়োজন হয়। গর্তের মেঝেতে খাড়া করে পোঁতা হলো কয়েক সারি কাঠের খুঁটি, মাথার দিক বল্লমের মত চোখা করা। সবশেষে গর্তগুলো গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো।

পরিখাটা কয়েক জায়গায় আরও চওড়া করল রানা। পরিখার কাছাকাছি এলাকা থেকে সরিয়ে ফেলল প্রতিটি মরা গাছ, ভাঙা ডাল আর ঝোপ, যেগুলো সেতু হিসাবে ব্যবহার করবার সম্ভাবনা আছে।

ক্যাম্পের মাথার উপর ঝুলে থাকা সমস্ত নিচু ডাল কেটে ফেলা হলো, ফলে ধূসর গরিলারা গাছে চড়লেও ক্যাম্পের মাটি থেকে অন্তত ত্রিশ ফুট উপরে থাকতে হবে তাদের–এত উঁচু থেকে লাফ দেওয়ার মত বোকামি তারা করবে বলে মনে হয় না।

দুই পোর্টার, আজিজি আর বারাওয়েকে, শটগান ছাড়াও প্রচুর টিয়ার গ্যাস ভর্তি ক্যানিস্টার দিল রানা।

সিসিলিয়ার সাহায্য নিয়ে পেরিমিটার ফেন্সে ইলেকট্রিক পাওয়ারের মাত্রা বাড়িয়ে ২০০ এএমপিএস করল রানা। এরচেয়ে বেশি পাওয়ার দিলে পাতলা জাল গলে যাবে।

সূর্য ডুববার সময় সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটা নিল রানা। তেপায়ায় বসানো হোঁতকা চেহারার আরএফএসডিগুলোয় অবশিষ্ট অ্যামিউনিশনের অর্ধেক লোড করল। ওগুলো শেষ হয়ে গেলে মেশিনগান স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেই মুহূর্ত থেকে ওদেরকে নির্ভর করতে হবে আনন্দ, শৈলী আর তাদের অনুবাদের উপর।

অথচ শৈলী আর আনন্দ পাহাড়ের ঢাল থেকে ফিরল মনমরা

একটা ভাব নিয়ে।

'তৈরি হতে কতক্ষণ সময় লাগবে তোর?' জানতে চাইল রানা।

'ঘণ্টা দুয়েক,' জবাব দিয়ে আবার সিসিলিয়ার দিকে ফিরল আনন্দ, ব্যাখ্যা করছে ঠিক কী ধরনের সাহায্য তার দরকার।

সিসিলিয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল, 'আপনি যে ভিডিও টেপ নিয়ে গরিলাদের মুখের ভাষা রেকর্ড করতে গেলেন, সেটা সম্ভব হয়েছে?'

'হয়েছে,' বলল আনন্দ। 'সাউন্ড আর সাইন, দুটোই রেকর্ড করে এনেছি। কমপিউটারে টেপ চালালে দেখতে পাবেন শৈলী ও-সব অনুবাদ করারও চেষ্টা করেছে।'

'তা হলে তোকে এরকম বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?' কাছাকাছি থেকে জানতে চাইল রানা।

'বললাম, শৈলী অনুবাদ করার চেষ্টা করেছে,' বিরক্তি চেপে বলল আনন্দ। 'আমি কি বলেছি তার চেষ্টা সফল হয়েছে? অনেক সংকেতের দু'রকম অনুবাদ করেছে সে। আবার কোন শব্দের অনুবাদ করার পর তা বাতিল করে দিয়েছে।'

'হুম।' রানা গম্ভীর, রণপ্রস্তুতি আরেকবার দেখতে অন্যদিকে চলে গেল।

সিসিলিয়ার সাহায্য নিয়ে আনন্দ প্রথমে বুঝতে চেষ্টা করল সংশ্লিষ্ট মাদী গরিলার মুখ থেকে বিভিন্ন সময়ে বেরুনো একই শব্দের অনুবাদ শৈলী প্রতিবার একই রকম করেছে কি না। তা যদি করে থাকে, শৈলীর করা অনুবাদের উপর আস্থা রাখতে পারবে ওরা।

কিন্তু কাজটা অত্যন্ত কঠিন। ওদের কাছে খুদে একটা ভিটিআর এবং ছোট একটা পকেট টেপ রেকর্ডার রয়েছে শুধু; কোন কানেকটিং কেবল্ নেই। টেপিং, চেকিং, রিটেপিং, লিসেনিং ইত্যাদি কাজের জন্য আলাদা একটা পরিবেশ দরকার–ক্যাম্পের সবাইকে বলা হলো কেউ যেন শব্দ না করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল, ধূসর গরিলার আওয়াজ ওদের কানে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে না। তার প্রতিটি শব্দ একই রকম

শোনাচ্ছে।

'এই শব্দগুলো টেপ করা হয়েছে,' জানতে চাইল সিসিলিয়া, 'ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল হিসেবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওয়াশিংটন বা নিউ ইয়র্কের কমপিউটার আমরা ব্যবহার করতে পারছি না, কিন্তু লিঙ্কআপ ট্র্যান্সমিটারটা ব্যবহার করতে তো অসুবিধে নেই।'

'আপনাদের এ-সব টেকনিক্যাল ব্যাপার আমি কমই বুঝি,' আগেভাগেই স্বীকার করে নিল আনন্দ।

'সবটুকু আপনার না বুঝলেও চলবে, শুধু বলি পদ্ধতিটা কীভাবে কাজ করে। আমাদের যে ট্র্যান্সমিটার স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাতে সাহায্য করে সেটার ভেতরও 256K মেমোরি সহ একটা কমপিউটার আছে।'

'আপনি বলতে চাইছেন, এই শব্দগুলোর সঙ্গে তুলনা করার জন্যে ওই কমপিউটারের মেমোরিতে থাকা প্রোগ্রাম আমরা ব্যবহার করতে পারব,' বলল আনন্দ।

তা ওরা পারল বটে, কিন্তু কাজটা এগোচ্ছে অসম্ভব ধীর গতিতে।

রাত আটটার দিকে প্রথম যে ফলাফল পাওয়া গেল সেটা বেশ উৎসাহ পাওয়ার মত। শৈলী আসলেও দক্ষতার সঙ্গে অনুবাদ করেছে। তবে রাত ন'টার মধ্যে মাত্র বারোটা আলাদা ফোঁসফোঁসানির অর্থ বের করা সম্ভব হলো—খাদ্যবস্তু, খাও, পানি, হ্যাঁ (সম্মতি), না (অনীহা), এসো, যাও, দূরে (সম্ভাব্য অর্থ), রাগ (সম্ভাব্য অর্থ), খারাপ ইত্যাদি।

কমপিউটার ছেড়ে উঠে পড়ল সিসিলিয়া। 'এবার একা সামলান,' আনন্দকে বলল সে।

কমপাউন্ডের মাঝখানে পায়চারি করছে রানা। এই সময়টাতেই স্নায়ুর উপর সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে, সবাইকে যখন প্রবল উদ্বেগ আর উত্তেজনার মধ্যে অপেক্ষায় থাকতে হয়। দু'একটা হাসি-ঠাট্টার কথা বলে কয়কয় আর তার লোকদের মন থেকে ভয়-ভয় ভাব যতটা সম্ভব দূর করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু কথা বললে আনন্দ আর সিসিলিয়ার

অসুবিধে হবে ভেবে চুপ করে আছে। কয়কয়ের দিকে একবার তাকাল

বলে। কারণ শুধু খুন করবারই ট্রেনিং ওগুলোকে দেওয়া হয়েছে।

হামলাটা চলল অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পেরিমিটার ফেন্স পুরোটাই মাটিতে শুইয়ে দিল ধূসর গরিলারা, পাতলা ধাতব জাল কাদায় ডুবে যাচ্ছে। বিকট গর্জন তুলে কমপাউন্ডের ভিতর ঢুকে পড়ছে তারা।

ঝম-ঝম বৃষ্টিতে ধূসর লোম চামড়ার সঙ্গে সেঁটে গেছে, ফলে লাল নাইট লাইটের আভা তাদের কাঠামোয় এনে দিয়েছে ভীতিকর ভৌতিক একটা ভাব। দশ থেকে পনেরোটা জিনিসকে কমপাউন্ডের ভিতর দেখতে পেল রানা–তাঁবু ছিঁড়ছে, জিনিসপত্র তছনছ করছে, সামনে কাউকে পেলে হামলা করছে। আজিজি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল, পাথরের জোড়া দাঁড়ের মাঝখানে ফেলে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো তার খুলি।

রানা, ফুয়াদ, কয়কয় আর সিসিলিয়া–সবাই ওরা লেযার ফায়ার করছে। তবে সামনের দৃশ্য ঝাপসা হওয়ায় আর বিভ্রান্তির কারণে কাজ হচ্ছে সামান্যই। তুমুল বর্ষণে লেযার বিম বিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ট্রেসার বুলেট হিসহিস করে কিছু দূর উঠে গতি হারাচ্ছে। কী কারণে কে জানে একটা RFSD পাগলামি শুরু করল, ব্যারেল অর্ধবৃত্ত তৈরি করছে–চারদিকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটল–প্রাণ হাতে করে কাদায় ডাইভ দিল সবাই, ক্রল করে যে যেদিকে পারে সরে যাচ্ছে।

তবে কিছু লাভও হলো। ওটার উন্মত্ত আচরণে কয়েকটা ধূসর গরিলা মারা গেল, অন্তত দুটো গরিলার মাথার খুলি উড়ে গেছে।

রানা রেকর্ডিং ইকুইপমেন্টের দিকে ছুটছে দেখে ওকে সাহায্য করবার জন্য হন-হন করে এগোল আনন্দ। আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছিল শৈলী, পিছন থেকে লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে পড়ল। দু'জনেই সশব্দে আছাড় খেল কাদায়।

পিছন ফিরে একবার ওদেরকে দেখে নিয়ে টেপ রিপ্লে-র সুইচ অন করল রানা। পরমুহূর্তে লেযার ফেলে দিয়ে কাঁধ থেকে অটোমেটিক রাইফেল নামিয়ে গুলি করল আনন্দর ঘাড়ের কাছে চলে আসা একটা জিনিসকে।

কিন্তু ইতোমধ্যে ধূসর গরিলারা ক্যাম্পের প্রায় সবাইকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। কাদায় পিঠ দিয়ে পড়ে আছে ফুয়াদ, বুকে উঠে বসেছে

একটা জিনিস। রানা ওটার খুলি উড়িয়ে দিল। সিসিলিয়াকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কয়কয় আর একটা জিনিস গড়াগড়ি খাচ্ছে কাদায়। লক্ষ্যস্থির করবার সুযোগ পাচ্ছে না রানা। কোমর থেকে পিস্তল বের করে সেদিকে ফুয়াদকে ছুটতে দেখল ও।

লাউডস্পিকার থেকে ভোঁতা ফোঁস ফোঁস আওয়াজ বেরুতে শুরু করল। কিন্তু গরিলারা সেদিকে মুহূর্তের জন্যও কান দিল না।

আরেকজন পোর্টার, বারাওয়ে, আর্তনাদ করে উঠল, সচল একটা RFSD-র সামনে পড়ে গেছে বেচারি। তাকে বিরতিহীন ঝাঁকি খেতে দেখে মনে হলো নাচছে; বুলেটগুলো ঝাঁঝরা করে দিল গোটা বুক, পিছন দিকে আছাড় খেল লাশ, ট্রেসার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

কমপক্ষে বারোটা ধূসর গরিলা মারা গেছে, কিংবা কাদায় পড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। পাগলামি শুরু করা RFSD-র অ্যামিউনিশন শেষ হয়ে গেছে, ব্যারেলটা আগুপিছু করছে, ক্লিক ক্লিক শব্দ বেরুচ্ছে খালি চেম্বার থেকে।

আরও গরিলা ক্যাম্পে ঢুকছে, লাউডস্পিকারের শব্দ কোন প্রভাবই ফেলছে না তাদের উপর। একটা গরিলাকে লাউডস্পিকারের তলা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল রানা, শব্দের উৎসের দিকে একবার মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

এক এক করে আরও তিনটে ধূসর গরিলাকে মারল রানা। কিন্তু জঙ্গল থেকে নতুন জিনিস আসবার কোন বিরাম নেই।

ওরা হেরে গেছে; আর মাত্র কয়েক মিনিট টিকবে।

একটা জিনিস সরাসরি ছুটে এল রানার দিকে। রানা জানে, হাতের রাইফেলে আর বুলেট নেই।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে রানা। জিনিসটা নাগালের মধ্যে না আসা পর্যন্ত নিষ্প্রাণ একটা স্ট্যাচুর মত অপেক্ষা করল ও। তারপর বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। উল্টো করে ধরা রাইফেলটা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চালাল ও।

অনায়াস ভঙ্গিতে অস্ত্রটা এক হাতে ধরে ফেলল ধূসর শত্রু। টান দিয়ে এত সহজে কেড়ে নিল, ওটা যেন হালকা একটা লাঠি, আর রানা যেন নিষ্প্রাণ ডামি। ছুঁড়ে ফেলে দিল সে রাইফেলটা।

অপর হাতের পাথর দুটোর একটা এবার জিনিসটার খালি হাতে চলে এল। স্তম্ভিত রানার মাথাটাই তার টার্গেট। পাথর ধরা হাত দুটো রানার মাথার দু'পাশে প্রসারিত করল সে।

বাকি শুধু হাত দুটো রানার মাথার দু'পাশে নিয়ে আসা। এই সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। জান বাঁচানো ফরজ। জুডো-কারাতে-কুস্তি-বক্সিং যতটুকু যা জানা আছে সব একের পর এক প্রয়োগ করল ও জিনিসটার উপর ঝাড়া দশ সেকেন্ড, তারপর অবাক হয়ে চেয়ে রইল মাটির দিকে। পাথর দুটো হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে ধূসর গরিলাটা। উরুসন্ধির থলিটা লক্ষ্য করে মারা রানার শেষ লাথিটাই ওকে কাবু করেছে বেশি, তীব্র যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিচ্ছে এখন। বিদ্যুদ্বেগে মাটি থেকে পাথর দুটো তুলল রানা, তারপর ঠিক ওদেরই কায়দায় ফাটিয়ে দিল জিনিসটার মাথা।

বিস্ময়কর একটা ব্যাপার ঘটল ঠিক তখন।

আরও একটা জিনিস ছুটে আসছিল রানার দিকে; হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। এমন হঠাৎ থামতে চেষ্টা করল যে, কাদায় পিছলে গেল তার পা, দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল কাদায় উপুড় হয়ে। চট্ করে উঠে পড়ল বটে, কিন্তু ওখানেই অবাক হয়ে বসে থাকল সে, মাথা একদিকে কাত করে কী যেন শুনছে।

কান পেতে আছে কিছুদূরে স্থির হয়ে দাঁড়ানো আরও কয়েকটা জিনিস। চারপাশে চেয়ে রানা দেখল সবকটা ধূসর গরিলা থমকে গিয়ে কী যেন শুনছে। কমপাউন্ডের চারদিকে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেছে ওরা। কান পেতে শুনছে।

রানা খেয়াল করল, বৃষ্টি প্রায় থেমে গেছে, ঝির ঝির নামমাত্র পড়ছে কি পড়ছে না।

বৃষ্টির তুমুল শব্দ থেমে যাওয়ায় ধূসর গরিলারা এতক্ষণে শুনতে পাচ্ছে লাউডস্পিকারের শব্দ ।

দম আটকে অপেক্ষা করছে রানা।

শব্দগুলো শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ধূসর-গরিলারা। এরপর কী ঘটবে বলা যায় না। যে-কোন মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে ওগুলো, সম্মিলিতভাবে বা একা; তারপরই আবার নতুন উদ্যমে শুরু

করতে পারে হামলা।

তবে সেরকম কিছু ঘটল না। লোকজনের কাছ থেকে পিছু হটতে শুরু করল জিনিসগুলো। পিছলে পড়ে গিয়েছিল ফুয়াদ, কাদা থেকে নিজের অস্ত্র তুলে নিয়ে সিধে হলো। তবে গুলি করল না সে। তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ধূসর-গরিলাটা যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, যেন মনে করতে পারছে না কী কারণে ক্যাম্পের ভিতর ঢুকেছিল সে।

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি আর মিটমিটে নাইট লাইটের লাল আভার ভিতর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে জিনিসগুলো, চলে যাচ্ছে একজন একজন করে। ওদেরকে হতবিহ্বল দেখাচ্ছে; বিভ্রান্ত আর বিমূঢ়।

ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ লাউডস্পিকারে বেজেই চলেছে।

শেষ গরিলাটাও ক্যাম্প ছেড়ে জঙ্গলে ফিরে গেল। ক্যাম্পে এখন শুধু অভিযাত্রীরা, ঝির-ঝির বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

বিশ মিনিট পর, ওরা যখন ক্যাম্পটাকে নতুন করে খাড়া করবার চেষ্টা করছে, আবার শুরু হলো তুমুল বর্ষণ।

উনিশ

সকালে দেখা গেল মিহি ছাই ক্যাম্প প্রায় ঢেকে ফেলেছে। মুকেনকো আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আকাশে খাড়া হয়েছে কালো ধোঁয়ার বিশাল একটা স্তম্ভ। আনন্দর আস্তিন ধরে টান দিল শৈলী।

'চলো পালাই।'

'না, শৈলী।'

টিমের কেউই এত তাড়াতাড়ি ফিরবার কথা ভাবছে না। ধূসর গরিলারা আর হামলা করবে না, সবার মনে এরকম একটা ধারণা চলে আসাই এর মূল কারণ। এই অভিযানে আসবার পিছনে প্রত্যেকেরই

একটা উদ্দেশ্য আছে, পরিবেশ নিরাপদ হয়ে ওঠায় এখন তারা যে-যার উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায়।

সিসিলিয়াকে হীরে পেতে হবে। এটা তার ব্যবসায়িক স্বার্থ।

ফুয়াদকে রানার কাছ থেকে পেতে হবে প্রশংসা, প্রমাণ করতে হবে নিজের যোগ্যতা।

আনন্দ গবেষণার জন্য ধূসর গরিলাদের আচরণ রেকর্ড করতে চায়, সম্ভব হলে একটা গরিলার মগজ বোতলে ভরে নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাবে।

রানার চায়ঃ ওদের অভিযান যেন সফল হয়, আর সবাই যাতে বহাল তবিয়তে যে-যার বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

'এখনই চলো,' আবার বলল শৈলী।

'কেন, এখনই কেন যেতে হবে?' জিজ্ঞেস করল আনন্দ।

'মাটি খারাপ। এখনই চলো।'

আগ্নেয়গিরির মতিগতি সম্পর্কে আনন্দর কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবে চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছে তাতে আতঙ্কিত হওয়ার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। মুকেনকো আগের চেয়ে একটু বেশি তৎপর বটে, তবে ওটার চূড়া থেকে ধোঁয়া আর গ্যাস ভিরুঙ্গায় আসবার পর থেকেই বেরুতে দেখছে তারা।

সকাল ন'টার দিকে জিঞ্জ শহরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল ওরা। রওনা হওয়ার আগে সবাইকে ডেকে রানা বলে দিল, মুকেনকোর মতিগতি ওর ভাল ঠেকছে না, শুধু আজকের দিনটাই জিঞ্জে থাকবে ওরা।

ও যখন কথা বলছে, লক্ষ করল ওর চোখের দিকে সিসিলিয়া একবারও তাকাল না।

প্রথমবার শহরটা দেখে রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল, এবার কারুরই তেমন প্রতিক্রিয়া হলো না। বিরাট একটা জায়গা জুড়ে ভাঙাচোরা, বিধ্বস্ত কিছু দালান-কোঠা পড়ে আছে।

'বুনো গরিলাদের ভাষা নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার,' রানার কানের কাছে সারাক্ষণ বকবক করে যাচ্ছে আনন্দ। তার একটা কথাও রানা শুনতে পাচ্ছে না। কান পেতে মুকেনকোর গর্জন শুনছে ও।

রানা জানে, আগ্নেয়গিরির আচরণ সম্পর্কে আগে থেকে কিছু বলা কঠিন। মুকেনকোর জ্বালামুখ থেকে হঠাৎ উদ্গিরণ শুরু হলে ওরা মারাত্মক বিপদে পড়ে যেতে পারে। তবে আতঙ্কিত না হওয়ার যথেষ্ট কারণও দেখতে পাচ্ছে ও।

জিঞ্জ শহরটা মুকেনকোর গোড়ায় তৈরি করা হয়। যারা তৈরি করেছিল তারা নিশ্চয়ই জানত এই জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি এদিকটায় কখনও লাভা উদ্গিরণ করে না। শহরটা পরিত্যক্ত হওয়ার পরও কয়েকশো বছর কেটে গেছে, কিন্তু মুকেনকোর কোন লাভা এদিকে একবারও গড়ায়নি। লাভার স্রোত গড়ায় এখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে, আর পাহাড়ের উপর স্তরের ঢালগুলোয়–শহর পর্যন্ত কখনোই নামে না।

তবে এবারের পরিস্থিতি যে আলাদা, তা ওদের মধ্যে সিসিলিয়া ছাড়া আর কেউ জানে না।

আজ সকালে ধূসর-গরিলারা চলে যাওয়ার পর স্যাটেলাইট সংযোগ পাওয়া যায় কি না দেখতে গিয়ে বিস্মিত হয় সে–প্রথমবারেই যোগাযোগ হয়ে যায় তার হেড অফিস, ওয়াশিংটনের সঙ্গে।

যোগাযোগ হওয়া মাত্র মার্ক জিলেটের রেকর্ড করা জরুরি একটা মেসেজ আসতে শুরু করল: 'কমপিউটার ভবিষ্যদ্বাণী করছে মুকেনকোয় খুব বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে। আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পারেন সাইট ত্যাগ করুন।'

তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ধূমায়িত মুকেনকোর টোপর আকৃতির চূড়ার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করল সিসিলিয়া, 'কমপিউটারের হিসাব কি সব সময় ঠিক হয়? হীরে সত্যি আছে কি না, না দেখেই ফিরে যাব? না!' স্যাটেলাইট যোগাযোগ কেটে দিল সে।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকবার ওরা অনুভব করল পায়ের তলার মাটি কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ভেঙে পড়া আর আধ ভাঙা দালান থেকে ধুলোর মেঘ উঠতে দেখা গেল। মুকেনকোর ভোঁতা গর্জনও ঘন-ঘন শোনা যাচ্ছে।

ব্যাপারটা নিয়ে কমবেশি সবাই উদ্বিগ্ন। একা শুধু সিসিলিয়া পাত্তা দিতে চাইছে না। সবাইকে একবার সে সহাস্যে শুনিয়েও দিল, 'হীরে সব সময় আগ্নেয়গিরির কাছাকাছিই পাওয়া যায়। আমরা এসেছিও সেরকম একটা জায়গায়। মুকেনকো চাইছে না আমরা তার সম্পদে হাত দিই, তাই ভয় দেখাচ্ছে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কিন্তু আমরা কী এত সহজে ভয় পাওয়ার বান্দা?'

আগ্নেয়গিরির সঙ্গে হীরের সম্পর্ক আছে, এটা মানুষ অনেকদিন থেকেই বিশ্বাস করে আসছে। বেশিরভাগ থিওরিতে বলা হয়: হীরে, খাঁটি কার্বন-এর তৈরি স্ফটিক, পৃথিবীর সারফেস থেকে এক হাজার মাইল নীচে আপার ম্যান্টল্-এর প্রচণ্ড চাপ আর উত্তাপে দানা বাঁধে। এরকম গভীরতায় হীরে তো নাগালের বাইরেই থাকবে। তবে ভলক্যানিক এরিয়ায়, তরল লাভার নদী ওগুলোকে সারফেসে তুলে আনে।

তারমানে এই নয় হীরে কুড়োবার জন্য বিস্ফোরিত আগ্নেয়গিরির দিকে দৌড়াতে হবে। বেশিরভাগ হীরের খনি পাওয়া যায় মৃত আগ্নেয়গিরির আশপাশে, কিমবারলি পাইপ নামে পরিচিত ফসিলাইজড্ কোন-এ।

ভিরুঙ্গার অবস্থান, ভূতত্ত্বীয় বিশ্লেষণে, দুর্বল আর আলগা রিফট্ ভ্যালিতে; যে এলাকায় প্রায় পাঁচ কোটি বছর ধরে আগ্নেয়গিরির তৎপরতা চলছে। রানার নেতৃত্বে অভিযাত্রী দলটা এখন সেই একই ফসিল ভলক্যানো খুঁজছে, জিঞ্জ-এর অধিবাসীরা যেগুলো খুঁজে পেয়েছিল।

দুপুরের কিছু পর ওগুলো পেল ওরা; শহরের পুবদিকে, পাহাড়ী ঢালের মাঝামাঝি উচ্চতায়–মাটি খুঁড়ে তৈরি করা এক সারি ছাদবিহীন টানেল, মূল মুকেনকো পাহাড়ের ঢালগুলোর দিকে চলে গেছে।

আনন্দকে খানিকটা হতভম্ব আর বিরক্ত দেখাল। কারণ, কী কোথায় আবিষ্কৃত হলো বুঝতেই পারেনি সে।

খয়েরি রঙের একটা টানেল দেখতে পেল আনন্দ, টানেলের গা থেকে মাঝেমধ্যে আরও ম্লান খয়েরি পাথর বেরিয়ে আছে। তার

মাথাতে ঢুকল না কী কারণে এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সিসিলিয়া।

তারপর রানাকে ব্যাখ্যা করতে শুনল সে—ম্লান খয়েরি পাথরগুলো আসলে হীরে; পরিষ্কার করবার পর নোংরা কাঁচের মত দেখাবে।

পরিবেশ-পরিস্থিতি ভুলে প্রথমে কিছুক্ষণ লাফাল সিসিলিয়া, তারপর রানার কোমর জড়িয়ে ধরে কয়েক পাক নাচল। একা শুধু রানার সঙ্গে নয়, একে একে আনন্দ, ফুয়াদ আর কয়কয়কেও এক-আধ মিনিট করে নাচতে বাধ্য করল সে; এমনকী পোর্টারদেরও রেহাই দিল না। মেম সাহেবের এরকম উল্লাস তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হলো। কয়কয়ের সঙ্গে সুর করে গান ধরল তারা।

যতই নাচ-গান হোক, প্রথমে অনেকেই বোঝেনি চোখের সামনে এগুলো ওরা কী দেখছে।

সাধারণ একটা কিমবারলি পাইপের পাথুরে গর্ভে হীরে থাকে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায়। গড়ে উত্তোলিত প্রতি একশো টন পাথর থেকে হীরে উদ্ধার হয় মাত্র বত্রিশ ক্যারাট—এক আউন্সের পাঁচ ভাগের একভাগ।

উঁকি দিয়ে একটা ডায়মন্ড শাফটের নীচে তাকালে কেউ কোনদিন ডায়মন্ড দেখতে পাবে না। তবে জিঞ্জ মাইনে দেখা যাচ্ছে গা ফুঁড়ে পাথরগুলো বেরিয়ে আছে।

রানা ওর নিজের ম্যাচেটি ব্যবহার করে কয়েক মিনিটের মধ্যে খুঁড়ে ছয়শো ক্যারাট বের করে ফেলল। আর সিসিলিয়া তো কিছুই খুঁড়ছে না, টানেলের গা থেকে বেরুনো হীরের বড় বড় টুকরো ধরে টান দিয়ে ছাড়িয়ে আনছে শুধু। তার দেখাদেখি সবাই কাজটায় হাত লাগাল, কেউ বসে থাকল না।

'এই একটা টানেলের মাত্র দশ-বারো গজের মধ্যে চোখ বুলিয়ে কম করেও বিশ হাজার ক্যারাট Type IIB BORON-COATED DIAMONDS দেখতে পাচ্ছি আমি, খোঁড়াখুঁড়ি ছাড়াই,' রানাকে বলল সিসিলিয়া। 'এটা কী তা হলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় হীরের খনি নয়?'

উত্তর না দিয়ে সিসিলিয়ার চোখে চোখ রেখে এক সেকেন্ড পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু অনুভব করছ না?'

হ্যাঁ, পায়ের নীচে খানিক পরপরই কাঁপছে মাটি। তবে জবাবে সিসিলিয়া কিছু বলবার আগে আনন্দ মাঝখান থেকে জানতে চাইল, 'এই মাইন যদি এতই সমৃদ্ধ হবে, জিঞ্জ-এর লোকজন এটা ফেলে চলে গেল কেন?'

'আমার ধারণা,' বলল রানা, 'ধূসর-গরিলারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। ওরা অভ্যুত্থান ঘটায়।' হাসছে ও, পাথরের ভিতর থেকে টেনে হীরের টুকরো বের করছে।

কথাটা হাসতে হাসতে বলা হলেও, খানিক পর নির্মম সত্যটা প্রমাণ সহ চাক্ষুষ করল ওরা।

প্রস্তাবটা এল ফুয়াদের কাছ থেকে। 'টানেলের মুখেই এত হীরে, ভেতর দিকে না জানি কী আছে। একটু এগিয়ে দেখা দরকার না, সার?'

'শুধু এটা কেন, আমাদের আসলে সবগুলো টানেলই দেখতে হবে,' তাড়াতাড়ি বলল সিসিলিয়া।

'যদি সময় পাই,' বিড়বিড় করল রানা।

পনেরো মিনিট পর টানেল ধরে একটা তেমাথায় পৌঁছাল ওরা। দু'পাশের শাখা টানেলে তাকাতেই স্থির পাথর হয়ে গেল সবাই, নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে।

শাখা টানেল দুটোয় মেঝে থেকে দশ ফুট পর্যন্ত স্তূপ হয়ে আছে শুধু নর কঙ্কাল। এরকম একটা রোমহর্ষক দৃশ্য দেখে সবাই ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলেও, আনন্দকে নিয়ে সামনে এগোল রানা।

সবগুলোই কয়েকশো বছরের পুরানো কঙ্কাল। প্রায় সব হাড়ই আলগা হয়ে খুলে পড়েছে। এগুলো যে মানুষের হাড়, গরিলার নয়, পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো ওরা। প্রতিটি খুলি ভাঙা দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না কারা তাদেরকে কীভাবে খুন করেছে।

বিশ মিনিট পর এরকম আরও একটা তেমাথায় মানুষের কঙ্কাল আর হাড়ের স্তূপ দেখতে পেল ওরা।

ফুয়াদের ধারণা, শহরেই এদেরকে খুন করা হয়, তারপর লাশগুলো নিয়ে এসে রাখা হয় এখানে।

সামনে আরও কয়েকটা তেমাথা পড়ল, দু'পাশের প্রতিটি শাখা টানেলে শয়ে শয়ে, কিংবা হয়তো হাজার হাজার মানুষের মাথার খুলি স্তূপ হয়ে আছে। তবে পরীক্ষা করবার জন্য থামল না ওরা।

এদিকের টানেলের গায়ে সবই উন্নত মানের হীরে, আকারেও বড়। ঢালু হয়ে নেমে গেছে টানেলের মেঝে। গরম লাগছে ওদের, ঘামছে সবাই। অক্সিজেনের অভাবে একটু হাঁপাচ্ছে।

কিন্তু তবু কেউ থামবার কথা ভাবল না, ভাবল না ফিরে যাওয়ার কথা। তার অবশ্য কারণও আছে।

টানেল ধরে যতই নীচে নামছে ওরা, হীরের আকার ততই বড় হচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি হীরে আগেরগুলোর চেয়ে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশি স্বচ্ছ।

অনেকেই যে যার ক্যানভাস ব্যাগ থেকে আগের হীরে ফেলে দিয়ে নতুন হীরে ভরতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সিসিলিয়া কয়কয় আর তার লোকদের ডেকে বলল, 'তোমরা কাপড়ের ব্যাগ বা পোঁটলা তৈরি করে তাতে হীরে ভরো। সবাই তোমরা এই হীরের বখরা পাবে।'

এটা টানেলের একটা সাত মাথা। মূল টানেলের মাথায় ছাদ না থাকায় আলোর কোন অভাব নেই। সবাই এদিক ওদিক আসা-যাওয়া করছে দেখে পনেরো মিনিট সময় বেঁধে দিয়েছে রানা, এর মধ্যে সবাইকে এই সাত মাথায় জড়ো হতে হবে।

নিজের রাকস্যাক খুলে কী যেন সব বের করছে সিসিলিয়া। রানা বা অন্য কাউকে আশপাশে দেখতে পাচ্ছে না সে, শুধু শৈলীকে নিয়ে আনন্দ বসে রয়েছে একটা পাথরের উপর।

'কী ওগুলো?' জানতে চাইল আনন্দ।

'বিস্ফোরক,' সিসিলিয়া নিজের কাজে ব্যস্ত, সংক্ষেপে জবাব দিল। রাকস্যাক থেকে সাদা কয়েকটা সিরামিক কোন আর অ্যান্টেনা সহ কয়েকটা ছোট বাক্স বের করল সে। প্রতিটি সিরামিক কোন-এ একটা করে বাক্স আটকাল, তারপর পাশের অন্ধকার টানেলে ঢুকে দেয়ালের গায়ে একটা কোন বসাল। তারপর আরও একটু ভিতরে ঢুকে আরেকটা। এক সময় অন্ধকারে হারিয়ে গেল সিসিলিয়া।

আনন্দ তার পিছু নিতে যাবে, ওর আস্তিন টেনে ধরে রাখল শৈলী: 'মাটি খারাপ। চলো যাই।'

ছাদঅলা টানেল থেকে বেরিয়ে এসে আরেকটা অন্ধকার টানেলে ঢুকল সিসিলিয়া। দেয়ালের গায়ে কোন বসাবার সময় তার হাতে টর্চ জ্বলতে দেখতে পাচ্ছে আনন্দ। তারপর বাঁক নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাত মাথায়, রোদের মধ্যে, বেরিয়ে এল রানা; কাঁধের ব্যাগ আর পকেট হীরায় ফুলে আছে। 'সিসিলিয়া কোথায়?' আনন্দকে দেখেই জিজ্ঞেস করল।

'টানেলের ভেতর।'

'ওখানে কী করছে সে?'

'দেখে তো মনে হলো কোন ধরনের এক্সপ্লোসিভ টেস্ট,' বলল আনন্দ, চোখ ইশারায় অবশিষ্ট তিনটে সিরামিক কোন দেখাল, সিসিলিয়ার প্যাকের পাশে সাজানো রয়েছে।

একটা কোন তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে রানা। 'তুই জানিস এগুলো কী?'

মাথা নাড়ল আনন্দ।

'এ হলো আরসি,' বলল রানা। 'মাথা খারাপ না হলে কেউ এগুলো এখানে ফিট করবে না। সিসিলিয়া কী গোটা এলাকাটা উড়িয়ে দিতে চাইছে?'

'রেজন্যান্ট কনভেনশনাল বা আরসি হলো টাইমড্ এক্সপ্লোসিভ। ঠিকমত ব্যবহার করতে জানলে ছয় আউন্স এক্সপ্লোসিভ দিয়ে পঞ্চাশ টন স্ট্রাকচারাল স্টীল নামিয়ে আনা যাবে।' কথার মাঝখানে দু'বার মুখ তুলে মুকেনকোর দিকে তাকাল রানা, ওদের মাথার উপর বিরতিহীন ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

এই সময় হাসিমুখে টানেল থেকে বেরিয়ে এল সিসিলিয়া। 'একটু পরই উত্তরটা জানা যাবে,' বলল সে।

'কিসের উত্তর, সিসিলিয়া?'

'কিমবারলাইট ডিপজিট-এর বিস্তৃতি। বারোটা সাইজমিক চার্জ

ফিট করেছি, বুঝলে–ডিফিনিটিভ রিডিং পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট।'

'তুমি বারোটা রেজ়নান্ট চার্জ সেট করেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা, চোখ-মুখ থমথম করছে।

'মানে, ওই বারোটাই সঙ্গে করে এনেছিলাম আর কী। ওতেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।'

'ওতেই কাজ হবে,' বলল রানা। 'সম্ভবত একটু বেশিই হবে।'

এতক্ষণে সিসিলিয়া খেয়াল করল, রানা ওর সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করছে না। 'মাসুদ ভাই, কী ব্যাপার? আমি কোথাও ভুল করেছি?'

'মুকেনকোর দিকে ভাল করে তাকিয়েছ?' হাত তুলে আকাশের দিকটা দেখাল রানা। 'ওটা বিস্ফোরণের পর্যায়ে চলে আসছে।'

'জানি,' বলে হেসে উঠল সিসিলিয়া। 'সব মিলিয়ে আটশো গ্রাম এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করেছি আমি,' বলল সে। 'অর্থাৎ দেড় পাউন্ডেরও কম। এই সামান্য এক্সপ্লোসিভে কিছু আসবে যাবে না।'

'আমি তা মনে করি না, সিসিলিয়া,' বলল রানা। 'বিশেষজ্ঞ নই, ঠিক, তবে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানই বলে দিচ্ছে একটা আগ্নেয়গিরি যেখানে বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে তার কাছাকাছি কোথাও বিস্ফোরক ফাটানো উচিত নয়।'

সিসিলিয়া স্থির হয়ে গেল। তার ব্যবসায়িক স্বার্থে এক্সপেরিমেন্টটা করা উচিত। আবার রানার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কোনদিন করেওনি। বিকল্প কিছু আছে কিনা ভেবে দেখছে সে।

'ঠিক আছে, তুমি তোমার হেড অফিসের পরামর্শ চাও,' বলল রানা। 'ওখানে এক্সপার্ট জিয়োলজিস্টরা আছেন...'

'দরকার নেই কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল সিসিলিয়া। 'তুমি যখন মানা করছ, তার ওপর আর কথা কী।'

ওরা কথা বলছে, এই ফাঁকে আনন্দর পাশ থেকে সামনে এগিয়ে গেছে শৈলী। সিসিলিয়ার প্যাকের পাশে পড়ে থাকা ডেটনেটিং ডিভাইসটা তুলল সে। ছোট একটা যন্ত্র, গায়ে ছয়টা LED জ্বলজ্বল করছে–শৈলীকে মুগ্ধ করবার জন্য যথেষ্ট। বোতামটায় চাপ দেওয়ার জন্য আঙুল তুলল সে।

সেদিকে চোখ পড়তে গুঙিয়ে উঠল সিসিলিয়া। 'ওহ্, গড্!'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'শৈলী,' নরম সুরে বলল ও। 'শৈলী, না। না। শৈলী কাজটা ভাল করবে না।'

'শৈলী ভাল গরিলা। শৈলী ভাল। আনন্দ শৈলীর কথা শোনে না। তোমরা শৈলীর কথা শোনো না।'

ডেটনেইটিং যন্ত্রটা ধরে আছে শৈলী। LED-এর মিটমিটে আলো ওকে যেন জাদু করেছে। মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল একবার।

'না, শৈলী,' বলল ফুয়াদ। আনন্দর দিকে তাকাল সে। 'ডক্টর সেন, আপনি ওকে থামাতে পারেন না?'

'শৈলী।' হাত বাড়াল আনন্দ। 'শৈলী ভাল গরিলা। শৈলী আনন্দকে দেবে ওটা।'

ভুলটা কোথায় হয়েছে বলা মুশকিল। হাত না বাড়িয়ে শৈলীর নাগালের মধ্যে পৌঁছানো উচিত ছিল আনন্দর? নাকি শৈলী ইচ্ছে করেই কাজটা করল?

'শৈলী ভাল গরিলা। শৈলীকে আনন্দ এখান থেকে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, শৈলীকে আনন্দ এখান থেকে নিয়ে যাবে।' হাতটা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে আনন্দ। 'ওটা আনন্দকে দাও...'

আনন্দ থামেনি, তার আগেই ডেটনেইটিং যন্ত্রটা ছুঁড়ে দিল শৈলী। খুব জোরে ছুঁড়ল। আনন্দ ওটার নাগাল পেলেও ধরতে পারত কি না সন্দেহ।

ওটার গতিপথ দেখেই রানা বুঝে নিল, আনন্দ ধরতে পারবে না। ওর নিজেরও নাগালের বাইরে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, তারপরও লাফ দিয়ে ধরবার চেষ্টা করল, এবং ব্যর্থ হলো।

আনন্দর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেল যন্ত্রটা।

একই সঙ্গে অনেকগুলো বুম-বুম বিস্ফোরণ হীরের কণা মেশানো চিক্‌মিকে ধুলোর মেঘ তৈরি করল মাইন শাফটের ভিতর। তারপরই নীরবতা নেমে এল।

'কী বলেছিলাম?' নীরবতা ভেঙে সহাস্যে বলল সিসিলিয়া। 'আশা

করি সবার ভয় কেটে গেছে। এই সামান্য বিস্ফোরককে কিছু আসে যায় না…',

ঠিক তখনই গর্জন ছাড়ল মুকেনকো। টানেলটা এত জোরে ঝাঁকি খেল, সবাই ওরা চোখের পলকে ছিটকে পড়ল মাটিতে।

বিশ

সারা দুনিয়ার বেশ ক'টা মানমন্দিরে ধরা পড়লঃ কঙ্গোর উত্তর-পুবে যে ভূমিকম্পটা হচ্ছে সেটার মাত্রা রিখটার স্কেলে ৮-এর কম নয়। এই স্কেলে মাটি এত কাঁপে যে কোন মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা খুবই কঠিন। জমিন শুধু কাঁপে না, স্থান বদল করে, চওড়া ফাটল ধরে; গাছ তো বটেই, এমনকী ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে তৈরি বহুতল ভবনও কাত হয়ে পড়ে যায়।

মুকেনকোর উদ্গিরণ শুরু হওয়ার পর থেকে রানা, সিসিলিয়া, আনন্দ, ফুয়াদ আর কয়কয়ের জন্য পরবর্তী পাঁচ মিনিট পরিবেশটা স্রেফ নরক হয়ে উঠল।

রানা দেখল, প্রতিটি বস্তু যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। এমন কিছু নেই যেটা নড়ছে না। সবাই মাটিতে ছিটকে পড়বার পর ক্রল করছে, কিন্তু সেটাও নির্বিঘ্নে নয়–হাঁটু আর কনুইয়ের নীচে মাটি ঝাঁকি খাওয়ায় বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে হচ্ছে।

টানেল থেকে একটা র‍্যাম্প বেয়ে উপরে উঠে এল ওরা। উপরের দৃশ্য আরও ভয়ঙ্কর। ছন্দবিহীন, এলোমেলোভাবে দোল খাচ্ছে শহর। এই দোদুল্যমান অবস্থা বেশ কিছু সময় চলল–হয়তো বিশ বা ত্রিশ সেকেন্ড–তারপরই শুরু হলো আধ ভাঙা দালান, ভবন আর বিরাট সব ইমারতের পতন। যা কিছু দাঁড়িয়ে ছিল, হুড়মুড় করে পড়ে গেল সব

নিমেষের মধ্যে। কোন কোন ভবন, চারদিকের দেয়াল আর খোলা উঠান নিয়ে ডেবে গেল নীচের দিকে। হঠাৎ সেখানে বিরাট একটা গহবর তৈরি হলো। যা কিছু ছিল ওখানে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিছুরই কোন অস্তিত্ব থাকল না।

এরকম একটা গভীর খাদ তৈরি হলো ওদের ঠিক পিছনে। একটুর জন্য পাতালে তলিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেল ওরা, তবে সবাই নয়—লাইনের শেষ মাথায় নারাঙ্গানি নামে একজন পোর্টার ছিল, তার আর্তচিৎকার ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে শুনে কারও আর বুঝতে বাকি থাকল না কী ঘটেছে।

ছুটতে ছুটতে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। কিন্তু তারপরও বিপদ পিছু ছাড়ছে না। এক ফোঁটা বাতাস নেই, অথচ গাছগুলো প্রবল বেগে দোল খাচ্ছে। খানিক পর ওগুলোরও পতন শুরু হলো।

মহীরুহের পতন চারপাশ থেকে অবিশ্বাস্য গর্জন তুলছে। তবে মুকেনকো থেকে ভেসে আসা আওয়াজের সঙ্গে বোধহয় কোন কিছুরই তুলনা চলে না। এক সঙ্গে একশো ফাইটার জেট সাউন্ড ব্যারিয়ার ভাঙলে যে সনিক বুম সৃষ্টি হয়, এটা তারচেয়েও জোরাল আর ভীতিকর। প্রতিবার যেন এক হাজার কামান দাগা হচ্ছে।

আসলে কিন্তু আগ্নেয়গিরি এখন আর গর্জন করছে না। টোপর আকৃতির জ্বালামুখ থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরুনো লাভার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওরা।

লাভার এই বিস্ফোরণই শক ওয়েভ সৃষ্টি করছে।

সেজন্যই, মাটি যখন কাঁপছে না, তখনও উত্তপ্ত বাতাসের ধাক্কায় বারবার ছিটকে পড়ে যাচ্ছে ওরা।

আতঙ্কিত শৈলী গোঙাচ্ছে।

ছুটছে ওরা। ক্যাম্প আর বেশি দূরে নয়।

তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে আছাড় খেল সিসিলিয়া। কোন রকমে সিধে হয়ে টলতে টলতে এগোল আবার। বাতাস এত গরম, গায়ে যেন ফোস্কা পড়ে যাবে। চারদিকে শুধু ঘন ছাই উড়ছে, দশ হাত দূরের জিনিসও এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল সূর্য। কঙ্গো রেইন ফরেস্ট

দিনের বেলাতেই অন্ধকার হয়ে গেল। ঘন কালো ধোঁয়ার ভিতর প্রবল আলোড়ন চলছে। উথলানো সেই নিরেটদর্শন ধোঁয়া থেকে লকলকে আগুনে শিখাও বেরিয়ে আসছে।

তারপর ওরা বুঝতে পারল, লাভা উদ্গিরণের ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া আর ধেয়ে আসা ভারী মেঘ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ঝড় আর বজ্রপাত সহ তুমুল বর্ষণ শুরু হলো।

ওদের চারপাশে বৃষ্টির মত বাজ পড়ছে। রানার হিসাবে প্রথম মিনিটে কমপক্ষে দুশো বজ্রপাত ঘটেছে, প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিনটে। কড়-কড়-কড়াৎ, বজ্রপাতের পরিচিত এই শব্দ কেউ ওরা আলাদাভাবে চিনতেই পারল না।

ওদের কানে ব্যথা শুরু হলো। শক ওয়েভের ধাক্কা খেয়ে বাধ্য হলো পিছু হটতে।

সব কিছু এত দ্রুত ঘটছে যে পরে অনেক কিছুই ওরা স্মরণ করতে পারবে না। কয়কয় পড়ে গেল, তার গায়ে পা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আনন্দ, ফুয়াদ, সিসিলিয়া। দেখতে পেয়ে রানা তাকে ধরে সিধে করল। ওর গায়ে হেলান দিয়ে হাঁটতে শুরু করল কয়কয়; খোঁড়াচ্ছে, এক হাতে পাঁজর চেপে ধরে আছে। পথ হারিয়ে আরেক দিকে চলে যাচ্ছিল সিসিলিয়া, তাকেও ফিরিয়ে আনল রানা।

ওমবুরা, ওদের একজন পোর্টার, ক্যাম্প ছেড়ে শহরের দিকে আসছিল ওদের খোঁজে। ওরা তাকে ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল, ওদের চোখে পড়বার জন্য একটা হাত তুলে নাড়ছে। এই সময় বাজ পড়ল তার পিছনে কোথাও।

রানা জানত যে ইলেকট্রন-এর অদৃশ্য প্রবাহের পিছু নিয়ে বজ্র নেমে আসে, এবং তারপর মাটি থেকে উপরের মেঘে উঠে যায়। কিন্তু কে ভেবেছিল ব্যাপারটা চাক্ষুষ করতে হবে! অকস্মাৎ ওদের চোখের সামনে একটা মিসাইলে পরিণত হলো ওমবুরা, উড়ে এল ওদের দিকে।

মাটিতে পড়ে সোয়াহিলি ভাষায় হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত চিৎকার শুরু করল লোকটা।

ওদের চারদিকে মট মট করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে। শিকড়

সহ কাত হয়ে যাচ্ছে বহু গাছ। চোখ ধাঁধানো বিদ্যুচ্চমকের বিরতি নেই। জঙ্গল পুড়ছে। চারদিকে ধোঁয়া। ওমবুরা পুড়ে গেছে। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে। ওদের সবাইকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়ে এবার সরাসরি তার মাথায় একটা বাজ পড়ল।

জ্বলন্ত মশাল হয়ে গেল ওমবুরা।

রানার নাগালের মধ্যেই রয়েছে সে। কিন্তু তাকে ঘিরে থাকা সাদা আগুন এত তীব্র, পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো ও। তারপর, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও, লাফ দিল রানা। লাফ দিল সাদা আগুন লক্ষ্য করে। কারণ ওমবুরাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

রানাকেও কোথাও দেখা গেল না। চোখ-ধাঁধানো আলো ওকেও ঢেকে ফেলেছে।

বোধহয় এক সেকেন্ডও পেরুতে দেয়নি ওরা–সিসিলিয়া, ফুয়াদ আর আনন্দ, এমনকী কয়কয়ও–প্রায় একযোগে লাফ দিল ওই সাদা আগুন লক্ষ্য করে।

বুদ্ধি করে সবাই চোখ মুখ যতটা সম্ভব ঢেকে রেখেছিল, পরনের কাপড়চোপড়ও গায়ের চামড়া বাঁচাতে সাহায্য করেছে। সবার মিলিত চেষ্টার কাছে হার মানল সাদা আগুন।

কিন্তু যার জন্য এত কিছু করা, তাকে ওরা বাঁচাতে পারল না। রানার সাহায্য পাওয়ার আগেই মারা গিয়েছিল সে।

ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এসেছে, প্রকাণ্ড একটা গাছ সামনের পথে ধরাশায়ী হলো–তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু আর চওড়া একটা বাধার সামনে পড়ল দলটা। এখনও চারদিকে বাজ পড়ছে। ধরাশায়ী গাছটার উপর চড়ে পথ তৈরি করে নিল ওরা।

কাছাকাছি আরও একটা বাজ পড়ল। ভয়ে ডাল-পালার ভিতর মুখ লুকাল শৈলী, কোথাও যেতে রাজি নয়। বাকি পথটুকু ওকে টেনে আনতে বাধ্য হলো আনন্দ।

ক্যাম্পে পৌঁছে ওরা দেখল একটা তাঁবু পুড়ে গেছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও। ডিশ অ্যান্টেনার ভাঙা টুকরোগুলো কাদায় গড়াচ্ছে।

'শুধু প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস নিয়ে এখুনি ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাব আমরা!' চিৎকার করে কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিল রানা।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে সিসিলিয়া। ইঙ্গিতে নাক আর গলা দেখাল রানাকে। 'পুড়ে গেছে…জ্বালা করছে…'

'গ্যাস ঢুকেছে গলায়–' সিসিলিয়া কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে খপ করে ধরে ফেলল রানা, তারপর কাঁধে তুলে নিল তাকে। 'ঢাল বেয়ে উঠতে হবে আমাদের,' ফুয়াদকে মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল ও।

এক ঘণ্টা পর, উঁচু জমিনে দাঁড়িয়ে, ছাই আর ধোঁয়ায় ঢাকা শহরটার দিকে শেষবারের মত তাকাল ওরা। আগ্নেয়গিরির আরও উপরের ঢালে চোখ পড়তে দেখল গাছের একটা লম্বা লাইনে দপ করে একযোগে আগুন জ্বলে উঠল–অদৃশ্য গলিত লাভা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসার পরিণতি। ধূসর গরিলাদের আর্তচিৎকার, এত সব শব্দের ভিতর অস্পষ্ট হলেও, শুনতে পেল ওরা। উত্তপ্ত লাভা একটাকেও রেহাই দেবে না। পালাবে যে, তারও কোন উপায় নেই। পাহাড়ের কিনারা থেকে জলপ্রপাতের মত জিনিসদের এলাকার জঙ্গলে নেমে আসছে লাভা, পরিমাণে এত বেশি আর গতি এত দ্রুত যে ছুটে পারা যাবে না।

ওদের চোখের সামনে পুরু লাভার নীচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জঙ্গল। তারপর এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শহরটাও। নিখোঁজ শহর জিঞ্জ কেউ আর কোন দিন খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না।

জ্ঞান ফিরবার পর চোখ খুলে দৃশ্যটা সিসিলিয়াও দেখল। বলে দিতে হলো না, নিজেই উপলব্ধি করতে পারল–চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে তার এত সাধের হীরের খনি।

ওদের সঙ্গে না আছে খাবার, না পানি। অ্যামিউনিশন থাকলেও, খুব সামান্য। সবাই এত ক্লান্ত, যে-যার শরীরকে অতি কষ্টে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাপড়চোপড় পোড়া, ছেঁড়া। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। চারপাশের দৃশ্য কদর্য আর বিবর্ণ। ঝিলমিলে জলপ্রপাত আর স্বচ্ছ ঝরণা ছাই আর কালিঝুলিতে ঢাকা পড়ে গেছে। আকাশের রঙ পাঁশুটে, কোথাও ঘন কালো; মাঝে মাঝে আগুনের শিখা ছুটোছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে মিহি ছাই।

ছাই মেখে ওদেরকে ভূতের মত দেখাচ্ছে। প্যাকগুলো কর্কশ আর খরখরে লাগছে পিঠে। শ্বাস নিচ্ছে দূষিত বাতাসে, প্রায় সারাক্ষণ কাশছে খক্‌-খক্‌ করে। নাক আর চোখে জ্বালা। অথচ কারও কিছু করবার নেই। শুধু হাঁটা ছাড়া।

কালো ছাইয়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রানার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সিসিলিয়া। 'এটা আমার ব্যক্তিগত পরাজয়,' খক্‌-খক্‌ কাশির ফাঁকে বলল সে। 'আমি আমার খনি পেয়েও হারিয়েছি।'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়ল।

'জানি কী বলতে চাইছ,' আবার বলল সিসিলিয়া। 'এবং, বিশ্বাস করো, তোমার সঙ্গে একমত আমি। আসলে সবাই আমরা জিতেছি–আমরা এই ক'জন, যারা বেঁচে আছি।'

ফুয়াদ ভাবছে, আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ইউরো-জাপানিজ কনসার্টিয়ামের সঙ্গে যাব না, এই সিদ্ধান্তটাই আমাকে নতুন আরেকটা জীবন দান করেছে। উপরি পাওনা–যার কাছে চিরঋণী হয়ে ছিলাম তাঁর দেখা পেয়েছি, তাঁর বিরল সান্নিধ্য লাভ করেছি।

তবে আনন্দ হতাশ। ফটোগ্রাফ, ভিডিও টেপ, সাউন্ড রেকর্ডিং–সব ফেলে যেতে হচ্ছে তাকে। মগজ তো দূরের কথা, ধূসর একটা গরিলার কঙ্কাল পর্যন্ত সঙ্গে নিতে পারছে না সে। প্রমাণ ছাড়া কীভাবে সে দাবি করবে নতুন একটা প্রজাতি আবিষ্কার করেছে?

মুকেনকো থেকে আগুন আর লাভা বেরুতে দেখেই রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ক্যাম্প হয়ে সোজা পরিত্যক্ত সি-১৩০ ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনে পৌঁছাতে হবে ওদেরকে। ইউরো-জাপানিজ কনসার্টিয়ামের ওই প্লেনেই শুধু আশ্রয় আর সাপ্লাই পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ওর ধারণা ছিল, প্লেনটার কাছে পৌঁছাতে দু'ঘণ্টা সময় লাগবে ওদের। কিন্তু ছাই ঢাকা প্রকাণ্ড কাঠামোটার দেখা পেল ওরা একটানা ছয় ঘণ্টা হাঁটবার পর।

দেরি হওয়ার অনেক কারণের একটা হলো, জেনারেল পাকুড় মোয়ানা আর তাঁর সৈন্যদের এড়াবার জন্য অনেকটা ঘুরপথ ধরে আসতে হয়েছে ওদেরকে। যখনই জীপ বা ট্রাকের চাকার দাগ দেখা

গেছে, ওদেরকে আরও পশ্চিমে সরিয়ে নিয়েছে ফুয়াদ।

'এই জেনারেল বা তার সৈন্যদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার চেয়ে মাম্বা সাপের কামড় খেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল, সার,' রানাকে জানিয়েছে সে। 'দেখতে পেলে কিছু জানতে পর্যন্ত চাইবে না, স্রেফ ছুরি চালিয়ে লিভারটা বের করে খেয়ে নেবে।'

প্রথমেই ওরা নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনটার আশপাশে কেউ আছে কি না।

বেশ অনেকটা দূর থেকে ভেসে আসছে কিগানিদের একটানা ড্রাম পেটানোর নরম আওয়াজ। জেনারেল মোয়ানার সৈন্যরা মর্টার ছুঁড়ছে, তার গমগমে শব্দও শুনতে পাচ্ছে ওরা। তা ছাড়া গোটা এলাকা শান্ত আর নিস্তব্ধই বলা যায়।

দলটাকে বেশ কিছুক্ষণ হলো জঙ্গলের আড়ালে দাঁড় করিয়ে রেখেছে রানা, প্লেন আর তার আশপাশটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে। এই সুযোগে কমপিউটার অন করে স্যাটেলাইটের সঙ্গে সংযোগ পাওয়ারও চেষ্টা করল একবার। ভিডিও স্ক্রিন থেকে সারাক্ষণ ছাই পরিষ্কার করতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করবার পর হাল ছেড়ে দিল, ওয়াশিংটন বা নিউ ইয়র্কের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো না।

অবশেষে সংকেত দিল রানা। সবাই ওরা আবার এগোল।

কী কারণে কে জানে হঠাৎ আবার সন্ত্রস্ত দেখাল শৈলীকে। সম্ভবত রানা কাছাকাছি থাকায় ওর আস্তিন ধরেই টান দিল, সংকেত দিচ্ছে: 'যেয়ো না। ওদিকে মানুষ।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। তারপর মুখ তুলে আনন্দর দিকে তাকাল।

নিঃশব্দ ইঙ্গিতে প্লেনটা দেখাল আনন্দ। দুই কি তিন সেকেন্ড পর ধাতব কিছু একটার পতন বা একটার সঙ্গে আরেকটার ধাক্কা লাগবার আওয়াজ ভেসে এল।

পরমুহূর্তে প্লেনটার উঁচু ডানায় বেরিয়ে এল লোকগুলো। সাদা রঙ মাখা দু'জন কিগানি যোদ্ধা। প্লেনের ভিতর থেকে হুইস্কির কেস বের করেছে, এই মুহূর্তে আলোচনা করছে ওগুলো জঙ্গলের মেঝেতে কীভাবে নামানো যায়।

কয়েক সেকেন্ড পর ডানার নীচে আরও পাঁচজন কিগানি বেরিয়ে এল। ডানার উপর থেকে হুইস্কির কেসগুলো তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো। তারপর ডানা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল প্রথম দু'জন। সাতজন এক লাইনে জঙ্গলের পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শৈলীর দিকে তাকিয়ে হাসল রানা।

'শৈলী ভাল গরিলা,' ইশারায় বলল শৈলী।

রানার নির্দেশে আরও বিশ মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। প্লেন থেকে আর কোন কিগানি বেরুচ্ছে না দেখে দল নিয়ে আবার সামনে এগোল রানা। ওরা সবাই কার্গো ডোর-এর কাছে শুধু পৌঁছেছে, এই সময় বাতাসে শিস কেটে ওদের চারপাশে বৃষ্টির মত সাদা তীর এসে পড়তে লাগল।

'ভেতরে!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। তোবড়ানো মোচড়ানো ল্যান্ডিং গিয়ার বেয়ে উপরে তুলল সবাইকে, উঠে এল আপার উইং-এর সারফেসে, তারপর সেখান থেকে প্লেনের ভিতর। সবাই ঢুকেছে কিনা দেখে নিয়ে ইমার্জেন্সি ডোর বন্ধ করে দিল ও, বাইরের মেটাল সারফেসে খটাখট আওয়াজ তুলছে তীরগুলো।

ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের ভিতরটা অন্ধকার। মেঝে বেকায়দা একটা ভঙ্গিতে কাত হয়ে আছে। ইকুইপমেন্ট ভর্তি বাক্স আইল দিয়ে পিছলে দূরে সরে গেছে, ধাক্কা খেয়ে উল্টে ভেঙে গেছে। পায়ের নীচে কাঁচের টুকরো মুড়মুড় করে গুঁড়ো হচ্ছে।

বয়ে নিয়ে এসে শৈলীকে একটা সিটে বসাতে যাচ্ছে আনন্দ। তারপর খেয়াল করল, সিটগুলোয় বসে বাথরুমের কাজ সেরে গেছে কিগানিরা।

বাইরে থেকে হঠাৎ ড্রাম পেটানোর আওয়াজ ভেসে এল। ছাই ঢাকা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ওরা। অস্পষ্টভাবে বারো কি তেরোজন সাদা রঙ মাখা কিগানিকে দেখতে পেল রানা, জঙ্গল থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে প্লেনের ডানার নীচে চলে আসছে।

'কী করা উচিত?' ফুয়াদের কাছে পরামর্শ চাইল রানা।

'পাখি শিকারের মত গুলি করব, সার,' কর্কশ শোনাল ফুয়াদের কণ্ঠস্বর। সাপ্লাইয়ের বাক্স ভেঙে মেশিনগানের ক্লিপ বের করছে।

'এখন আমাদের অ্যামিউনিশনের কোন অভাব নেই।'

রানা একমত হতে পারছে না। 'কিন্তু ওখানে ওরা কম করেও এক-দেড়শো লোক হবে।'

'হ্যাঁ, তা হবে, সার। তবে ওদের মধ্যে মাত্র একজন লোক গুরুত্বপূর্ণ। চোখের নীচে লাল রঙ মেখে আছে, ওই কিগানিটাকে মেরে ফেলুন, সঙ্গে সঙ্গে হামলা থেমে যাবে।'

'কেন?' জানতে চাইল আনন্দ।

'কারণ সে-ই তো ওদের নেতা আর জাদুকর,' বলল ফুয়াদ, ইঙ্গিতে ককপিটটা দেখাল রানাকে। 'ওকে মারুন, আমাদের বিপদ কেটে যাবে বলে আশা করি।'

বিষ মেশানো তীর প্লাস্টিকের জানালায় লেগে ঠন্‌ঠন্‌ শব্দ হচ্ছে, আর মেটালে লাগলে টং করে উঠছে। কিগানিরা শুধু তীর নয়, বিষ্ঠাও ছুঁড়ছে, ফিউজিলাজে লেগে ভোঁতা আর অশ্লীল শব্দ করছে সে-সব। আর ড্রাম বাজছে বিরতিহীন।

শৈলী আতঙ্কিত, একটা সিটে কুঁকড়ে বসে আছে, ইশারায় জানাচ্ছেঃ 'শৈলী এখন যাবে। পাখি উড়ুক।'

রিয়ার প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে দু'জন কিগানিকে লুকিয়ে থাকতে দেখল সিসিলিয়া। তার নিজেরই বিশ্বাস হলো না যে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে খুন করল সে। ফায়ার করবার সময় হাতের ভিতর মেশিনগানটা নাচতে শুরু করেছিল। ছিটকে প্যাসেঞ্জার সিটে ফিরে গেল কিগানিরা–আসলে লাশ দুটো। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল কয়েকটা জানালা।

'চমৎকার দেখালেন, ম্যাডাম!' এক গাল হেসে তারিফ করল কয়কয়, যদিও ইতোমধ্যে অদম্য কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে সিসিলিয়ার শরীরে। আনন্দর পাশের একটা সিটে ধপ করে বসে পড়ল সে।

'খারাপ মানুষ হামলা করে পাখিকে। পাখি উড়ুক। শৈলী বাড়ি ফিরবে। আনন্দ! আনন্দ!'

'এই তো, শৈলী।'

ইতোমধ্যে সুবিধে করতে না পেরে সামনে থেকে হামলাটা বন্ধ

করে দিয়েছে কিগানিরা, নতুন করে শুরু করল পিছন থেকে

পিছন দিকটায় কোন জানালা নেই। প্লেনের ভিতর থেকে সবাই ওরা শুনতে পেল টেইল সেকশনে, আর ওদের মাথার উপর ফিউজিলাজে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। খোলা আফট্ কার্গো ডোর দিয়ে দু'জন যোদ্ধা উপরে উঠতে পারল। রানার সঙ্গে ককপিটে রয়েছে ফুয়াদ, সেখান থেকেই চিৎকার করে বলল, 'ধরতে পারলে স্রেফ খেয়ে ফেলবে আপনাদের!'

পিছনের দরজায় গুলি করল কয়কয়। বুলেটের ধাক্কা খেয়ে প্লেন থেকে নেমে গেল কিগানিরা, ছিটকে আসা রক্ত লাগল কয়কয়ের হাতে আর পায়ে।

'শৈলী পছন্দ করছে না,' ইশারায় জানাল শৈলী। 'শৈলী বাড়ি ফিরবে।' সিট বেল্টটা খামচে ধরে আছে।

'ওই যে, সার–বেজন্মাটা,' চেঁচিয়ে উঠে হাত তুলে দেখাল ফুয়াদ।

সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল রানা।

ত্রিশ বছরের এক তরুণ, চোখের নীচে লাল রঙের মোটা রেখা টানা, মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ে গেল, মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে এখনও ঝাঁকি খাচ্ছে।

'ধন্যবাদ, সার!' বলল ফুয়াদ। 'এবার দেখুন কী হয়।'

কিগানিদের হামলা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। যোদ্ধারা পিছু হটে নিস্তব্ধ জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে। সামনে দিকে ঝুঁকে বাইরের জঙ্গলে ভাল করে চোখ বুলাচ্ছে।

'এরপর কী?' জানতে চাইল আনন্দ, ককপিটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। 'আমরা কি জিতলাম?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওরা রাত না নামা পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। তারপর কাজটা শেষ করার জন্যে ফিরে আসবে। ততক্ষণে সংখ্যায় আরও বাড়বে ওরা।'

'কাজটা শেষ করার জন্যে–'

'সোজা ভাষায় আমাদেরকে খেতে আসবে।'

আনন্দ ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। জানতে চাইল, 'আমরা কী করব তখন?'

এটা নিয়েই ভাবছে রানা। অন্তত আগামী চব্বিশ ঘণ্টা প্লেনটা থেকে নামবার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখতে পাচ্ছে না ও। মেশিনগান চালিয়ে একটা রাত হয়তো নিজেদের রক্ষা করা যাবে। তারপর, কাল সকালে, প্রথম কাজ হবে প্লেনের চারধারের ফাঁকা জায়গাটাকে যতটা সম্ভব বড় করা। প্রথমেই যে সমাধানটা মনে এল—কোমর সমান উঁচু ঝোপ পুড়িয়ে ফেলা, প্লেনের ট্যাংক ভর্তি ফুয়েলে আগুন না ধরিয়ে

বেলুনটা। বিশাল কঙ্গো রেইন ফরেস্টের উপর দিয়ে ছুটে চলল ওরা, পাশ কাটিয়ে এল মাউন্ট মুকেনকোর ধূমায়িত এবং টকটকে লাল হৃৎপিণ্ড। তারপর আকাশে চাঁদ উঠতে রিফট্ ভ্যালির নিচু এলাকা আর খাড়া পাঁচিলগুলো দেখতে পেল ওরা।

ওখান থেকে জায়ার সীমান্ত পার হয়ে দক্ষিণ-পুব দিকে এগোল বেলুন; কেনিয়ার দিকে ফিরছে ওরা।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

প্রজেক্ট X-15

কাজী আনোয়ার হোসেন

গলার ভিতরটা ফুলে উঠতে শুরু করল, গিঁঠ পাকিয়ে
যাচ্ছে শ্বাসনালী। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা শক্ত করে
বাঁধা গিটারের তারের মতো টানটান হয়ে গেল।
চেতনা হারাচ্ছে সে দ্রুত। সারাশরীর ঝাঁকি খেতে শুরু করল।
ভাঙা মেরুদণ্ডের হাড় ঝটকা দিয়ে ছিঁড়ে দিল
কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় ব্লাড ভেসেল, পেশি আর শিরা।
ফুসফুসের অন্তত ছয়টা জায়গায় ফুটো করল
ভাঙা পাঁজরের হাড়। জিভ বেরিয়ে এলো দাঁতের
ফাঁক দিয়ে, পরক্ষণেই প্রবল মোচড় খেল সে।
খট করে বাড়ি খেল দাঁতের সঙ্গে দাঁত। জিভটা কেটে টুপ
করে খসে পড়ল নীচে। মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে
এলো তাজা রক্ত, তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে হওয়ায়
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জমাট বাঁধতে শুরু করল।
শেষ কয়েকটা মুহূর্ত অসহ্য যন্ত্রণা পেল লোকটা,
তারপর মিলল চিরমুক্তি।
রানা, সময় থাকতে পালাও, নইলে তোমারও
এই একই পরিণতি হবে!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

মন্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

মোঃ রাজীবুল হোসাইন, সি-১ (সি), সোনালী ব্যাঙ্ক অফিসার্স কোয়ার্টার, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

আমি মাসুদ রানার নতুন পাঠক ও ভক্ত। আমি গত ছয়মাস ধরে মাসুদ রানার বই পড়ছি। কিন্তু এই দীর্ঘ ছয়মাসে আমি মাত্র ত্রিশটি বই পড়েছি। আমার পড়া রানার বইগুলোর মধ্যে অধিকাংশ বইয়ে নায়িকা ভিন্ন ভিন্ন জন। কিন্তু 'রূপা' ও 'সোহানা' সম্ভবত রানার একাধিক বইয়ে রয়েছে। যদিও আমি রূপাকে নিয়ে লেখা তিনটি (রক্তলালসা, নকল রানা, হংকং সম্রাট) ও সোহানাকে নিয়ে লেখা চারটি (নকল রানা, আমি সোহানা, পালাবে কোথায় ও অন্ধকারে চিতা) বই পড়েছি। বইগুলো আমার খুব ভাল লেগেছে। কাজীদা, রূপা ও সোহানাকে নিয়ে লেখা মাসুদ রানা সিরিজের আর কোনও বই আছে কি?

'গ্রাস' ও 'অন্ধকারে চিতা' বই দুটিতে রেবেকা সাউলের কথা লেখা আছে। এই রেবেকা সাউলকে নিয়ে লেখা মাসুদ রানার কোন বই আছে কি?

কাজীদা, আমি পত্রমিতালীতে আগ্রহী। 'রেবেকা' অথবা 'রূপা' নামের কোন মেয়ের সাথে পত্রমিতালী গড়তে চাই। আমি একাদশ, ১ম বর্ষ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। বয়স ১৭।

রূপা ও সোহানা অনেক বইয়েই আছে – নীল আতঙ্ক, পিশাচ-দ্বীপ, হ্যালো সোহানা, বিষনিঃশ্বাস–এ-মুহূর্তে এই কটি নামই মনে

আসছে। রেবেকা সাউল পরপর দুটি বই–বিদায় রানা ও প্রতিদ্বন্দ্বী-তে আছে। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

শারফিক হাসান, প্র-কালুমিয়া হোটেল, মাদ্রাসা মার্কেটের সামনে, পো+থানা-ফরিদগঞ্জ, জিলা-চাঁদপুর।

আমি এবার ইন্টারমিডিয়েটে। কিছুদিন আগে মাসুদ রানার সাথে পরিচয় হয়েছে। ইতিমধ্যে আমি এই সিরিজের ৫২টির মত বই পড়েছি।

আচ্ছা, আপনার বন্ধু মাহবুবুল আমীন কি বেঁচে আছেন, যিনি আপনাকে এই সিরিজ লেখার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন? তাঁকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ পৌঁছে দেবেন।

আমি মাসুদ রানার পাঠক/পাঠিকার সাথে কলম বন্ধুত্বে আগ্রহী।

বেশ তো, ছেপে দিলাম পূর্ণ ঠিকানা। দুঃখের বিষয়, মাহবুব আমীন বেঁচে নেই, বেশ কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন।

জুয়েল রানা, প্র–পরশ প্রকাশন (যশোর শাখা), পলিটেকনিক কলেজ রোড, যশোর-৭৪০০

প্রথমেই আপনাকে অসংখ্য-অসংখ্য ধন্যবাদ 'মহাবিপদ সঙ্কেত' বইটির জন্য। সত্যিই অপূর্ব। এ-পর্যন্ত মোট ৭৮টি বই পড়েছি। বেশিরভাগই ভাল লেগেছে।

কাজীদা, ঝটপট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন এবার

১. কবীর চৌধুরীকে কি রানা কোনদিন হত্যা করতে পারবে?

২. কোনও বইয়ে কি রূপা ও সোহানাকে একত্রে আনা সম্ভব?

৩. আমাকে কি রানার একজন বন্ধু বানানো সম্ভব?

আমি পত্র-বন্ধু চাই। আমার বয়স ১৮, বর্তমানে যশোর পলি-টেকনিকালে ২য় বর্ষের ছাত্র।

মহাবিপদ সঙ্কেত ভাল লেগেছে জেনে আমরা আনন্দিত।

১. কে কাকে হত্যা করতে পারবে, কিংবা করবে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। দুজনে ভাবও হয়ে যেতে পারে, আবার একসঙ্গে মারাও পড়তে পারে।

২. একেবারে অসম্ভব নয়।

৩. কেন, এখন কি শত্রু নাকি?

মোঃ আব্দুল মোমেন,
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার শ্রদ্ধেয় মামা ফিরোজ আহমেদ স্বপন, প্রতিনিধি দৈনিক মানবজমিন ও বার্তা সম্পাদক